আমাদের গল্প

সম্পাদনায়
তরুণ ঘোষ

রত্নাবলী
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

পথ

একটা লোক ভালুকের খেলা দেখায়। ভালুকটার নাকে দড়ি দিয়ে সে তাকে ঘোরায় গ্রাম থেকে গ্রামে। লোকটার সঙ্গে থাকে কৃশ, সন্ত্রস্ত দুটো বানর। দুটি বানর, একটি ভালুক ও একটি লোক—এই চারজন মিলে একটি টিম। টিম আছে বলেই দারুণ টিমওয়ার্ক আমরা মাঝেমধ্যেই দেখতে পাই, লোকটা যখন খেলা দেখায় হাটতলায় কিংবা গ্রামের স্যাকরাপাড়ায়। ছেলেরা দল বেঁধে জোটে। বড়রা যাদের হাতে কাজ থাকে না বা কাজ ভুলে তারাও গিয়ে হাজির হয়।

গ্রামের পথে একদিন এই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক বেদের। তার ঝাঁপিতে বেশ কিছু জলজ্যান্ত সাপ! ওরা গ্রামের এক বটতলায় দুপুরবেলা আশ্রয় নিল। কথা বলা শুরু করল দুজনে। প্রথমে সপ্রতিভ ভালুকঅলা।

'তোমার সাপগুলোর নিশ্চয় দাঁত নেই।'

'ভেঙে দিয়েছি।'

'হয়তো বিষও নেই?'

'আছে। কামড়ায় না। কিন্তু তোমার ভালুকের তো দেখছি নখ আছে। আঁচড়ে দেয় না?'

'আমাকে ভয় করে।' কাঠিটা দেখিয়ে বলল,—'এইটা দিয়ে ঠান্ডা করে রেখেছি।'

'ও, তা বানরগুলোর তো দেখছি দাঁত আছে! কামড়ায় বুঝি?'

'ওরাও ঠান্ডা। তোমার সাপের মতো তো ওদের দাঁত ভেঙে দিতে পারি না। লোকে ভাববে বুড়ো বুড়ি। লোকের সামনে রোজ অন্তত কুড়িবার ওদের বিয়ে দিতে হয়।'

'তা হলে বলছ ওরা তোমাকে ভয় করে! নখ আছে, তাও আঁচড়ায় না, দাঁত আছে তবু কামড়ায় না!'

ভালুকঅলা এবার বিড়ি ধরাল। শুধু ধরালই না, অনুগ্রহ করে বেদের কোলেও একটা ছুঁড়ে দিল। বুঝিয়ে দিল বেদের চেয়ে বুদ্ধিমত্তা ও জীবিকায় সে উন্নত জীব।

'তোমার সাপগুলো তোমাকে ভয় করে?'

ভালুকঅলা এবার ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে আরেকটা গ্রামে যেতে হবে। খানিকটা অসহায়ের মতোই বেদেকে বলতে শোনা গেল, 'তা হলে কি তোমার ভালুক বা বানরগুলো কোনও সমস্যাই সৃষ্টি করে না?'

'করে বৈকি! প্রায়ই করে। বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ভালুকটার মন খারাপ

করে। গাছের ডালপালা দেখে মন খারাপ করে বানরগুলোর। ওদের দেখাদেখি আমারও মন খারাপ করে—ওরা কাঁদলে আমারও কান্না পায়। কিন্তু আমি হাসি, ছড়ি ঘোরাই।'

দুপুরের রোদে ভালুকঅলা ধুলোর-পথে অনেক দূর গেল এগিয়ে। সরীসৃপের জীবন আগলে বসে থাকল বেদে।

আমি গোপাল

কলেজ ক্যাম্পাসের মেন গেট পর্যন্ত বাবাকে পৌঁছে দিয়ে গেল মীরা। গেটের পাশে পাম গাছের নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ফুটপাথের ভিড়ে হারিয়ে যাবার আগে বাবা পেছন ফিরে একবাব ওর দিকে তাকালেন। চশমার কাচে বোধহয় ধুলো পড়েছে মীরার। মাথা নিচু করে আঁচল দিয়ে কাচ মুছতে মুছতে বুকের ভেতরটা গুমরে উঠল। 'চিঠি দিয়ো বাবা, চিঠি দিয়ো। মা আর দাদাকে বলো চিঠি দিতে।'

কথাটা অনিলবাবুর কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না। মীরা চোখ তুলে দেখল, দু পাশের ফুটপাথে ভিড় বয়ে যাচ্ছে। বাবা নেই।

. হোস্টেলের তিনতলায় মীরা ওর নিজের ঘরে ফিরে এল। মাঝারি সাইজের ঘর। চার কোণে চারটে চৌকি। আরও তিনজনের সঙ্গে মীরাকে এই ঘর ভাগ করে নিতে হবে। এই প্রথম সে বাড়ির বাইরে থাকবে।

লাভপুর গ্রামে মেয়েদের স্কুলে বরাবরই সে প্রথম হত। লাভপুব নামেই গ্রাম। আসলে ছোট্ট একটা শহর। স্কুল, কলেজ, রেজিস্ট্রি অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, কয়েক বেডের হাসপাতাল, ছোট লাইনের ট্রেন ও স্টেশন, বি ডি ও অফিস—কী নেই এখানে! দরদালান, মরচে-পড়া টিনের চালাঘর আর তার চেয়েও বেশি সুন্দর সব মাটির কোঠাবাড়ি নিয়ে তবু একটা মনেপ্রাণে গ্রাম। মীরাদের বাড়ি এই লাভপুরে। মীরার বাবা অনিলবাবু বি ডি ও অফিসে কাজ করেন। পরীক্ষায় তাঁর মেয়ে ভাল রেজাল্ট করে এটা তিনি জানেন। পড়শি ও অফিসের সহকর্মীরা যে মীরার প্রশংসা করে তাও তাঁর কানে আসে। কিন্তু তিনি কখনও ভাবেননি মেয়েকে হোস্টেলে রেখে পড়াতে হবে। ভেবেছিলেন গ্রামে তো কলেজ আছেই। সেখান থেকে পাশ করার পর না হয় কলকাতা বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েকে ভর্তি করে দেওয়া যাবে।

কিন্তু সব হিসেব বদলে গেল মীরার রেজাল্ট বেরুনোর পর। এত ভাল রেজাল্ট করল মীরা যে, ওকে কলকাতার কোনও নামী কলেজে ভর্তি না করে দিলেই নয়! এই এক ক্লান্তিকর অসুবিধে মফস্বলের। ভাল পড়াশুনো আর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা—দুটোর জন্যই কলকাতায় ছুটে আসতে হয় মফস্বলের মানুষকে।

মীরাও এসেছিল। ট্রেনে জানলার ধারে বসে থাকতে থাকতে হাওয়া এসে চুল এলোমেলো করে দিয়ে গিয়েছিল ওর। বাবাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। মাইলের পর মাইল অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ দেখা আলো, স্টেশনের ভিড়, ট্রেনের ঘণ্টা, সবুজ লণ্ঠন—আলাদা আলাদা ভাবে এ

সবের কোনও অস্তিত্বই থাকল না ওঁর কাছে।

কয়েকদিন হল মীরার ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাসের দু-একজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাবসাবও হয়েছে ইতিমধ্যে। হোস্টেলের রুমমেটদের মধ্যে মীরাই সবচেয়ে জুনিয়র। তিন রুমমেটকে সে দিদি বলে ডাকে। ওর ক্লাসেরও একটি মেয়ে আছে হোস্টেলে। নাম মালা। তবে সে থাকে একতলায়। মীরার ইচ্ছা হলেও সব সময় ওর দেখা পায় না। মালা কলকাতারই মেয়ে। বাড়ি আলিপুরে। বরাবরই হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছে। আগে ছিল ডাউহিলে। ফার্স্ট ইয়ার অনার্সের ছাত্রী হলে কী হবে, এর মধ্যে উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও মালার দারুণ বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। সকালবেলা খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায় মালা। ফেরে একেবারে রাত নটায়। নটার মধ্যেই হোস্টেলে ফেরার নিয়ম। আরও দেরি করে ফেরার নিয়ম থাকলে মালা নিশ্চয় সেই সময়েই ফিরত।

একটা কথা মীরা বুঝতে পেরেছে। এখানে আবহাওয়াটাই আলাদা। লাভপুরে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল মাটির ওপর দিয়ে যে হাওয়া হয়ে যায়, যে আলো ওঠে, সেই হাওয়া, সেই আলো-হাওয়ার খোঁজে পাগল হওয়াও বোধহয় কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু মীরার অসুবিধেটা এখানেই। যে স্বপ্ন বুকে পুষে রাখতে হয়, যে স্বপ্নের কথা মুখ ফুটে কাউকে বলা যায় না. সেই স্বপ্ন আর ভাললাগাগুলোকে সে কেন এখানে খুঁজে পেতে চাইছে? কে শুনবে ওর কথা? ওকে বুঝতে পারবে কি?

নতুন একজন অধ্যাপক ক্লাস নিচ্ছেন কয়েকদিন হল। সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। বয়স বেশি নয়। মুখেচোখে একটা ছেলেমানুষী ভাব। তাতে বয়সটা আরও কম দেখায়। পড়ানোর ভঙ্গিটাও চমৎকার। সপ্তাহে মাত্র দুটো ক্লাস নেন। কিন্তু ওই দুটো ক্লাসের জন্যই মন পড়ে থাকে মীরার। সেদিন সে একটু বেশি সাজগোজও করে। ক্লাসে গিয়ে উসখুস করে। প্রশ্নের ছলছুতোয় নতুন স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ খোঁজে। দু-একবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতেও চায়। কিন্তু আর হয়ে ওঠে না। সব কিছু গুলিয়ে যায়। সবার অজান্তে হাত পা কেঁপে ওঠে।

তারপর সত্যিই মীরা একদিন একটা প্রশ্ন করে বসে। আমেরিকা-ফেরত যুবক সৌম্যেন্দু প্রশ্ন শুনে হেসে উঠলেন, 'তুমি তো একেবারে এলিমেন্টারি প্রশ্ন করেছ। স্কুলের প্রশ্ন...।'

হাসির ঝড় বয়ে গেল ক্লাসে। সে ঝড়ের ধুলোবালি গায়ে লাগল মীরার। বেঞ্চে বসে পড়ার মুহূর্তে ওরই মধ্যে সে দেখল, বেশি হাসছে মালা। এ রকম হাসির কথা যেন সে আগে কখনও শোনেনি। মীরা আরও দেখল, তাদের নতুন স্যার হাসি সামলে নিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই যে তিনি মালার দিকে তাকিয়ে আছেন, চোখ আর ফেরাতেই পারছেন না। সে চোখে স্পষ্ট একটা ভাষা খুঁজে পেল মীরা। নিজের ওপর ঘৃণা হল। নিজেকে হাস্যকর করে তোলার এরকম একটা সুযোগ কেন সে ক'রে দিল? চেয়ার টেবিলের কাঠগড়ায় নতুন স্যারকে দাড় করিয়ে সে শুধু মনে মনে বলল, কেন এমন করলেন? ভাবতাম আপনার ভাললাগাটাও অন্যদের মতো নয়। যা কিছু সস্তা ও সহজ তাতে আপনার মন

ভরে না।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। তারপরেও অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকল মীবা। দূর থেকে ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের গলার শব্দ। বুকের ভেতরের নৈঃশব্দ তাতে আরও বেশি করে বেড়ে যাচ্ছে। মীরা এবার হোস্টেলে ফিরে যাবে। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে উঠে যাবে তিনতলার ঘরে। বারান্দায় একটা চেয়ার এনে বসবে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে শেষ চৈত্রের বিকেল। চোখের সামনে মস্ত বড় আকাশটা জ্বলতে জ্বলতে ছাই হয়ে যাবে। অন্ধকার নামবে। লাভপুর গ্রামের খোয়াই আর কোপাই নদীর তীরের শান্ত নরম অন্ধকারের চেয়েও এই অন্ধকারের রঙ গাঢ়।

অন্যমনস্ক বিষণ্ণ মীরা ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে নেহাত অভ্যাসবশে লেটার বক্স খুলল। পরশুই তো বাবার চিঠি পেয়েছে। তার আগের দিন পেয়েছিল মা ও দাদার চিঠি। বাবা অফিসে বসেই চিঠি লেখেন। লেখার পরই ডাকঘরে পাঠিয়ে দেন বেয়ারার হাতে। দাদা বরং চিঠির শেযে মায়ের জন্য জাযগা বেখে দেয। না, আজ মীরার কোনও চিঠি আসার কথা নয়। লেটার বক্সে তিন চারটে পোস্টকার্ড আর নীল একটা খাম। অবাক হল সে, নীল খামটা ওর নামেই এসেছে। যে পাঠিয়েছে, খামের ওপরে বা পেছনে তাব নাম নেই। লেখা আছে—কুমারী মীরা মুখোপাধ্যায়। তারপর ঠিকানা। হাতের লেখাটা খাবাপ নয়।

আবার কে চিঠি লিখল আমাকে? সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নীল খাম সাবধানে ছিঁড়তে ছিঁড়তে মীবা ভাবল। আকাশে সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে আগেই। সিঁড়িতে পড়েছে তারই ম্লান দাগ। তিনতলার বাবান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মীরা। চিঠিটা খুলল। আগে দেখে নিল কার লেখা। ইতি তোমার গোপাল।

কে গোপাল? গোপাল নামে কাউকে সে চেনে বলে মনে পড়ছে না। ঠিকানাটা দেখল—গ্রাম ও ডাকঘর—লাভপুর। লাভপুরে ছেলেদের ভিড়ে কার নাম গোপাল? বিল্টু, অনিরুদ্ধ, সোমনাথ--এদের মুখগুলোই তো ভেসে উঠছে এখন। অন্য আর কাউকে সে চেনে না। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথের ধারে বেশ কিছু ছেলে সকালে বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের সকালে কিংবা ম্লান বিকেলগুলোয় তবে কি এই গোপাল তার আসা-যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত? গার্লস স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়ত মীরা। প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যেও গোপাল বলে কাউকে এই মুহূর্তে তার মনে পড়ছে না। আর গোপাল নামে কোনও প্রাক্তন সহপাঠী যদি থাকেই তা হলে এতদিন পরে সে তাকে চিঠি লিখবে কেন?

মীরা,

তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমাকে মনে রাখার কোনও কারণও অবশ্য নেই। তবে আমি জানি একসময় আমি তোমার কতটা কাছাকাছি ছিলাম। তোমাকে চিঠি লেখার সেটাই আমার অধিকার। কিন্তু উপলক্ষ কিছু নেই। একটা কথাই শুধু বলার আছে। ভালভাবে পড়াশুনো করো। আর আনন্দে থেকো। জীবনে আনন্দের চেয়ে দামি আর কিছু

নেই। আমার নিজের জীবন থেকে আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে বলেই, তোমার মধ্যে তার সার্থকতা দেখতে চাই।

কাকাবাবু, কাকিমা আর সমীরণদা ভাল আছেন। ভালবাসা জেনো। ইতি

তোমার গোপাল।

চিঠিটা বারবার পড়ল মীরা। ক্লাসের বিশ্রী অভিজ্ঞতার পর এই চিঠিই সন্ধ্যাবেলা তার গায়ে ছড়িয়ে দিল দূর কোপাই তীরের হাওয়া। কিন্তু যত মুশকিল এই গোপাল নামটা নিয়ে। চিনি না চিনি না চিনি না—মীরা বারবার বলল। অভিভাবকের ভঙ্গিতে চিঠি লিখেছে গোপাল। স্নেহ ও মমতাটুকু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। লিখেছে তোমার কাছাকাছি ছিলাম। ঠিক বোঝা গেল না। একটা কথা অবশ্য বোঝা গেল। গোপাল আমাদের বাড়ির সব খোঁজখবর রাখে। আমার ঠিকানাও জানে। নাহলে এই চিঠি সে লিখবে কী করে? মীরা ভাবল।

নীল খামের চিঠি আবার এল, ঠিক এক সপ্তাহ পর।

মীরা,

আমার আগের চিঠি পেয়েছ নিশ্চয়। একটা কথা অন্তত বুঝতে পারবে। তোমার চলার পথের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। গ্রামের মানুষ ও আমি। এটাই তোমাকে সাহস জোগাবে দুর্দিনে।

লাভপুরের ঠিকানায় চিঠি দিলে আমি পাব। কিন্তু আমি চাই না তুমি আমাকে কোনও চিঠি লেখ। চিঠি লিখে বলার কথাটাকে নষ্ট করে ফেলো না। হয়তো আমিও আর চিঠি লিখব না তোমাকে। মুখ ফুটে তুমিও হয়তো কোনওদিন কিছু বলতে পারবে না আমাকে। সম্পর্কটা হয়তো এ ভাবেই থেকে যাবে চিরদিন। থাকুক। অব্যক্ত ভাষার চেয়ে সুস্পষ্ট আর কিছু নেই। আমাকে তোমার যা কিছু বলার থাকবে তা আমি দূর থেকেই বুঝতে পারব। আগে যেমন তোমার কাছাকাছি ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। বরং বেশি করে আছি। সকলের সঙ্গে মিশে আছি। আমি জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমার সব ভালবাসা থাকল তোমার জন্য। ইতি

তোমার গোপাল।

মীরার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না। যখন একা থাকে, তখন বেশি করে তার সান্নিধ্য পেতে চায়। তাকে প্রত্যাখান করতে হলেও তো একবার চোখে দেখা দরকার। আর যদি তাকে ভালবেসে ফেলি?

সেই মীরা আর নেই। দুটি নীল খাম তার জীবন বদলে দিয়েছে। তাকে একজন ভালবাসে, সব সময় সে তার কাছে আছে—ঘনিষ্ঠতার এই উপলব্ধিটুকু মীরাকে শিখিয়েছে কীভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হয়, কীভাবেই বা উপেক্ষা করতে হয় ক্ষুদ্রতাকে। মীরা মনে মনে বলে, আমিও তোমার কাছে আছি। তোমাকে ভালবাসার সুযোগ দাও। তারপর যদি তোমাকে ফিরিয়েও দিই, আমার মনে কোনও দুঃখ থাকবে না। কিন্তু তোমার মনে আমি কোনও দুঃখ দিতে চাই না। ভালবাসতেই চাই তোমাকে। যদি না

পাবি সেটা আমারই ব্যর্থতা।

গরমের ছুটিতে লাভপুরে গিয়ে গোপালকে খুঁজে বের করতে হবে। মীরা আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে এসেছে। হাটতলা, থানাপাড়া, বিরামমন্দিব, ফুল্লরাতলা—বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেদের লক্ষ করেছে মীরা। কাউকেই তাব গোপাল বলে মনে হয়নি। এ এক অদ্ভুত ব্যথা-ভরা রহস্য। সাহস করে মীরা কথাটা বন্ধুদেরও বলতে পারেনি। কে জানে, ওরা হাসাহাসি করবে কি না?

কোপাই নদীর ব্রিজ পেরিয়ে সাঁওতাল পাড়ায় বেড়াতে বেড়াতে মীরার কেমন যেন মনে হয়—হঠাৎ যদি গোপাল আসে এখানে? গোপালের বদলে হুড়মুড় করে এসে পড়ে ছোট লাইনের ট্রেন, ধোঁয়া উড়িয়ে ব্রিজ পেরিয়ে চলে যায়। ওই ট্রেনে কি গোপাল আছে?

লাভপুরেব স্কুলগুলোতেও এখন গরমের ছুটি। আসা-যাওয়ার পথে ছেলে-মেয়েদেব ভিড় নেই। আচ্ছা, সেই ছেলেটাব নাম কী? মীরা মনে মনে ভাবল—রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে যে ওকে শোনাত, কালো হলে কী হবে, কালো গোলাপের মতো সুন্দব। হ্যাঁ মনে পড়েছে, ওর নাম তো তিমির।

আব একটি ছেলে মীরাকে একদিন বলেছিল—'তোমার কিছু হাবিয়েছে? আমি সেটা খুঁজে পেয়েছি।'

না, আমার গোপাল ওভাবে কথা বলে না।

শেষ পর্যন্ত মীবা একদিন দাদাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কথাটা।

'দাদা, গোপাল নামে কাউকে চিনিস? আমাদেব গ্রামেই বাড়ি।'

কিছুক্ষণ ভেবে সমীরণ বলল—'কোন পাড়ায় বলতে পারিস?'

'তা হলে তো আমি নিজেই চিনতে পাবতাম। না, গোপাল নামে কেউ নেই এখানে।'

বিকেলে আবার ছোট লাইনের স্টেশনে গিয়ে বসে থাকল মীরা। ট্রেন চলে যাবাব পর বাসস্ট্যান্ডের দিকে গেল, উদ্ধারণপুরের বাস থেমে আছে। সিউড়ি যাবাব বাসটাকেও দূরে দেখা যাচ্ছে। পান বিড়ির দোকান। পাইস হোটেল। খড়ের চালাঘরে সেলুন। জীর্ণ হৃৎপিণ্ডের মতো একটা হাস্কিং মেশিন চলছে ঢিপ ঢিপ শব্দে। পিচ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল মীরা। তারপর মোরামেব ডাঙায় নেমে পড়ল। তালবাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাজার হাজাব তালগাছ। ছায়াছন্ন লাল মাটির পথ। নীল সবুজ মেঘ যেন নেমে এসেছে মাটিতে। কিন্তু কোথায় গোপাল?

'না রে, আমি তোকে ভুল বলেছি। বাউরি পাড়ায় একজনের নাম গোপাল। ডোম পাড়াতেও একজন গোপাল আছে। বুড়ো গোপাল। গোপাল বাউরিরও বয়স কম নয়। গতবার তো আমাদের খড়ের চাল গোপাল বাউরিই ছেয়ে দিয়ে গেছে।'

ছুটি ফুরিয়ে গেল মীবার। ভোববেলার বাসে আমোদপুর স্টেশন আর বিশ্বভাবতী প্যাসেঞ্জার। বাস ও ট্রেন দুটোতেই খুব ভিড় হয়। এবার মীরার সঙ্গে বাবা যাচ্ছেন না।

মীরা একা এসেছে। ফিরবেও একা। বাবা ও দাদা ওকে লাভপুরে বাসে চাপিয়ে দিতে এসেছে। ঘুম জড়ানো চোখে ট্রেন ধরানোর তাড়া থাকে ড্রাইভারের। লোক উঠতে না উঠতেই কন্ডাক্টার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ছাদের ওপর থাকল মীরার বাক্স-বেডিং। কিন্তু কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা? ওই ব্যাগেই তো প্র্যাকটিক্যাল খাতাগুলো ছিল, ছিল দরকারি নোটস। কলেজ খুললেই পরীক্ষা।

আমোদপুরে যাত্রীদের নামিয়ে মর্নিং কোর্টের প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাস সিউড়ির পথে উধাও হয়ে গেছে। ট্রেনের ঘণ্টা হয়েছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে দেখা যাচ্ছে কালো মেঘ। বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার আসছে। স্টেশনে থইথই ভিড়। ঠিক এই সময়েই কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটার কথা মনে পড়ল মীরার। বাসে পড়ে থাকল না তো? নাকি শেষ মুহূর্তে মা বাক্সের মধ্যে ব্যাগটা ভরে দিয়েছেন? বাক্স খুলে দেখবে সে-সময়ও তো নেই। তবে কি এই ট্রেনে যাবে না মীরা? বাড়ি ফিরে যাবে?

গমগমে ভিড়ের মধ্যেই মীরা স্পষ্ট শুনল একটা মোটরবাইক এসে থামল স্টেশনের দরজায়। পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছিপছিপে এক তরুণ তাড়াতাড়ি মোটর বাইকটাকে পাশে ঠেলে রেখে ছুটে চলে এল প্ল্যাটফর্মে। কাঁধে খদ্দরের ঝোলানো ব্যাগ। ব্যাগটাকে চিনতে পারল মীরা। এতক্ষণ এই ব্যাগটারই সে খোঁজ করছিল।

হুড়মুড় করে ট্রেনে এসে পড়েছে। ছেলেটি মীরার হাতে ব্যাগটা তুলে দিয়ে বলল—'আমি গোপাল। ব্যাগটা তুমি লাভপুর বাসস্ট্যান্ডে ফেলে এসেছিলে।'

ট্রেন নড়ে উঠল। মীরা কোনওরকমে উঠতে পেরেছে। এই গোপালকে কি সে কখনও চোখে দেখেছে? চেনে কি ওকে? মনে পড়ে না। মনে পড়ে না।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোপাল আর তার মোটরবাইকটাকে দেখতে পেল না মীরা।

গোবর চুরি

সাড়ে তিন হাত গামছাটা যথেষ্ট, ধুতি পরার আর দরকার নেই। গাছের পাতা বা ছাল পরে যদি এখানে থাকা যেত, তা হলে তা'ই থাকত জরিলাল। শীত-গ্রীষ্মে ওই একটাই পোশাক। শীতে অবশ্য গায়ে চাদরের মতো আর একটা গামছা জড়িয়ে নেয়। কিন্তু তার দৈর্ঘ্যও সাড়ে তিন হাত। এক ইঞ্চিও বেশি নয়। ওর বাড়ি কোথায় কেউ জানে না, নামটাও কি সবাই জানে? সন্দেহ হয়। জরিলাল এমনই মানুষ যে, ওর সম্বন্ধে কারও কোনও কৌতূহল নেই। জরিলালও হয়তো চায় না কেউ ওর খোঁজখবর নিক।

অথচ পাড়ার সবার কোনও না কোনও দরকারে জরিলালের ডাক পড়ে। দুধঅলা আসেনি, ডাকো জরিলালকে—খাটাল থেকে দুধ আনতে হবে। বাড়ির কল খারাপ হয়ে গেছে, বড় রাস্তার পাশের নলকূপ থেকে জল আনতে কে যাবে? কে আবাব, জরিলাল তো আছেই। ছোট-খাটো প্রয়োজন, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হলেই সংসার অচল। না হয় অশান্তি। কিন্তু জবিলালকে পাওয়া যাবেই। এ বাড়ি না হয় সে বাড়ি। ঘুরে ঘুরে সে কারও না কারও কাজে লাগছে। যেমন, নিযমিত রোদ ওঠে, মেঘ করে, সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়—সেরকমই এই জরিলাল। প্রকৃতির অনেক নিয়মের মধ্যে সে নিজেও একটা নিয়ম। নিঃশব্দ, নিশ্চিত।

জরিলাল কোথায় থাকে, কী খায়, কখন কোথায় কীভাবে কাটে, রোজগারই বা কী এসব নিযেও কারও মাথাব্যথা নেই। কোন্ গ্রামে তার বাড়ি, কোনখানে কারা থাকে, এ নিয়েও কাউকে চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায় না। জরিলালকে নিয়েই যখন কৌতূহল নেই, তখন ওর বাড়ি সম্বন্ধে লোকেরা যে উদাসীন থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। জরিলাল কারও ভৃত্য নয়, তবু সে সবার অনুগত।

জরিলাল জানে কখন কার কী প্রয়োজন। দুধের বালতি পৌঁছে দিয়ে এই তাকে দেখা গেল ঘেঁটু ফুলের পাতায় নৈমিত্তিক পুজোব কিছু ফুল-বেলপাতা এনে দিতে, এই সে চলল ডাকঘরে জরুরি চিঠি ফেলতে, না হয় কারও বাড়ির বাজার সারতে। জরিলাল জানে, কোন বাড়ির ছেলের ইস্কুলে আজ পরীক্ষা, ক'টায সে ভাত খেয়ে বেরোবে, বাবুই বা কখন অফিস যাবেন। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির জবিলাল। ছোট ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে সে তখন বলবে, 'ভাল করে পড়ো দাদু। আমার মাথায় যত চুল তত বছর তোমার আয়ু হোক।'

জরিলালকে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা অবশ্য দাদু বলে না। বয়স হযেছে। কিন্তু ঠিক কত তাও বোঝা যায় না। জরিলাল নিজেও জানে না ওর বয়স। রোদে পোড়া কালো

চেহারা। রোগা বলা যাবে না। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝেই ওর শরীর ভাল থাকে না। জিজ্ঞেস করলে ওর উত্তর কিন্তু একটাই, 'বয়স হয়েছে। শরীরের আর দোষ কী!'

এ কি সারল্য? নাকি শান্তভাবে সব কিছু মেনে নেবার এক বিরল জীবনদর্শন? জরিলাল কখনও বিচলিত হয় না? যেমন বনজঙ্গল, মাঠঘাট, খড়ের বাড়ি, রৌদ্র কিংবা জ্যোৎস্না—পরিবর্তন যাদের চোখে পড়ে না।

'জরিলাল, এই জরিলাল?'

'বাবু!'

'আমার রাঁধুনি দেশে গেছে। ফিরবে কি না ঠিক নেই। রান্না করবে?

'যদি বলেন তো তাও পারি বাবু। নেপালগঞ্জের হাটে মাস ক'য় রাঁধুনির কাজও তো করেছিলাম।'

'নেপালগঞ্জটা আবার কোথায়?'

'ও আপনি চিনবেন না বাবু। এখান থেকে গেঁওখালির বাস। সেখান থেকে কোরোশ পাঁচ দক্ষিণে। এই যে আপনারা পাশে মাছ কিনছেন বাজারে, সব সেই নেপালগঞ্জের পাইকারদের চালান।'

'তা, তুমি পারবে রান্না করতে? বুঝতেই পারছ, বৌদির শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না আজকাল। তুমি কয়েকটা দিন না হয় চালিয়ে দাও।'

'চলেন বাবু। এখনই কাজে লেগে যাই। দুপুরের আহারটা তো আগে সারুন।'

কত বেতন নেবে বলো? আগে থেকে কথাবার্তা চুকিয়ে রাখাই ভাল।'

'ছিঃ ছিঃ বাবু, আপনি পয়সা দিয়ে জিনিসপত্র কিনবেন, চাল ডাল কিনবেন, আর আমি দুটো রান্না করে দিতে পারব না? বলি কাজটা আমার কী! আসল কাজ তো আপনার। ভাঁড়ারের মালমশলা তো আপনিই সব জোগাবেন। বলি অন্নপূর্ণা তো আপনিই। বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে গেল। চলুন, চলুন।'

আমাকেই তাড়া দিয়ে ঘরে আনল জরিলাল। রান্না সেরে সবাইকে খেতে দিল। খাওয়ার পাট শেষ হতেই বাসনপত্র মেজে আমরা কেউ কিছু বলার আগেই বেরিয়ে গেল জরিলাল। এখন গিয়ে কি ও রান্না করবে? তা হলে তো বিকেল গড়িয়ে যাবে, আর এতক্ষণ ও না খেয়ে থাকবে?

'জরিলাল, ও জরিলাল।'

আমি পিছু নিলাম।

'বলুন বাবু।'

আগের মতোই শান্ত নির্বিকার কণ্ঠস্বর।

'তুমি খাবে কখন?'

হাত জোড় করে বলল—'আমাকে আর খেতে বলবেন না। ছোটবেলায় পেথকান্ন

হয়েছি। বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারব না। রোজ যখন খাই তখনই তো খেতে বসব বাবু।'

'আজ দেরি হয়ে গেল না!'

'না বাবু। বরং হাতের কাজটা পড়ে থাকল।'

রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁচা গোবর কুড়োতে কুড়োতে বলল জরিলাল। অনেকদিন অনাহারে থেকে ক্ষুধার্ত যেমন থালা চেটেপুটে ভাত খায়, সেরকমই রাস্তা থেকে চেছে-পুছে সব গোবরটুকু সে হাতে তুলে নিল।

'যাই বাবু, আগে হাতের কাজটা সারি। তারপর নাওয়া-খাওয়া।'

জরিলাল চলে গেল। ফিরে এল সন্ধের আগে। একবার যে দায়িত্ব নিয়েছে তা পালন করবেই। রাতের রান্নার কথা তাকে আর মনে করিয়ে দিতে হয়নি।

কিন্তু এই প্রথম একটু অন্যমনস্ক দেখাল জরিলালকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেই, কিন্তু কোথায় যেন কী একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে ওর। কয়েকবার প্রশ্ন করেও যা জানতে পারিনি, তা সে ফাঁস করল আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর।

'বাবু আজ আর হাতের কাজ সারতে পারলাম না।'

'এক-আধদিন তো এরকম হয়ই। আমাদের তো রোজই কাজ জমে যাচ্ছে। হাতের কাজ জমিয়ে রাখতেই তো অনেকে ভালবাসে।'

কিন্তু জরিলালের কথাই আলাদা। প্রতিদিন যেভাবে তার দিন শুরু ও শেষ হয় তার এক চুলও নড়চড় হবার উপায় নেই। যেভাবে সকাল হয়, সকালের পর দুপুর, দুপুরের পর বিকেল, সন্ধ্যা ও রাত্রি—সেভাবে, ঠিক সেভাবে এবং ঠিক সেই ছন্দে চলে জরিলালের জীবন। এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। ব্যতিক্রম মানেই ওর কাছে সর্বনাশ।

আর ঠিক এটাই ঘটল। পরের দিন ঘুম ভাঙল আর্তনাদে। জরিলালের গলা না? যাকে কেউ কখনও জোর গলায় কথা বলতে শোনেনি, রোগযন্ত্রণার মধ্যেও শোনা যায়নি যার কাতর কণ্ঠস্বর, সেই জরিলাল যে এভাবে কাঁদছে তা ওকে এই মুহূর্তে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

'বাবু আমার সব গোবর চুরি হয়ে গেল।'

'কী চুরি হল?'

'গোবর। কাল সব ঘুঁটে দিতে পারিনি। জমি থেকে কাঁচা ঘুটে তো নেওয়া যায় না, তাই গোবরের তালটাই নিয়ে পালিয়েছে।'

সামান্য গোবর, পথে-ঘাটে পড়ে থাকে, কুড়োতেও পয়সা লাগে না। আর এই অতিসামান্য চুরিতেই ব্যাকুল হয়ে পড়ল জরিলাল।

কথাটা ওকে বলতে গিয়েই থেমে গেলাম। সব কথা বলা যায় না। বিশেষ করে জরিলালকে।

যে গোবর চুরি করে, সেও এক অসহায় মানুষ বুঝতে দেরি হয় না আমার। কিন্তু জরিলালকে সেটা বুঝিয়ে লাভ নেই। ওই জরিলাল। বসন্ত ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে ঘেঁটু ফুলের মৃদু গন্ধ। চমৎকার রোদ উঠেছে। আর এরই মধ্যে জরিলাল আবার আগের মতোই শান্ত নির্বিকারভাবে শুরু করেছে ওর কাজ। কোনও উদ্বেগ, কোনও ব্যাকুলতাই ওর কাজের ছন্দ আর নষ্ট করে দিতে পারবে না।

ডেথ সার্টিফিকেট

জঙ্গল আর পাহাড়ঘেরা গ্রাম পাতাবাড়ি। জঙ্গলের সবুজ ছায়া সেদিন একটুও কাঁপেনি যেদিন বাড়ি ফিরল না রামলখন। পাহাড়ে সেদিনও আগের মতো বর্ষার মেঘ আটকে আছে। নতুন বৃষ্টির জল ঝরে পড়েছে গাছের পাতা থেকে। উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ট্রাক ও বাস যাচ্ছে দুমকা বা সিউড়ির দিকে। সন্ধ্যার এই একটু আগে পেরিয়ে গেল ভাগলপুর যাবার শেষ এক্সপ্রেস বাস। পাতাবাড়িতে থামে না। পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে ওপরে ওঠার সময় বাছুর হারানো মোষমাতার মতো গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মোটরবাসের এঞ্জিন। অনেক দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়। সেদিনও শোনা গেল। তফাত শুধু এই যে, রামলখন বাড়ি ফেরেনি। বাকি সব ঠিকঠাক আছে। বৃষ্টিশেষে গোধূলির সেই লাল আকাশ আর ভিজে লাল মাটি।

চোখের জলে ভিজল সাবিত্রীও। বাড়ি ফিরতে রামলখনের কখনও এত দেরি হয় না। স্বামী হিসেবে সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল। কাউকে দুশ্চিন্তায় ফেলা ওর স্বভাব নয়। গভীর রাতেও যখন সেই রামলখন বাড়ি ফিরল না তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না সাবিত্রী। কাঁদল, অনেকক্ষণ কাঁদল। সময় এখানে ঘড়ি ধরে চলে না। জ্যোৎস্না অন্ধকার কুকুর বা শেয়ালের ডাক—এ ধরনের কিছু কিছু অনুভূতিসাপেক্ষ উপায় আছে, রাত্রিকে চেনার। পাহাড়ের মাথায় এখন মেঘ সরে গেছে একটু। অল্প একটু জ্যোৎস্না নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ খুঁজছে। রাত অনেক হল। সাবিত্রী বসে আছে। খাওয়া হল না, ঘুমনো হল না। অজানা এক আশঙ্কা তাকে জাগিয়ে রেখেছে।

এ সাবিত্রী ভারতীয় পৌরাণিক গল্পের সাবিত্রী নয়। যমের দুয়ারে সে যেতে পারবে না। যাওয়া যে নিষেধ তা নয়। আসলে যমকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনও দেবতারই অস্তিত্ব নেই সাবিত্রীর জীবনে। দরকারও নেই। সে অনেক মানুষকে দেখেছে। সরপঞ্চ, ঘাটোয়াল, ভূমিহার, শিকারী, ওঝা। এরকম অনেক অনেক মানুষ। কেউ ক্ষেতে কাজ করে, কেউ গ্রাম আগলায়। কেউ বা বনে বাদাড়ে খুঁজে বেড়ায় খরগোশ, ময়ূর না হয় চিতা বাঘের বাচ্চা। আবার কেউ বা রোগ সারায়। ঝাড়ফুঁক দেয়। দেয় টোটকা ওষুধ। তাতে যদি রোগ সেরে যায় সারুক। না হলে সাক্ষাৎ মরণ। তখন শ্রীধর যাদোর কাছে খবর চলে যাবে। পাশের জাম্বুলিয়া গ্রাম থেকে সে এসে দেখিয়ে যাবে চক্ষুদান পট। এই মানুষদের দেখতে দেখতেই একদিন বড় হয়ে উঠল সাবিত্রী। দেখেছে মা মাসি ঠাকুমাদেরও। গাঁও দেবতির প্রতি বিশেষ কোনও কখনও মানত করতে হয়নি তাকে। এমনকি গাঁও দেবতিদের প্রতি বিশেষ কোনও ভক্তিশ্রদ্ধা দেখানোর উপলক্ষও হয়নি।

হয়তো গাঁও দেবতি আছেন, হয়তো নেই। মোট কথা সাবিত্রীর এ নিয়ে বিশেষ কোনওও ধ্যানধারণাই গড়ে ওঠেনি।

বন থেকে শালপাতা সে নিয়ে আসে। শালপাতার বোঁটা ভেঙে বড় বড় পাতা তৈরি করে। পাতা কিনতে আসে মহাজন। বিক্রি হয় সিউড়ি-দুমকার বাজারে। বাকি সময় বাড়ির কাজ করে সাবিত্রী। মুরগি ও ছাগলগুলোকে খেতে দেয়। ঘর নিকোয়। রান্না করে। চুল বাঁধে। মেটে সিঁদুর, কাঠের চিরুনি—এই তাব উপকরণ।

রামলখনও আগে এসব কাজে ওকে সাহায্য করত। একদিন রেলের এক ঠিকাদারবাবু এসে ওকে নিয়ে যায় রামপুরহাট। সেখানে রামলখন রাস্তায় মাটি ভরাট করত। ঠিকাদারবাবুর কাজ সেরে সন্ধ্যার বাসেই ফিরে আসত রামপুরহাট থেকে। ঠিকাদারবাবুই ওকে একদিন চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। রামপুরহাট স্টেশনে পানিপাঁড়ের চাকরি। এ এমন এক চাকরি যা নিয়ে কারও ঈর্ষার শিকার হতে হয় না। বরং জৈষ্ঠ্যের দুপুরে কিউল প্যাসেঞ্জর ট্রেনের যাত্রীদের আঁজলা ভরে জল খাইয়ে তৃপ্তি পেত রামলখন। ডেকে ডেকে জল খাওয়াত যাত্রীদের। বালতির জল শেষ হতে না হতেই আবার দৌড়ত নলকূপে। নলকূপে তখন কেউ জল নিলে, রামলখনকে দেখে তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়াত। তৃষ্ণার্ত যাত্রীদেব জল দিতে হবে। সুতরাং অন্যরা সবুর কবতে পারে। তৃষ্ণার্ত ট্রেন যদি হাজাব যাত্রী নিয়ে চোখের সামনে হুস্ করে বেরিয়ে যায় তা হলে তো স্টেশনেরই বদনাম। বামলখন তার কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দিযেছিল, সে এমন কিছু করে না যাতে কারও বদনাম হয়। পাহাড়ি গ্রামের মানুষ। সবুজ লতাপাতার মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে। সে দেখছে, নিদারুণ খরায় বনের গাছপালাও কেমন কষ্ট পায়। আমি পানিপাঁড়ে। আমার হাতে শুধু ছোট্ট একটা বালতি। পারলে তাবৎ বনভূমিকে আমি তৃষ্ণা মিটিযে দিতাম। শুখা মরশুমে এই একটা কষ্ট ছিল রামলখনের। বৃষ্টি বদলে তাবপর বনস্থলি ঘুরে দেখে আসত, ছোট চারাগাছগুলো বেঁচে আছে তো? ধুঁধুল লতা শুকিয়ে যায়নি তো? ঘুরে ঘুরে দেখত রামলখন। তারপর যখন দেখত ধুঁধুল লতায় কচি ফল জেগে উঠেছে, বাঁশ গাছের কোঁড়াগুলো বেড়ে উঠেছে গায়ে গতরে, সে স্বস্তি পেত। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন তা হলে পেশায় তিনি পানি পাঁড়ে। আকাশ তাঁর বড় বালতি। সেই বালতির ছায়ায় রামলখন নিজেকে দেখার চেষ্টা করত।

লাল খাপরা বসানো ছিমছাম বাড়ি, বজরা ক্ষেত, শশার মাচা, কয়েকটা ছাগল মুরগি আর সাবিত্রীর মতো সুখী বড় এই যার পৃথিবী তার আর বেশি কিছু দবকার নেই। উপরি পাওনা ওই চাকরি। কোনও অভাববোধে ভোগেনি রামলখন। তা হলে হঠাৎ সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাবে কেন?

আশেপাশের গ্রামে খবর রটে গিযেছিল প্রথম দিন। রামলখন বাড়ি ফেরেনি লোকেরা বলবে কেন? ওর বাড়ি না ফেরার কোনও কারণই যে নেই এটা ওরা জানে। তাই দু পাঁচটা গ্রামের লোক পরস্পবকে বলল রামলখনকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিকেল নাগাদ বুড়ো সরপঞ্চ কানাই খবর এনে দিল, না, আশেপাশের গাঁয়েগঞ্জে রামলখনকে

দেখা যায়নি। সাবিত্রী নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, হযতো কোনও কাজে আটকে গেছে, আজ একেবারে চাকরি নিয়ে ফিরবে। কিন্তু ফেরার সেই সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। রামলখন নেই। তবু শুক্লপক্ষের জোৎস্না পূর্ণিমার দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল রাত্রে। পৃথিবী আগের মতোই শান্ত। নিরুপদ্রব। শুধু পাড়া প্রতিবেশীর সমবেদনা কেরোসিনের ডিবের শিখা হয়ে সাবিত্রীর ঘরে জ্বলতে থাকল সারারাত।

পরের দিন ভোব হতে না হতেই ছেলে ছোকরারা বেবিয়ে পড়ল সিউডি রামপুরহাটের পথে। থানায় খোঁজ নাও। স্টেশন মাস্টারকে গিয়ে বলো। কাবুডোঙা, সোনাতোড়ের আত্মীযদেব বাডিতে গিয়ে দেখো, কোনও কাজে ছেলেটা আটকে গেল কি না।

স্টেশন মাস্টার হরিরামবাবুই প্রথম খবর দিলেন। দুপুরে কিউল প্যাসেঞ্জারের যাত্রীদের জল দিয়ে ছুটি নিল রামলখন। মাস পয়লা। আমি ভাবলাম, মাইনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চায়। তাই ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

রেলের এক কুলির নামও বামলখন। তাব কাছে পাওয়া গেল আবও একটু খবর। কিউল প্যাসেঞ্জারে চেপে স্বাদিনপুব গেছে রাম। গাই কিনবে বলে আগাম টাকা দিতে গেছে একজনকে। বলেছিল বিকেলেব ট্রেনে আবাব রামপুরহাট ফিরে এসে রোজকার মতো বাসাব বাস ধরবে।

স্বাদিনপুব স্টেশনে নেমে কোন গাঁয়ে রামলখনের যাওযাব কথা তা কী করে খুঁজে বেব করবে পাতাবাড়ির লোক? স্বাদিনপুরের আশেপাশে তো কত গ্রাম! কোথায খুঁজবে! জিজ্ঞেসই বা কববে কাকে!

থানার পুলিশ কিছু জানে না। হাসপাতালে খবব নেই।

থানাব গেটে ঢুকতেই পথ আটকেছিল সিপাই। পাতাবাড়িব তেইশ বছরের যুবক শিবু মুর্মুকে সে পাত্তাই দেয়নি।

দারোগাবাবুর কাছে আইছি। আমাদেব বামলখনকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দারোগাবাবু কী করবেন? উনি কি ওকে লুকিয়ে রেখেছেন? যা যা বাড়ি যা।

দারোগাবাবুর দায়দায়িত্ব অনেকটাই লাঘব করে দেয় এই সিপাই। গেট থেকেই বিদায় নিতে হয় শিবু মুর্মুর মতো গাঁ-গঞ্জের লোকদের। নেহাৎ যারা নাছোড়বান্দা তারা অবশ্য দারোগাবাবুর দেখা পায়। নালিশের নামে কী সব লেখাও হয খাতায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত। হারানো ছেলে ঘরে ফেরে না। কিনাবা হয় না চুবি ডাকাতিব। দারোগাবাবুব উত্তর একটাই : খুনে বজ্জাতে দেশ ছেয়ে গেছে। আমি আর ক'টা লোককে হাজতে পুবব? সম্ভব নয। যেমন চলেছে চলুক। সরকাব তো এইজন্যেই বড়হাজত তৈরি করেননি।

শিবু মুর্মু বাড়ি ফিবে এসেছিল। সিপাইয়ের চোটপাট দেখে তার অবশ্য খাবাপই লেগেছিল। কিন্তু সিপাইয়ের থেকেও সেই মুহূর্তে তার বেশি রাগ হয়েছিল বামলখনের ওপর। রামদাদা তুমি কেন ওই সিপাইটাব মুখে আমাকে ফেলে দিলে? গাঁয়েব বনবাদড়ে নেকড়েও আমাদের ভয় পায়। এমন যে তেজী চিতা সে পর্যন্ত চম্পট দেয়। তোমার

জন্যেই সিপাইটার মেজাজ আমি সহ্য করলাম। তা ব্যাটা যত কেউকেটাই হোক আমাদের গাঁয়ে এসে চোটপাট দেখাক দেখি। তা হলে বুঝব মরদ। মেজাজ দেখালেই ওরকম দু পাঁচটা সিপাইকে আমি মাঠে পুঁতে ফেলার তাকত রাখি।

দু তিনটে হাসপাতালে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি করে গাঁয়ে ফিরল ছোটন মাঝি, কালু ও জুর্গু। রামলখনের খবর নেই। এত বড় দুনিয়া। রামলখনকে কোথায় বা খুঁজে পাওয়া যাবে? ছোটন হতাশ হয়ে পড়েছে। কালু জুর্গুও কম অস্বস্তিতে নেই। তোমার জন্যেই হাসপাতালে গেলাম রামদাদা। আর যেন কখনও যেতে না হয়। যেখানে মানুষের রোগ নিরাময় হয় সেই জায়গায় এত নোংরা। এত দুর্গন্ধ!

ওদের সবার অভিজ্ঞতা এক। ওয়ার্ডে যেখানে সেখানে রোগীদের ফেলে রাখা হয়েছে। ওয়ার্ডে ঢোকার মুখেই পুঁজ-রক্ত মাখা তুলো, ন্যাকড়া, পচা বালিশ-তোশক ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। ভনভন করছে মাছি। মশার ঝাঁক উড়ে আসছে, যদি কিছু খাদ্য পাওয়া যায়। এবং পাবেই। রক্তমাখা তুলো ও ন্যাকড়া নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে বিড়াল কুকুর। খাবারের ভাগ নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়াও চলছে সব সময়। ঝকঝক করছে বাঁকানো দাঁত। আরশোলা ও আরও কতরকমের লোভী পোকামাকড়ও ছুটে এসেছে। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব ময়লাই এখানে জোগাড় করে এনে ফেলা হয়েছে। পৃথিবীর এটাই চূড়ান্ত দুর্গন্ধ। বছরের পর বছর জমে যাচ্ছে ময়লা। অথচ এরই মধ্যে ডাক্তার ও নার্সরা কেমন হাসতে হাসতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্গন্ধের মধ্যে অবলীলাক্রমে শ্বাস নিচ্ছে। হয়তো জীবন এটাই। পাতাবাড়ি গ্রামের বনজঙ্গলের গন্ধ, অজানা ফুলের সুবাস এগুলো মানুষের জীবনের সামাজিক সুখস্মৃতি। হাজার বছরের সেই সুখস্মৃতি এই দুর্গন্ধের কাছে মুহূর্তের মধ্যে ম্লান হয়ে যায়। জীবন মানেই সংকট। আর সংকটের সময় মানুষের জীবনকে আরও শোচনীয় করে তোলে হাসপাতালের এই পরিবেশ।

হাসপাতাল যখন তৈরি হয় তখনই সেই প্রথম ও শেষবার চুনকাম করা হয়েছিল দেয়ালগুলো। পোড়াবাড়ির দেয়ালও আজ এর থেকে ফর্সা। দেয়ালে নানা ছোপ। পুঁজ রক্তের হতে পারে। বলি, তোমাদের কি চুনকামেরও পয়সা নেই? নাকি পয়সা থাকলেও দেয়ালগুলো ঝকঝকে রাখার ইচ্ছে নেই তোমাদের। সরকারের এত টাকাকড়ি যাচ্ছে কোথায়? গাঁয়ের লাল মাটি এনে আমাদের নিকাতে দাও। আমরা তকতকে করে সব নিকিয়ে দেব। ঝাড়পুছ করে দেব। জুর্গু, ছোটন, কালু নিজেদের মধ্যে একথাই আলোচনা করেছে। হাসপাতালের ওই দুর্গন্ধেই মারা যাব। গাঁয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও শহরে হাসপাতালে যাবে না।

সাবিত্রীর কানে গেল এই সব কথা। কিন্তু রামলখনই যখন ফিরল না তখন আর এসব কথায় সে আঘাত পাবে কেন? বরং সে ভাবল আমি নিজেই একবার খুঁজে দেখব। যদি সত্যিই পাওয়া যায় ওকে। আশা ত্যাগ করেও করেনি। মন মানতে চায় না।

ছাগল মুরগিগুলো ছেড়ে দিয়ে দরজায় শিকল এঁটে খুব ভোরে সে বেরিয়ে পড়ল একদিন। পয়সা কড়ি নেই। প্রথমে সে হেঁটে যাবে রামপুরহাট। পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে।

স্টেশন মাস্টারের কাছে আবার নতুন করে খোঁজখবর নেবে। তারপর বেরিয়ে পড়বে আবার।

হরিরামবাবুকে কিছু বলতে হল না। সাবিত্রী ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি বলে উঠলেন, তুমি রামলখনের বউ। তাই না? তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি কয়েক রাত ঘুমোওনি। রামলখন ফেরেনি। ভাবিয়ে তুলল দেখছি।

বেয়ারাকে দিয়ে তিনি খাবার আনালেন। লজ্জা করো না। খেয়ে নাও। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি মনে হচ্ছে।

প্রথম যে রাত্রে বাড়ি ফেরেনি রামলখন, সেই রাতেই কান্না সব ফুরিয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর। কোথা থেকে সেই কান্নাই ফিরে এল এখন! ফিরে এল আরও প্রবলভাবে। রামলখন এখন স্মৃতি। রক্তমাংসের মানুষটার জন্য সাবিত্রী যতটা কেঁদেছে, তার থেকেও বেশি কাঁদছে অবয়বহীন এক স্মৃতির জন্যে। স্বামীর জন্যে হয়তো এটাই তার শেষ কান্না।

খবর এসেছে জগদীশপুরের মর্গে পুলিশ একটা বেওয়ারিশ লাশ জমা দিয়েছে পরশু দিন। গিয়ে দ্যাখ।

এ যেন সাবিত্রীর মৃত্যু পরোয়ানা। মানুষ শুনতে চায় না নিষ্ঠুর সত্য কথা। মেনে নিতে সময় লাগে। কিন্তু সাবিত্রীর মন এখন শক্ত হয়ে গেছে। নিজেকে সে সামলে নিয়েছে অনেকটাই।

জগদীশপুর? কতদূর বাবু?

বাসে এখান থেকে দেড় ঘণ্টার পথ।

শোন, এই শোন।

মাস্টারবাবু।

আমি বলছি না ওটা রামলখনেরই লাশ। তবু দেখে আয়। যদি সত্যি হয় তা হলে হাসপাতাল থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসিস। পরে কাজে লাগবে। আর এই দশটা টাকা রাখ।

অন্য সময় হলে হাত পেতে টাকা নিতে দ্বিধা করত সাবিত্রী। কিন্তু এখন হাত বাড়িয়ে দিল। ডানা থাকলে সাবিত্রী এখনই উড়ে যেত জগদীশপুর। তর সয় না।

বাসে পৌঁছতে অবশ্য প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। বাস স্ট্যান্ড থেকে খোঁজখবর নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছতে লাগল আরও আধ ঘণ্টা। আবর্জনা পাহাড়ের সেই যা ছোটন, কালু ও জুগ্গুকে করেছে বিরক্ত, তা সাবিত্রীর মনে কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল না। ওর আবেগ অনুভূতি আগেই ভোঁতা হয়ে গেছে। বাসে পুরুষদের ভিড়ে গায়ে গা লাগিয়ে আসতে এক সময় ওর প্রচণ্ড খারাপ লাগত। আজ লাগেনি। এদেশে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ নাই। ভিড়ের বাসে পরোক্ষভাবে হয়তো সেই সুযোগই করে দেওয়া হয়েছে। একসময় সে এসব কথা ভাবত। আজ ভাবনা চিন্তার সেই মনটাই হারিয়ে গেছে।

মাস্টারবাবু প্রায় ঠিক খবরই দিয়েছেন। তবে মর্গে কোনও লাশ জমা দেয়নি। ট্রেন থেকে পড়ে পাওয়া এক যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় তারা এসে হাসপাতালে ভর্তি

করে দিয়েছিল। সংজ্ঞাহীন, ক্ষতবিক্ষত সেই যুবক তার কিছু পরেই মারা যায়। এখানে বরফঘর নেই। তাই মৃতদেহ রাখা যায়নি। ছবিটবি তুলে রেখে ময়না তদন্তের পর সেই বেওয়ারিশ.লাশ কর্তৃপক্ষ পুড়িয়ে দিয়েছেন। রক্তাক্ত জামাকাপড় অবশ্য রেখে দেওয়া হয়েছে।

রামলখনের ছবি দেখল সাবিত্রী। চিনতে কষ্ট হয়। সারা মুখ ফোলা। চোখ দুটি বোজা। কপাল পর্যন্ত গ্রাস করেছে ব্যান্ডেজ। তুলোর পুলটিশে রক্ত বাগ মানেনি। রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে ব্যান্ডেজ লাল হয়ে গেছে।

কাঁদল না সাবিত্রী।

চিনতে পারিস?

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন। সে শুধু মাথা নাড়ল।

থানায় জমা দেওয়া আছে জামাকাপড়। নিয়ে যাস।

মাস্টারবাবু বলেছেন, তোমরা লিখে দাও যে আমার স্বামী মারা গেছে।

লিখে দিলে কি স্বামীকে ফেরত পাবি? হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে আমরা ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিই।

মরে গেলেও তো তোমরা লিখে দাও।

ডেড সার্টিফিকেট?

আগে থানায় গিয়ে স্বামীর জামাকাপড়গুলো নে। যা পাওয়া যায়। তারপর কাল আসিস।

কাল আবার আসতে হবে বাবু? বাড়ি তো ইখানে নয়।

তোর জন্যে তো কেউ সার্টিফিকেট লিখে বসে নেই। তা বলে তোর, ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কী হবে।

আমার স্বামী রেলে চাকরি করত।

ও, রেল থেকে বুঝি টাকাপয়সা পাবি?

তা তো জানি না বাবু।

তা হলে আর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কী করবি?। মানুষটাই যখন মরে গেল তখন শুকনো কাগজ নিয়ে কী হবে! যা কাল আসিস ভেবে দেখব।

ওটা দিতে হবে বাবু।

কেন, হুকুম না'কি?

মরে গেলে তোমরা জানাবে না?

কী করবি তুই যদি ডেথ সার্টিফিকেট না দিই? যা যা, ভয় দেখাস না। বললাম তো থানায় গিয়ে জামাকাপড় নিয়ে বাড়ি যা। পকেটে কিছু পয়সাটয়সা থাকলে পেতিস। কিছুই ছিল না শুনলাম।

সারা মাসের বেতন কোথায় গেল? সেইদিনই তো বেতন নিয়েছিল রামলখন। এ প্রশ্ন সাবিত্রী কাকে করবে? সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রেল লাইনের লাল সিগন্যালের মতো রক্তিম

হয়ে উঠেছে আকাশ। পাতাবাড়ি ফেরার শেষ বাসও হয়তো ছেড়ে গেছে অনেক আগে। বাতাস উতলা হয়ে উঠেছে। সেই গুমোট আর নেই। উতলা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে গন্ধ। দূর পাতাবাড়ির জঙ্গলের অজানা লতাপাতা বা ফুলের গন্ধ নয়, মৃত্যুকে ঘৃণা করাব মতো সাংঘাতিক এক গন্ধ পৃথিবীকে উপহার দিচ্ছে হাসপাতালের ময়লা পাহাড়।

ডেথ সার্টিফিকেট আমাকে আদায় করতেই হবে। দরকার হলে হাজার দিন ঘুরব। কিন্তু ওটা আমাকে পেতে হবেই। সাবিত্রী নিজেকে বলল। ভালো মানুষ হলে তোমাকে এভাবে অপমানিত হতে হবেই। এ দেশ এ নিয়মেই চলছে। না হলে বুঝতে হবে তুমি ধূর্ত, নাহয় সুবিধাভোগী। পাঁচজন ঝানু লোকের সঙ্গে স্বার্থের দেনাপাওনায় তুমি জড়িয়ে আছ।

হাসপাতাল থেকে বেরোতে না বেরোতেই হাসপাতলেব উর্দি পরা একটা লোক ওকে ডাকল।

তোব স্বামী মাবা গেছে?

হ্যাঁ বাবু।

আহা রে। তা কী হয়েছিল ওব?

টেরেন থেকে পড়ে গিয়েছিল বলছে। মবাব আগে তোর সঙ্গে শেষ দেখা হযনি।

না বাবু।

আহা রে। তা তোর দরকারটা কী বল। স্বামীব ডেথ সার্টিফিকেট চাস? দেব, জোগাড় করে দেব।

লোকটিকে সহানুভূতিশীল মনে হল সাবিত্রীব।

দেবে বাবু? পারবে?

পাবব না কেন? চল আজকেই দেব।

দু'শ টাকা লাগবে।

দু'শ টাকা? অত টাকা পাব কোথায়? ডেথ সার্টিফিকেট চাস, অথচ টাকা দিবি না। তা কি হয? দু'শ টাকা তো কিছুই না আজকেব বাজারে।

সাবিত্রী আর কথা না বলে হাঁটা শুরু কবল।

লোকটি ওর পিছনে আসছে। সাবিত্রী জোর পায়ে হাঁটা শুরু করল। লোকটিরও গতি বেড়েছে। হঠাৎ সে ওর হাত চেপে ধরল।

যাচ্ছিস কোথায়? ফেরার বাস পাবি ভাবছিস? চল, আমাব সঙ্গে সার্টিফিকেট চাস না? তোর স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট? আয, আমাব সঙ্গে, দেব।

সমস্ত মূল্যবোধের ডেথ সার্টিফিকেট।

শিবরাত্রি

ছ'মাস ধরে পুলিশের আনাগোনা লেগেছিল। সিতানপুর থেকে কালঝোরার টাঁড় পেরিয়ে লাল মোরামের যে রাস্তাটা কাঁসাইয়ের দিকে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তার পাশে হঠাৎ একজনকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মাস ছয়েক আগের ঘটনা। মাইল কুড়ি দূরের থানায় কে যেন খবরটা পৌঁছেও দিয়েছিল। পুলিশের জিপ এসে পৌঁছেছিল সন্ধ্যার আগেই। থানার মেজোবাবু রাইফেলধারী তিনজন সিপাইকে নিয়ে এসেছিলেন।

লাশ নিয়ে মর্গে যাবার আগে মেজেবাবু তাঁর পুলিশবাহিনী নিয়ে সিতানপুর আর কালঝোরা দুটো গ্রামেই তল্লাসি চালিয়েছিলেন। কার লাশ? দুটো গাঁয়ের কেউই জানে না। খুন করে লোকটাকে রাতের অন্ধকারে কারা ওখানে ফেলে রেখে গেছে অতঃপর এই খবর নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ল। কিন্তু রাত বাড়ছে দেখে মেজোবাবু আর ঝুঁকি নিলেন না। জিপে যেমন এসেছিলেন, তেমনি ফিরে গেলেন। তফাত এই, তার জিপে আর একজন আরোহী বাড়ল। এক আরেহী, চব্বিশ বা তিরিশ ঘণ্টা কিংবা আরও আগে যাকে নিঃশব্দে খুন করে ফেলা হয়েছে এই পৃথিবীতে।

সিতানপুর গ্রামে সেই সন্ধ্যায় সব জোয়ান বুড়োই সেদিন ঘরে ছিল। গাঁওদেবতি থানের পাশে মেজোবাবু সবাইকে তলব পাঠালেন। নানা খোঁজখবর নিলেন। এই গাঁয়ে কোনও শান্তিভঙ্গেব আশঙ্কা নেই তো? আশেপাশের গাঁগুলোর খবরই বা কী।

শান্তিভঙ্গ কথাটার অবশ্য কোনও মানে গ্রামবাসীরা খুঁজে পায় না। তারা যে ভাষায় কথা বলে তাতে শান্তি কিংবা তা ভেঙে কাচের পেয়ালার মতো চুরমার করে ফেলার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় মেজোবাবু সিতানপুরের গ্রামের জোয়ান-বুড়োদের মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে তাই ব্যর্থ হলেন। সাফ প্রশ্ন করলেন,

তোরা কেউ খুন করিসনি তো? সাবধান বলছি, কারও মনে কোনও কুমতলব থাকলে এখনই কবুল করে ফ্যাল। নাহলে নিজেবাই খতম হয়ে যাবি।

মুখ খুলল বৃন্দাবন। ছো নাচে। বছর দুয়েক আগে ছেলেছোকবাদের নিয়ে ছো-নাচের দলও খুলেছে একটা। ঝালদার ছুরিকাঁচির কারখানায় কাজ করত বৃন্দাবন। কাজের থেকে নাচেই ছিল মন। কাজ কামাই করে শান্তা ওস্তাদের নাচের দলের হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে নাচ দেখাত। তারপর নিজেই একদিন একটা দল খুলে ফেলল। দলের

নামডাকও হয়েছে ইদানীং। দুর্গাপুরের কারখানা, আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লাখনি থেকে ডাক আসে। লোকেরা আগাম বায়না করে যায়। নাচ যখন থাকে না বৃন্দাবন তখন 'জন' খাটে। 'জন' খেটে সেদিন সবে গাঁয়ে ফিরেছে। এমন সময় মেজোবাবুর তলব।

যাকে কেউ চেনে না তাকে কেউ হঠাৎ খুন করে বসে বাবু?

তোরা মুখে তো বলছিস লোকটাকে চিনিস না। এখন ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি পেটের সব কথা বের করে নিতে পারি জানিস। তখন আর নিস্তার পাবি না। বলে রাখছি।

শুধু সিতানপুরে এসে হামলা করলে হবে কেন? আশেপাশে তো আরও গাঁ আছে। কালঝোরা, হুকুমপুর, হাতিবাঁধা, ভালুককোঁদা। যাও না, ওসব গাঁয়ে খোঁজখবর নাও।

আজ না হয় কাল। খোঁজ ঠিক মিলবেই। কিন্তু তোরা খুব হুঁশিয়ার থাকিস বলে দিলাম। তুই ভাবিস না। নাচিস বলে আমাদের মাথা কিনে নিয়েছিস। সর্দারি ভেঙে দেব বেশি বাড়াবাড়ি করলে।

বৃন্দাবন বুঝতে পারে না তার দোষটা কোথায়! তাকেই বা বেছে বেছে মেজোবাবু এসব কথা বলছে কেন? সবাই অবাক।

জিপ স্টার্ট নিল। হরেকেষ্ট সেপাই তার মরচে-পড়া ভারী রাইফেল নিয়ে জিপে ওঠার আগে বৃন্দাবনের কাছে এগিয়ে এসে বলল—বুঝলাম ভাল নাচিস। তা বলে মুখের ভাষাটা ভাল হবে না কেন? গোটা পৃথিবীটা তোর নাচের ক্ষেত্র নয়। নাচের আসরে ধামসা শিঙার তালে তালে দুমদাম পা আছড়ালেই হল না, সহবতও শিখতে হয়। মেজোবাবু তোর গাঁয়ে এসেছেন। মান্যগণ্য ব্যক্তি। আর কি তোর গাঁয়ে আসবে ভেবেছিস?

মেজোবাবুকে অবশ্য আবার আসতে হয়েছিল। কয়েকদিন পরেই। সিতানপুরের রাস্তার লাল ধুলো উড়িয়ে তাঁর জিপ গিয়েছিল হুকুমপুরে। আবার খুন। হুকুমপুরে দিনদুপুরে একজনকে পিটিয়ে মারার খবর গিয়েছিল থানায়। বসতবাড়ির লাগোয়া এক টুকরো জমি নিয়ে ঝগড়া। তা থেকে মারপিট। দুই পড়শির লড়াইয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল আরও দশজন। সিতানপুরের বাঁক ঘুরে দিগন্তে জিপের লাল ধুলোর ঝড় দেখেই আসামীরা গাঁ ছেড়ে সোজা পালিয়ে গেল, যে যেদিকে পারে দৌড়ল। গাঁয়ে ঢোকার আগেই মেজোবাবু হাওয়াটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুলিশের লাঠি থেকে জিপ সব কিছুরই যে মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে তা মেজোবাবু জানেন। এবং সেই মর্যাদা ও গুরুত্ব তিনি কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেন না। তাই গাঁয়ে ঢোকার আগেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন পুলিশের জিপটাকে নিছক লাশ-বওয়া গাড়ি হতে দেবেন না।

হরেকেষ্ট সেপাই এক কাঠি সেয়ানা। গাঁয়ে ঢুকে দু তিন বউ-বাচ্চা যাকে পেল তাকেই সে পাকড়াও করল। হরেকেষ্টর জুনিয়র তারিণী কনস্টেবল। সে বলল, হরেকেষ্টদা, খেয়াল আছে তো আমরা ভ্যান নিয়ে আসিনি। বেশি লোক পাকড়াও করো না। শেষে আমাদেরই হেঁটে ফিরতে হবে।

মেজোবাবু মাথাগুনতি পাঁচজনকে ধরলেন। কোমরে দড়িবেঁধে তাদের জিপে তোলা হল। মুরগি যেভাবে ঝুড়িতে করে হাটে চালান দেওয়া হয় সেভাবে তাদের জিপে বসিয়ে দেওয়া হল। লাশও উঠল। লাল ধুলো উড়িয়ে জিপ ফিরে চলল থানায়।

মেজোবাবু জানতেন আবার আসতে হবে। যে পাঁচজনকে ধরলেন তাদের কাছ থেকে আজ আসামীদের নাম আদায় করে নিতে হবে। তারপরই আবার হানা দেবেন হুকুমপুরে। বড়বাবু অবশ্য সেদিনই বলেছিলেন কথাটা। লক্ষণ ভাল নয়। মাসখানেকের মধ্যে দু দুটো খুন। নজর রেখ ভাল করে।

কিন্তু নজব রাখা তো আব সম্ভব নয়। বিশেষ করে থানা যেখানে মাইল কুড়ি দূরে। আবার দৌড়তে হল থানার লোকজনদের। ভাল্লুক কোঁদা গ্রামে এক বৃদ্ধাকে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মেরেছে লোকেরা। বড়বাবু হুকুম দিলেন, এবার বেশি ফোর্স নিয়ে যাও। আগেই বলেছিলাম ওই মহালটায় ভাল করে নজর রাখতে হবে। এস. পি সাহেব এলেন বলে। হয়তো ডি এম সাহেবও এসে পড়বেন।

ডি এম, এস পি কেউ আসেননি। আবার দৌড়তে হল মেজোবাবুকে। বড়বাবু বললেন, জায়গাটা তো তুমি ভাল করে চেনো। তোমারই যাওয়া উচিত।

ভাল করে আর চিনি কোথায়। মাত্র দু বার গিয়ে পুরো একটা তল্লাটের কতটুকুই বা চেনা যায়।

তুমি তো দুবার গেছ। আমি তো একবারও যাইনি।

গেলেই দেখতেন কী বকম গা ছমছম কবে ওঠে। মাইলের পব মাইল শুধু চোরকাঁটায় ভরা টাঁড়। হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। লাল ধুলো আর মাঝেমধ্যে ঝিমধরা দু একটা গ্রাম। পৃথিবী গ্রহটার শেষ প্রান্ত বলে মনে হয়। মরুভূমিও এতটা ভয়ঙ্কর নয়।

তুমি কি ফিলজফি নিয়ে পড়তে? নাকি কবিতা-টবিতা লিখতে?

বড়বাবু প্রশ্ন করেন। বছরও ঘুরে আসেনি, মেজোবাবু এই জেলায় বদলি হয়ে এসেছেন। সে আসতে না আসতেই ইলেকশনের ঢাক-ঢোল বেজে উঠল। ল অ্যান্ড অর্ডার, ইলেকশন ডিউটি এসব নিয়েই মাস দুই কেটে গেল। তারপর বড়বাবু ছুটি নিয়েছিলেন মাসখানেক। মেজোবাবুর হেঁসেলের খবর তাই বিশেষ নিতে পারেননি। আর নতুন লোকের সম্বন্ধেই খোঁজখবর নেওয়া যায়, পুরনো হয়ে গেলে কে আর সে সব কথা তোলে! তখন সেটা ভাল শোনায়ও না। যেমন মেজোবাবুর স্ত্রী অঞ্জলি। বড়বাবু ছুটিতে যাবার আগে কলকাতা থেকে ফ্যামিলিকে এনেছিলেন মেজোবাবু। বড়বাবু বলে দিয়েছিলেন, এখনই যাও। এরপর আমি ছুটিতে যাচ্ছি। তোমার আর বেরনো হবে না। তিনি ফিরে এসে দেখলেন মেজোবাবুর লাল-টালি ছাওয়া কোয়ার্টার্সের জানলা দরজায় নতুন পর্দা ঝুলছে। বাইরেব বারান্দায় বেতের চেয়ার সাজানো। পরিবেশটাই কেমন যেন বদলে গেছে। মেয়েটিকে দেখার সেদিনই কৌতূহল হয়েছিল বড়বাবুর। মুখ ফুটে অবশ্য কিছু বলেননি। বিকেলবেলা হঠাৎ একদিন মেজোবাবুর কোয়ার্টার্সে চলে গিয়েছিলেন।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন মেজোবাবু আর ওঁর স্ত্রী অঞ্জলি।

আসুন, আসুন। অঞ্জলি, ইনি আমার ও সি, রামগোপালদা।

চলে এলাম, বুঝেছেন। সত্যেন তো আর কখনও নেমন্তন্ন করবে না। ফ্যামিলি এনে সবাই তো একদিন নেমন্তন্ন করে। ওর তো সে সব বালাই নয়।

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন বড়বাবু।

সত্যেন অর্থাৎ মেজোবাবু পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য বলে উঠলেন, ভেবেছিলাম একটু গুছিয়ে নিয়েই আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াব।

অঞ্জলি নিছক ভদ্রতাবশে হেসে মাথা নাড়ল।

ভারী সুন্দর পেয়ালাগুলো এনেছেন তো। কলকাতা থেকে এতটা পথ ভাঙেনি যখন বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

বাসনকোসন তো আমি ট্রাকে আনিনি। এগুলো সঙ্গে এনেছি।

সত্যেন বলল।

ভালই করেছ, না হলে হয়তো ভেঙে যেত।

অঞ্জলি উঠে চা করতে গেছে। বড়বাবু ভাবলেন, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। মেজোবাবু বোধহয় সবে তিরিশের কোঠায় পা দিয়েছে। মেয়েটির বয়স কত হবে? বাইশ-তেইশ? চেহারায় বেশ একটা রুচির ছাপ। একটা দূরত্ব রেখে কথা বলে। তাতেই ওর আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অধস্তন কর্মচারী সত্যেনকে না হয় পদাধিকারবলে তুমি বলা যাবে, কিন্তু এঁকে ওই দূরত্বের জন্যই আপনি বলে সম্বোধন করে যেতে হবে। সেইমুহূর্তে আরও একটা কথা মনে হল রামগোপালবাবুর। এখনকার ছেলেছোকরা পুলিশ অফিসারদের বউরা দেখতে বেশ সুন্দরী হয়। সুন্দরী মেয়েরা শোনা যায় পাতে পড়তে পায় না। তবে কি দিনকাল বদলেছে? নাকি সুন্দরীরা বেশি করে জন্মাচ্ছে এখন? এমনও হতে পারে যে, পরের বউদের শুধু সুন্দরীই মনে হয়। আর এই মনে হওয়া মানে তোমার বয়স এখনও তরুণ আছে। তুমি বুড়িয়ে যাওনি।

চা আনল অঞ্জলি। সঙ্গে ক্রিম বিস্কুট।

এই বিস্কুট তো এখানে পাওয়া যায় না। এখানে তো শুধু ধুলো আর কাঁকড়। আদিবাসীদের দেশ। এ বিস্কুট এখানে খাবে কে?

রামগোপালবাবু জানেন, এই বিস্কুট কলকাতা থেকে এনেছে অঞ্জলি। কিন্তু ফুরিয়ে তো যাবেই। তখন পাবে কোথায় এখানে? বিস্কুট আনতে সত্যেন আবার কলকাতা দৌড়বে? জেলার সদর শহরে হয়তো মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সে শহরও তো এখান থেকে ষাট মাইল! সত্যেনের কাজ বাড়ল। ওকে সরকারি কাজের নানা ছলছুতোয় মাঝেমধ্যেই সদরে পাঠাতে হবে বলে মনে হচ্ছে। তা হলে তো কাজটা আমারও বাড়ল। রামগোপালবাবু নিজেকে মনে মনে বললেন, এর নাম অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞ ও দূরদর্শীরা আগে থেকেই সবকিছু ভেবে নিতে পারেন।

রামগোপালবাবুর মনে এখন আরও একটা কাঁটা বিঁধে গেল। টাঁড়ের চোরকাঁটা। প্যান্টে অনেকগুলো বিঁধে যায়। একে একে ছাড়াতে হয়। সময় লাগে। এক আধটা চোরকাঁটার ভাঙা টুকরো আবার প্যান্টেই লেগে থাকে। প্যান্ট কাচাকাচি করার সময় সে-চোরকাঁটা আবার খসেও পড়ে। রামগোপালবাবুর মনে বিঁধেছে এরকমই একটি চোরকাঁটা। সত্যেনের সঙ্গে অঞ্জলিকে কতটা মানাবে? সুখের প্রশ্ন তুলছেন না রামগোপালবাবু। যে কোনও অবস্থাতেই যে কোনও মানুষ সুখী হতে পারে। অন্তত তাঁর নিজের এই ধারণা। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য। সত্যেনকে এখন থেকেই যেভাবে খিস্তিখেউড় করে লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাতে সন্দেহ হয়, ওর এই উগ্র বদমেজাজী স্বভাবটা বাড়িতে কতটা চাপা থাকবে? নাকি বাড়িতে আলাদা মানুষ সত্যেন? তা কি সম্ভব? ঘরে ও বাইরে দু রকম চেহারা নিয়ে মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলতে পারে?

রামগোপালবাবুর সন্দেহ অমূলক নয়।

জানেন, বাড়িতেও ও ইউনিফর্ম পরে থাকে?

অঞ্জলি রামগোপালবাবুকে বলল।

ইউনিফর্ম গায়ে আছে বলেই তো পুলিশের যত শক্তি। না হলে পুলিশের সঙ্গে আর পাঁচটা মানুষের তফাত কী!

আপনিও কি বাথরুমে ইউনিফর্ম পরে যান?

আমি? আমার কথা আর বলেন কেন?

চেহারাতেই তো পুলিশ-পুলিশ ছাপ পড়ে গেছে। ইউনিফর্ম না পরলেও তো লোকে পুলিশ বলে চেনে।

পুলিশ বলে আলাদাভাবে চেনানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না। আর পাঁচটা চাকরির মতোই পুলিশের চাকরি।

অহঙ্কারে ঘা খেলেন রামগোপালবাবু। মেয়েটি হাসতে হাসতে ছুরি মারল দেখছি! গম্ভীর হয়ে বললেন—

পুলিশ ছাড়া কে আর খুনে, চোর, বাটপাড়দের পিছনে দৌড়য়?

খুনেদের পিছনে আবার দৌড়তে হল মেজোবাবুকে, সিতানপুর অঞ্চলে। এবার খোদ সিতানপুরেই ধান-কাটা নিয়ে সংঘর্ষে তিনজন মারা গেছে। গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচজন। জিপে যেতে যেতে আবছা অন্ধকারে দেখা মুখগুলি মনে পড়ল মেজোবাবুর। গ্রামের এই লোকগুলিকে চেহারায়, পোশাকে যতটা নিরীহ মনে হয়, আসলে ওরা ততটা নিরীহ নয়। রুক্ষ লাল ধুলোয় ভরা জমিতে ধানই বা কতটুকু হয়। এবার ধান নেই বললেও চলে, অথচ সংঘর্ষ লেগেই আছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তার মতোই ভাবনাচিন্তা মেজোবাবুর। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা তাঁর মনে হল। অধিকারবোধ অত্যন্ত সাংঘাতিক একটা জিনিস। অধিকারবোধ একটু ক্ষুণ্ণ হলেই নিরীহ মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আবার কারও কারও থাকে দখলদারি মনোবৃত্তি, সেটা আরও মারাত্মক।

মেজোবাবুর আরও মনে পড়ল বৃন্দাবনের কথা। নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে ওই আদিবাসী যুবকের চোখ হীরের কুচির মতো ঝিকমিক করছিল। আবছা মানুষগুলোর মধ্যে স্পষ্ট চেনা যায় তাকে। বলা যায়, অনেক মানুষের ছায়া ছায়া ভিড়ের মধ্যে মেজোবাবু সেদিন ওই একটি মানুষকেই দেখেছিলেন যে সুঠাম শরীর নিয়ে আপসহীন দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। যুবকের ব্যক্তিত্ব সহ্য করতে পারেননি মেজোবাবু।

বৃন্দাবন কোথায়, বৃন্দাবন।

আজ্ঞে, সে তো নাই।

কোথায় সে? মারপিট করে চম্পট দিয়েছে? সেদিন তো মুখে বড় বড় কথা বলে গেল।

মেজোবাবু চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছেন।

বৃন্দাবন তো এখন এই গাঁয়ে নাই বাবু। ছো-নাচের দল নিয়ে আসর করতে গেছে।

বুড়ো ফেলুরাম হাত জোড় করে বলল।

মেজোবাবু ভেবেছিলেন, কোমরে দড়ি দিয়ে আজই ওকে সদরে চালান দেবেন। হল না। অক্ষম রাগে তিনি ফুঁসতে লাগলেন। ওদিকে বৃন্দাবন ওর ছো নাচের দল নিয়ে এখন ঝাড়সুগুদায় আসর জমিয়েছে। দিনসতেক আগে ওরা এখান থেকে রওনা দিয়েছে। ঝাড়সুগুদায় আসর শেষে যাবে রাউরকেলা। সেখান থেকে রায়পুর, ভিলাই। এক জায়গায় পালা করলে আরও এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন আসে। তাছাড়া এক এক জায়গায় দু তিন রাত্রির বায়না চার পাঁচ রাত্রিও ছাড়িয়ে যায়। বৃন্দাবনের ফিরতে এখনও মাস দুয়েক লাগবে।

কোথায় বৃন্দাবনের বাড়িটা আমাকে দ্যাখা তো?

মেজোবাবু বললেন।

ছোট্ট একটি আদিবাসী ছেলে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পিছনে গাঁয়ের মুরুব্বিরা। গ্রামের বাইরে বড় বড় কয়েকটা কাজুবাদাম গাছ। বহু পুরনো দুটো শাল গাছ। তারই মাঝখানে বৃন্দাবনের চালাঘর। মাটির তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে বারান্দা বা দাওয়া। দাওয়ায় পাশাপাশি তিনটি ঘর। দরজায় শিকল তোলা। একটা ঘরে বৃন্দাবন থাকে। পাশের ঘরটা ওর নাচের স্কুল। আর একটা ঘর মোটামুটি ফাঁকাই পড়ে থাকে। ছো নাচের মুখোশ, পোশাক, ধামসা শিঙা রাখা হয় এই ঘরে। বৃন্দাবনের নাচের দলের সঙ্গে এখন ঘুরছে ধামসা শিঙা মুখোশ। মেজোবাবু শিকল খুলে এই ঘরে ঢুকলেন। পশ্চিমের দিকে একটা জানলা সব সময় খোলা। কপাট নেই। ঘর যখন তৈরি হচ্ছিল সেই সময় বাঁশের কয়েকটা ছিটকি কাঁচামাটিতে লম্বালম্বি পুঁতে জানালায় একটা বেড়া দেওয়া হয়েছে। পাকা বাড়ির জানলায় যেভাবে লোহার রড লাগানো হয় অনেকটা সেইরকম ব্যবস্থা। মেজোবাবু ভাবলেন, কালবৈশাখীর ধুলোর ঝড়, বৃষ্টির ছাঁট কি এ ঘরে ঢোকে না? মাঝরাতে ঝড় বা বৃষ্টির ছাঁট জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলে ছোকরা কী করত? সেই মুহূর্তে মেজোবাবু কিন্তু

ভাবেননি যে হপ্তাখানেক পর ছন্নছাড়া এই ঘরটাই তাঁর বেডরুম হবে।

সিতানপুর থেকে থানায় ফিরে গিয়েই উনি অর্ডারটা পেলেন। সিতানপুরে একটা পুলিশ চৌকি খুলতে হবে। ওই অঞ্চলে খুন জখম লেগেই আছে। যে কোনওদিন আরও কয়েকটা লাশ পড়ে যেতে পারে। অবস্থা সামাল দিতে তখন বেশ বেগ পেতে হবে। সদর থেকে এস পি সাহেব নির্দেশ পাঠিয়েছেন, সিতানপুরে পুলিশ যেন অবিলম্বে রওনা হয়ে যায়। দরকার হলে উনি বড় দুটো তাঁবু এখনই সদর থেকে পাঠিয়ে দেবেন।

কিন্তু তাঁবুতে থাকা বড়বাবুর পছন্দ নয়।

পুলিশের শত্রু অনেক। রাতের অন্ধকারে তাঁবুতে কেউ যদি আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায় তখন জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে। পুড়ে মরতে হবে না, পুড়িয়ে মারবে।

বড়বাবুই পরামর্শ দিলেন, সিতানপুরে কারও একটা বাড়ি রিকুইজিশন করা যাক।

কার বাড়ি, ওখানে বাড়িই বা কোথায়?

কথাটা বলার পরই মেজোবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা বাড়ি অবশ্য রেডিমেড পাওয়া যাবে। বৃন্দাবনের সেই বাড়ি। বাড়ি ও চালাঘরের মধ্যে তফাত অনেক। তবু ঝাঁ ঝাঁ গ্রীষ্ম কিংবা হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে ওই চালাঘরই বাড়ির মতো আরামপ্রদ হয়ে উঠতে পারে। আরামের চেয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁইটাই অবশ্য আগে দরকার। তারপর অন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হলও তা-ই। সিতানপুরের মতো গ্রামে যতটা ভাল ব্যবস্থা করা যায়, করা সম্ভব তা-ই করলেন মেজোবাবু। অঞ্জলিকে অবশ্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি কোনও কথাই শুনল না।

ওখানে স্নানের অসুবিধা হবে। বাথরুম নেই।

গ্রামের মেয়েরা স্নান করে কোথায়?

গ্রামের বাইরে একটা বাঁধ আছে সেখানে।

তাও ঘোলা জল। সারা বছর থাকে না।

ওরা যদি ওখানে স্নান করতে পারে আমি পারব না কেন?

ওদের আবার স্নান? এক ঝিনুক জলে চড়ুইপাখিদের স্নান হয়ে যায়। বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় একটু জল জমলেই চড়ুইপাখি পালক ভিজিয়ে নেয়।

তুমি দেখেছ গ্রামের মেয়েদের স্নান করতে?

দুষ্টুমি করল অঞ্জলি।

সত্যেন হেসে ফেলল।

ঠিক আছে, আমি বরং হরেকেষ্টকে তোমার জন্যে রোজ দু বালতি জল এনে দিতে বলব। চট টাঙিয়ে একটা জায়গা স্নানের জন্যে ঘিরে নিলেই হল।

অত ভাবতে হবে না। আগে তো যাই।

জিনিসপত্রও বেশি নিয়ে যাবার দরকার নেই। মাসদুয়েকের মধ্যেই সব ঠান্ডা করে

দেব। এস পি সাহেবও নিশ্চয় একবার ট্যুরে আসবেন। তাঁকে কিছু বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন। ওখানেই দাঁড়িয়ে তিনি অর্ডার দেবেন, চৌকি তুলে নাও।

আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। মাঠ পেরিয়ে বাঁধের জলে স্নান, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে পাহাড়ি বাতাস আর রাত্রে আদিবাসীদের মাদলের ডাক।

ধামসা আর শিঙা শুনলে বুঝতে পারবে রাত্রিবেলা সমস্ত প্রান্তর কেমন কেঁপে ওঠে। ছো নাচের একটা দল আছে ওখানে।

বাঃ, তাহলে তো আরও ভাল। মহলা দেখা যাবে।

মহলা যে করবে সেই ছোকরাই তো বাইরে। আজকাল ছো নাচের দলের কদর বেড়েছে। মাঝমধ্যেই ওদের ডাক আসে। শিল্পাঞ্চলের লোকদের কাঁচা টাকা। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। টাকা ছড়ালে বোম্বাই থেকেও নাচের দল এসে বাড়ির উঠোনে অনুষ্ঠান করে যাবে।

ছো নাচ তো আর সেরকম নয়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটাখাটনির পর ওরা নাচে। ওদের নাচটাই আলাদা। কী সুন্দর সব মুখোশ ওরা তৈরি করে।

দেখে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু ঠুনকো। অল্পেই রঙ চটে যায়।

অঞ্জলির উৎসাহ অবশ্য কোনও কিছুতেই কমে না। চটপট সে জিনিসপত্র বেঁধে নেয়।

প্রেসার কুকারটা নিলে না?

ওখানের ওই ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্রেসার কুকারের শব্দ বড় বিশ্রী শোনাবে। তাড়াহুড়ো নেই। সারাদিন যথেষ্ট সময় থাকবে রান্না করার। তোমার কাজও এখন অনেক কমে যাবে। পুরো একটা থানায় টহল দিতে হবে না, ছোট একটা অঞ্চলে ঘুরতেই বা কত সময় যাবে।

সত্যিই অনেক সময় পেলেন মেজোবাবু। বৃন্দাবনের চালাঘরটাকেই তাঁরা গিয়ে দখল করলেন। বৃন্দাবনের কোনও আত্মীয়পরিজন থাকলে অবশ্য এভাবে ওখানে গিয়ে উঠতে পারেতন না। কিন্তু এখন গাঁয়ের মুরুব্বিদের জানিয়েই দিব্যি ওখানে ওঠা গেল। তিনটে ঘরের মধ্যে একটা ঘর হল মেজোবাবুর অফিস। পাশের ঘরটা লক আপ বা হাজত। তার পাশের ঘরটা তাঁর কোয়ার্টার্স।

লক আপের সত্যিই কি দরকার আছে? ছোট্ট ঘরে সাত আটজনের বেশি তো লোকও আঁটবে না? ধরো তোমাকে যদি দশ বা বারো জন লোককে আটক করতে হয়?

অঞ্জলি প্রশ্ন করল।

ধরা মাত্রই তো লোকদের সদরে চালান দেওয়া যাবে না। হাজতে রেখে জেরাও করতে হয়। একটা চুনোপুঁটিকে ধরে রুইকাতলাদের খোঁজখবর নেওয়া যায়। লক আপ একটা রাখতেই হবে।

যদি বেশি লোককে ধরতে হয়?

অঞ্জলি আবার প্রশ্ন করে।

তখন একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তা, তোমার স্নানের কী ব্যবস্থা করলে?

সত্যেন জিজ্ঞেস করে।

এই তো স্নান করে এলাম। বাঁধে এখনও জল আছে। কোমরের বেশি অবশ্য ডোবে না।

আমি কোথায় স্নান করব?

বাঁধে করে আসবে। যাবে আর কোথায়?

মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে ভাবলেই খারাপ লাগছে। স্নান সেরে আসতে আসতেই রোদে গা আবার তেতে উঠবে।

এখানে ঠান্ডা বেশি। রোদটা মিঠে লাগবে দেখো।

মাঠের ওই চোরকাঁটা। চোরকাঁটা ছাড়াতেই তো বেশ সময় যাবে।

এই তো আমি এতক্ষণ ধরে চোরকাঁটা ছাড়ালাম। শাড়ির পাড়ে আটকে গিয়েছিল। একমুঠো চোরকাঁটা। চোরকাঁটা। চেয়েও একটা বড় খবর আছে তোমার জন্যে।

অঞ্জলি রহস্য করে বলল।

একবার ঘরে এসো। তুমি তো ওই জিনিসটার কথা বলোনি।

সত্যেন ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাল। দুটো স্যুটকেস, একটা ফোল্ডিং খাট ও দুটো বেতের চেয়ার ঘরে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে অঞ্জলি। একটা কেরোসিন স্টোভ ও রান্নাব কিছু জিনিসপত্র একপাশে ছিমছাম গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

কী দেখাবে বললে?

ওমা, এখনও চোখে পড়েনি। জানলার দিকে তাকাও।

জানলার বাইরে ওই তো টাঁড় আর বিহারের ছোট পাহাড়। আর কিছু চোখে পড়ছে না। আকাশটা তো আছেই।

তুমি সব সময় বাইরে তাকাও। ভেতরটা দেখো না।

চেয়ারে উঠে জানলার ওপরে পেরেকে টাঙানো শিবের মুখোশটা পেড়ে আনল অঞ্জলি।

দেখেছো, কেমন সুন্দর।

মুখোশটা সে হঠাৎ সত্যেনের মুখে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

ছাড়ো, ছাড়ো। ভাল লাগছে না। বৃন্দাবনেব মুখোশ আমার মুখে দিতেই গা গুলিয়ে উঠছে।

বৃন্দাবনের নয়, এটা শিবের মুখোশ।

বৃন্দাবন শিব সেজে নাচে। মুখোশটা ওর। তা, এই মুখোশ ও ফেলে গেছে কেন?

এটা ঘরেই থাকে। শিব ওর দেবতা।

শোনা যাচ্ছে, ওই ছোকরাই গাঁয়ের যত গন্ডগোলের মূলে। 'জন' খাটার মজুরি বাড়ানো, গায়ের জোরে খাস জমিতে চাষ, মারদাঙ্গা এসবই ওর কীর্তি। ও এসেই অঞ্চলের উত্তেজনা বাড়িয়েছে। ও যখন ঝালদায় কাজ করত তখন এখানকার গাঁগুলো সব ঠিকঠাক চলত।

এখন গন্ডগোলটা কী শুনি? দিন দশেক হল আমরা এখানে এসেছি। গন্ডগোলের তো কিছু দেখছি না।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নাকি আগেকার দিনের ডাকাতদের মতো আগাম চিঠি পাঠিয়ে লোকেরা মারপিট করতে আসে? ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন ফেটে পড়ে। খবর পেয়েছি, নাচের দল নিয়ে ওই ছোকরা বাইরে যায়নি। আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লোকজন নিয়ে আজ রাত্রে নাকি হানা দেবে!

আজ রাত্রে যার জেগে থাকার কথা সেই মেজোবাবুই এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমোয়নি অঞ্জলি। বিকেল ও সন্ধ্যায় তার চোখের সামনে যে বীভৎস কাণ্ডটা ঘটল তারপর সে ঘুমোয় কী করে? সত্যেন ও কনস্টেবলরা গিয়ে দু তিনটে গ্রামের জনা বারো লোককে ধরে এনে লাঠিপেটা করে প্রায় আধমরা করে ফেলল। তারপর তাদের কয়েকটাকে আটকে রাখল পাশের হাজতে। হাজতে আর ঠাঁই নেই। বাকিদের মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কাজুবাদাম ও শালগাছগুলোর সঙ্গে। কাজুবাদাম ও শালগাছগুলোর নীচে চাপ চাপ রক্ত। লোকগুলোর মাথা ফেটে তখনও রক্ত চুঁয়ে পড়ছে। হাজতের লোকেরা এই একটু আগে পর্যন্তও চেঁচাচ্ছিল। বুকফাটানো চিৎকার। চিৎকার না আর্তনাদ! সত্যেনের কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না। এ ধরনের ঘটনায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ তাই তার মনে কোনও ছাপ ফেলে না।

অঞ্জলি শুয়ে শুয়ে ভাবছে এখানে না এলেই ভাল হত। অন্তত এই বীভৎস, দৃশ্যটা দেখতে হত না। ঘুমের মধ্যে সত্যেনের একটা হাত ওর গায়ে পড়তেই অঞ্জলি নিজেকে সরিয়ে নিল। আর সেই মুহূর্তেই ওর চোখ জানালায় গিয়ে পড়ল। একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে থেকে লোকটা জানলার বাঁশের ছিটকগুলো দু হাতে পটাপট ভেঙে ফেলল। অঞ্জলি এবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সত্যেনকে ডাকবে না। দরকার হলে সে নিজেই লোকটার মোকাবিলা করবে।

কালো ছিপছিপে একটি লোক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গাজন সন্ন্যাসীর মতো চেহারা। লণ্ঠন অল্প জ্বালানো আছে। সেই আবছা আলোতেই অঞ্জলি দেখল লোকটা দু হাত বাড়িয়ে নাচের মুখোশটা পেড়ে নিল। ঘুরে অঞ্জলির দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে দরজার হুড়কো খুলে বেরিয়ে যাবার আগে তাকাল সত্যেনের দিকে। ঘৃণা ও করুণায় ভরা দুটি চোখ। আর একবার দেখল অঞ্জলিকে। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে।

অঞ্জলি ওকে ওভাবে যেতে দেবে না। পিছু নিল লোকটার। পায়ের শব্দে বৃন্দাবন ঘুরে দাঁড়াল।

আপনি কেন এসেছেন?

মুখোশটা আমাকে দাও।

ওটা আমার জিনিস। আমি চুরি করতে আসিনি। নিজের জিনিস ফেরত নিয়ে গেলাম।

জানি মুখোশটা আমাদের ঘরে মানাবে না। কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকব বৃন্দাবন?

অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে বৃন্দাবন ওর মহাদেবকে অঞ্জলির কাছে রেখে গেল।

ছিটকিনি

সামান্য একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই অমল মাঝরাতে বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি। সেই অসাধারণ মানুষটির কথা সে জানত যে একটা রিভলভারের অভাবে আত্মহত্যা করতে পারল না। অমলের ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। যে ঘরে তার জীবন ভোঁতা তীরের ফলার মতো আধখানা বিদ্ধ হয়ে গেছে। তার পরিচিত দেয়াল, খুব চেনা জানালা কিছুই সে খুঁজে পেত না। দরজা আছে ভেবে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় কতবার অমলের মাথা ঠুকে গেছে অন্ধকারে। দেয়ালগুলো যেন এক একটা জমাট বোধ।

ডুবো পাহাড়ের মতো তারা লুকিয়ে রাখে সারারাত, দিনের আলো ফুটলে স্পষ্ট হয়, আর সে ভয় করে স্পষ্টতাকেই সবচেয়ে বেশি। জীবনে তার গোপনতা বলে কিছু নেই, অথচ কেন যে স্পষ্টতাকে ভয় পায় বোঝা যায় না। একবার অসুস্থ হবার পর ডাক্তারের পরামর্শ মতো অন্তর্ভেদী আলোর মেশিনের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েছিল খুব। ভেবেছিল কঠিন অসুখ। গোপনতা নেই, স্পষ্টতাও নেই! অদৃশ্য যা কিছু লুকিয়ে থাকে শরীরে, আমাদের তুলে ধরছে ভয়—সে ভেবেছিল রঞ্জনরশ্মি সেবার চোখের সামনে মেলে ধরেছিল বুকের ভিতরে ছোট্ট একটি তিলের মতো সাদা দাগ। ওরকম দাগ নাকি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ ছবিতে। সাদা দাগ দেখে ভয় পাওয়ার পর থেকেই সে সাদা স্পষ্টতাকে ভয় পেতে শুরু করে। তারপর থেকেই তার ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। কিংবা রাতের সূচনায়। শুরু হয় অন্তহীন পথ পরিক্রমা। জেগে এবং ঘুমিয়ে দেয়ালগুলো অনেকখানি সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়। হয়তো সে যত এগিয়ে যাবে, অনায়াসে হাঁটাচলা করতে শিখবে ঘুমের মধ্যে, দেয়ালগুলো আরও কিছুটা পিছিয়ে যাবে অন্ধকারে। কিন্তু থাকবে, ওরা থাকবে—অন্ধকারে লুকনো বাঘের মতো ওঁত পেতে। একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই এই দেয়ালগুলোকে পর পর ছোট বড অনেকগুলো দেয়ালের বিষণ্ণ গম্ভীর মালভূমিটিকে অমল কিছুতেই আজো জয় করতে পারল না।

বাতির সুইচে রাতের কুয়াশা লেগে আছে। আলো জ্বলার প্রয়োজন করে না। অন্ধকারে অমল টের পায় এই তার ছেলে, এই স্ত্রীর গোড়ালি থেকে শাড়ির প্রান্ত কিছুটা সরে গেছে, পাশ ফিরে সে শুয়ে আছে দেয়ালের প্রতি যেন সে আসক্ত মনে হয় ছাদের দিকে মুখ করে নেই, ছাদ যখন নেমে আসে মাটিতে মেঝের ওপর শরীর বিছিয়ে বলে আমি তোমাকে ভালবাসি—এর কোনও কিছুই রমা, তার স্ত্রী জানে না। অথচ অমল ভাবে মশারির জালের ওপারে থেকেও দেয়াল তার বাহু দিয়ে রমাকে জড়িয়ে আছে। সে ঘুমন্ত ভিতরের কামনা কখন আগ্নেয়গিরিরি মতো ফেটে পড়বে, কখন তার ঘুম ভাঙবে তার

জন্যে সে অপেক্ষা করছে, কিংবা ভাবছে আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় তাকে জাগিয়ে তুলবে এখনি, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কষ্ট পাচ্ছে আর অনর্গল বয়ে যাচ্ছে। আগুন মাখা নিশ্বাস, তার শরীরের বালি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমল সহজ হতে পারে না তার স্ত্রীর সঙ্গে। কেমন যেন ভয় পায়। মনে হয় শাড়ি সায়া ব্লাউজের ভিতর থেকে যে নরম স্পর্শকাতর মানুষটি গভীর মমতায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সে তার নয়। কলেজে পড়াকালীন এক তরুণ অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে পড়তে যেত রমা। দু' বছর পড়েছিল। ভাব হয়েছিল এক অল্পবয়সি ডাক্তারের সঙ্গে। খুব সহজেই ওর সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়ে যায়, স্বভাবে কিং বা আচার আচরণে কোনও আড়ষ্টতা কখনওই প্রকাশ পায় না। বিয়ের পরেও অনেকের সঙ্গেই সে সহজভাবে মেলামেশা করেছে, অন্তরঙ্গ হয়েছে। স্ত্রী ঘরকুনো হয়ে থাকুক যেমন অমল চায়নি, তেমনই আবার অনেক সময় ভুল বুঝেছে তাকে। নিজেকে কল্পনা করে সুখ পেয়েছে এক ব্যর্থ অসুখী মানুষ বলে (আসলে ওর ব্যর্থতাবোধ বাড়িয়ে তুলেছিল রমাই)। এরই মধ্যে এল ওদের ছেলে। দেখল এপারে গ্রাম, ওপারে গ্রাম—মাঝখানে শহর। ওরা এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে। মন খারাপের মধ্যেও ভালবাসতে পেরেছে তাকে, এই শহরতলিকে যেখানে বাস এসে দাঁড়াল, ওরা আর কোথাও গেল না, দুয়েকটি চায়ের দোকান, সুন্দর রাস্তা তালগাছ লাল কাঁকড়ের পথ, খোয়াই, সূর্যের দিকে ওরা তাকায় না, তাকিয়ে থাকে সন্ধ্যার তারার গোধুলিভরা আলোর দিকে। দু' প্রান্ত থেকে দুটি হাত—একটি নিরাভরণ, অন্যটি বেঁটে স্থূল ; ছুঁয়ে দেখে ছেলের মাথার চুল ; সংসারে আর কিছু নেই, শুধু এই সন্তান। তিন জোড়া চোখ দূরাগত নক্ষত্রের পদধ্বনি শুনতে পায়। ওরা জানে, উপলব্ধি করে এই শহর তার আকাশ এবার নিজেই খুঁজে পাবে। কিন্তু হয় না। শহরের অজগর শুকনো পাতার উপর দিয়ে, কখনও বা ঘাসে সড়সড় করে এগিয়ে যাবার সময় আগ্রাসী মুখ বাড়ায় ডিমসুদ্ধ পাখির বাসার দিকে, বাউল গানে যে পাখিটি চার যুগের ডিম পাড়ে, সেই পদ্ম যার শিকড় নেই, নেই বোঁটা, ভ্রমরের প্রেম উপভোগ করার আগেই তাদের গ্রাস করে, একটি গহ্বর অর্থাৎ পেট সরীসৃপের। চিরগর্ভবতী প্রেমিকার কথা যে লেখা হয়েছিল গুপ্ত সাধনার গানে, সে কোথায়? তাই স্ত্রীকে অমল ভাবে এক অচেনা অজানা বিদেশিনী। যেন তার জাহাজ ছাড়বে দূরে, সে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকার ঘরের ভূগোল ততদিন অমলের বেশ মুখস্থ হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে সে দেখে একটা বড় হলঘর। কার্পেটের ওপর বিছানো ঝকঝকে ডাইনিং-টেবিল, চেয়ার। টেবিলে বোন্ চায়নার সুন্দর বাসন, পাশে ফ্রিজ, রান্নাঘরে কুকিং রেঞ্জ, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ওয়ার্ডরোবে বেয়ারা ও বাবুর্চির সাদা ধবধবে পোশাক , নীল অন্ধকারে স্টেনলেসের সুদৃশ্য কল থেকে সরু জল বয়ে যাচ্ছে, চাবি বন্ধ করার লোক নেই, চারপাশে নেই মানুষ, আছে ছায়া, মানুষের ছায়া। এই নিশ্চুপ নিথর পরিবেশে একটা বেড়াল শুধু একা এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিজের লাল ছায়া নিয়ে গ্রহের মতো ঘুরছে। এরপর একক সত্যাগ্রহের একটা সর্বাত্মক শক্তি অমল টের পায় যখন দেখে তার ভিতরে একটা প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে, ভিখারিরা বলছে মন্দিরের দরজা নোংরা করো না। শ্রমিকদের ধাওড়া ও ব্যারাকের

চারপাশে সে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ, দূর থেকে দেখল দশজন মানুষ রমাকে চাইছে, একজন তার বুকে হাত দিল, কিন্তু রমাকে পেল না, আরেকজন খুলে ফেলতে চাইল তার পোশাক, কিন্তু রমা তখন তার থেকে অনেক দূরে, বোকা লোকটা জানত না গোটা শরীরটাই তার কবরখানা, আশাকে সে স্বপ্ন বলে ভুল করল, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মধ্যে কোনও প্রভেদ করতে পারল না, ঘুমের মধ্যে তার জন্ম, যে বাড়িতে এক হাজার বছর ধরে জ্বলছে আগুন সেখানে তার মৃত্যু—ঘাসের জঙ্গলে, তুষার ঝড়ে। পাথর খনিতে কাজ করার সময় সে বিদেশি বইয়ে পড়েছিল, পাথর ভেঙে কি তুমি রুটি বানাতে পারো? অমল রুটির কথা ভাবল আর তখনই তার মনে পড়ল রমার কথা। সংসারের প্রতি তার দায়দায়িত্বের বিষয়। মানুষের কাছে সে কোনও কিছু চাইতে পারে না। যে সব মানুষ হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকে অনেক দয়াদাক্ষিণ্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাদের সে চেনে না। অথবা চিনলেও ব্যক্তিগত কোনও দাবি তাদের কাছে সে পেশ করতে পারে না। ফলে সূর্যাস্তের আকাশের দিকে তাকিয়ে, কিংবা ঘরের গুহায় দাঁড়িয়ে অমল বুঝতে পারে ছিটকিনি সে কোনওদিনই খুলতে পারবে না। তবে আরও মনে পড়ল, অন্ধকারে ভয়াবহ রেলবাঁকের দৃশ্য, লাল সিগন্যাল, মৃত গুমটি মনের পরিত্যক্ত বউটির কথা। আজ রমা ও সে যে বিষুবরেখার দু' দিকে ছিটকে পড়েছে পরস্পরবিরুদ্ধ দুই মাধ্যাকর্ষণের টানে তারও কারণ বোধ হয় এই ছিটকিনি। তার রোগা জন্মভিতু ছেলেকে যে সে ভালবাসে তার কারণও কি এই নয় যে, কখনওই সে তাকে বিষণ্ণ দেখতে চায় না? মানুসকে ভালবাসার আগে অন্তত একবারও তাকে দুঃখী ভেবে নিতে হয়!

প্রতিটি ঘর তার নিজের জায়গায় থাকে। বাথরুমের জায়গায় বাথরুম, শোবার ঘর তার নির্দিষ্ট এলাকায়। শুধু মানুষের কোনও স্থির কেন্দ্র নেই, দুঃখের নেই কোনও স্থির নির্দিষ্ট উৎস। কেউ কারও দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে চলে যায় না, ছিটকিনিই কখনও সখনও বিগড়ে যায়—বিদ্রোহ করে। যেমন বাথরুমে গিয়ে সদ্যবিবাহিত সমীরবাবুর স্ত্রী বন্দী হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন আগে এবং কয়েক ঘণ্টা পর তাঁর অচেতন নগ্ন শরীর দরজা ভেঙে উদ্ধার করতে হয় পড়শীদের। অথচ এ রকম হবে কেউ আগে বুঝতে পারেনি। কেউ টের পায়নি যে আগের দিন সমীববাবুর হাতঘড়িটা চুরি গেছে। জানালার পাশের টেবিলে হাত বাড়িয়ে চোর সেটা নিয়ে গেছে। বোঝা গেল যখন সময় দেখার প্রয়োজন হয়েছিল। অমল জানে সমীরবাবুর ড্রয়িং রুমের ছিটকিনি ভেঙে একদল চোর একবার বেশ কিছু জিনিস হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আজ রমা ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে তার ছেলে। ওদের মায়ামমতা ও সংসারের প্রতি টান, প্রেম ভালবাসা চুরি করে মহাসময়ের ঘরে জমা দিচ্ছে কোন এক চতুর বুদ্ধিমান চোর যার মুখোমুখি হবার ক্ষমতা অমলের নেই। অমল ভাবল ওদের দুঃখ কষ্টের জন্যে সে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ওদের জন্যে সে কিছুই করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। অন্ধকারে আজ ওদের বিছানার চারপাশে সে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবল ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। রমাকে ঘুম থেকে তুলে বলবে আমি জেগে আছি, তুমি

জাগবে না? কিন্তু অমল পারল না. তার দু'হাতে কে যেন স্ক্রু এঁটে দিয়েছে মনে হল! অমল ভাবল বাইরে কাজে ও অকাজে কত সময় তার অকারণে নষ্ট হয়ে যায়। যখন ছেলে তার জন্যে একা লুডো বা ক্যারমবোর্ড সাজিয়ে বসে থাকে, সে আসতে পারে না। বাসস্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় তার নষ্ট হয় অনেক সময়। এমনকি যে চাকরিতে সে সর্বস্বপণ করেছে তাও খুব অর্থহীন মনে হয় তার কাছে। চাকরির টাকা থেকে তার সংসার চলে না। সন্ধেবেলা অন্য একটা অফিসে নিয়ন আলোর নীচে ঝুঁকে পড়ে তাকে পার্টটাইম আরেকটা কাজ করতে হয়। রমাকে নিয়ে কতদিন সে সিনেমা যায়নি, কতদিন ছেলেকে নিয়ে যায়নি চিড়িয়াখানায়। অমলের নদী ফুল পাখির প্রতি আলাদা কোনও আকর্ষণ নেই। শুধু এক ভাল-লাগা আছে। কিন্তু একটি নারী ও একটি শিশু সমস্ত নারী ও শিশুর প্রতীক হয়ে তাকে আকর্ষণ করে। সে আর দ্বিতীয় কোনও নারী বা শিশুর কথা ভাবতে পারে না। আগাগোড়া বিশ্বস্ত থাকতে চায় অমল তাদের প্রতি। অদম্য এক অধিকারবোধ গড়ে তোলে নিজের মধ্যে। নিজের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অমল নিজেকে দেখে। তখনই তার ক্লান্তি যায় বেড়ে। বাস্তবে সে ব্যর্থ নয়, কিন্তু বেশি তার ব্যর্থতাবোধ, যার অনেকটাই নিছক কাল্পনিক। কল্পনা থেকেই সে কালো ছবি এক তৈরি করে নেয় মনে : নদীর প্রাচীন মাছ যে গিলে খেয়েছিল শকুন্তলার হারোনো আংটি, পেটের মধ্যে ধাতব এক বস্তুর অস্তিত্বের অসুস্থতা নিয়ে ধরা পড়ল জালে। মোহনায় সে আর ফিরে যাবে না কোনওদিন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না সুতো কিংবা জাল তার স্বদেশে! শুধু তার অসুস্থতাটুকু সত্য হয়ে থাকল অমলের কাছে।

অমলের কাছে ভীষণভাবে সত্য আর ভয়াবহ মানুষের মতো শরীরী রক্তমাংসের এই শহর যা তাকে সময়হীনতার কোলে ছেঁড়া ঘুড়ির মতো ক্রমশ বাতাসের নীচের দিকে টেনে নিচ্ছে। সময় সে বুঝতে পারে না। কথা দিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে না কারও কাছে। সপ্তাহ বা মাস কেটে গেলে মনে হয় যেন একটা দিন বা কিছু শিথিল মুহূর্তের গুচ্ছ সে পিছনে ফেলে এল। নিজের সঙ্গে একান্তে দেখাসাক্ষাতের সময় সে এবার ঠিক করে নেয়। কিন্তু ঠোঁট নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে আজ নয়, অন্য কোনওদিন তাকে ছিটকিনিবিহীন চমৎকার এক বাড়ির সন্ধানে যেতে হবে যে বাড়ির দরজা ও জানলাগুলো সব খোলা, রৌদ্রে রৌদ্র সেখানে মিশে যায়, ছেলে তার জন্যে সেখানে লুডোর ঘুঁটি সাজিয়ে বসে থাকে কিংবা ক্যারাম বোর্ড, স্ত্রী সারা দিন অপেক্ষা করে স্বামীর জন্যে—শান্ত, সুন্দর, সংযত। কিন্তু সেই বাড়িতে যেতে পারে না বলেই নিজের সঙ্গে একটা বিরোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠে অমলের। বিরোধ পরিণত হয় যুদ্ধে। হয়তো না হলে বাঁচার কোনও অর্থ থাকত না। যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী এক প্রতিপক্ষের। সে যুদ্ধ করে বাঁচবে ; এই শহরের জীবনযাত্রার মালিন্য আর দীনতা তার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ সে নিজে।

কাচের অ্যাশট্রের গায়ে সিগারেট ঘষে অমল বহুবার দেখেছে তার গায়ে কোনও ফোস্কা পড়ে না। অ্যাশট্রের মতো মনে হয় শহরটাকে। একটা বড় ছাইগাদা হিসেবে

নিষ্ঠুরভাবে ক্রমাগত ব্যবহার করা হয় তাকে। একদিন বাসে সে ও রমা এসপ্লানেডের দিকে আসছিল। আলিপুরের পুরনো জেলখানা আর গুদোমের মতো বড় কয়েকটা অফিস পেরিয়ে বিকেলের বাস গঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসা খাঁড়ির ব্রিজের দিকে এগোয়। পাশে বস্তি। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু কাদা শুকোয়নি। বৃদ্ধ, বাতিল কঙ্কালসার একটা মোষ গরিব ছাউনিগুলোর সামনে মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে। মনে হল যেন যক্ষ্মা হয়েছে। কিছু শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পাশে। দুপাশে চাপা, ঘিঞ্জি জনবসতি। বাস হঠাৎ এক সবুজ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এল। যে বাড়িগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তাটার গলা চেপে ধরেছিল হঠাৎ তারা যেন কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে রাস্তাটাকে দুপাশে অনেকখানি চওড়া করে দিল। যাকে অমল ভেবেছিল সফেন সবুজ সমুদ্র, দেখল তা নয়—বিশাল বিস্তৃত এক রেসকোর্স। এবারের বর্ষায় ঘাসগুলো খুব সুন্দর বেড়েছে। আজ রেস নেই। লোহার শিকের বেড়াগুলোয় দুয়েক ফোঁটা জল। মুক্তোর মতো। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। এসপ্লানেড পৌঁছনোর আগে হঠাৎ ওরা এক সুন্দর সাদা মন্দির দেখে নেমে পড়ল তার সামনে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গেট পেরিয়ে যাবার পথে নরম, রোগা একটি ছেলে ভিক্ষে চাইল ওদের কাছে। সদ্য যেন গ্রাম থেকে এসেছে মনে হল। কিংবা সে শহরেই আছে গ্রামের অধিবাসী হয়ে। এ আজ কয়েক বছর আগের কথা। তখন বুবুল আসেনি। ছেলেটিকে ওরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরল অনেকক্ষণ। স্মৃতিসৌধের আয়নার মতো ঝকঝকে সাদা সিঁড়িগুলোয় কাদা লাগল ওর ছোট্ট পায়ের। পায়েব ছাপ পড়ল পাথরে। সাদা মার্বেলের পাশাপাশি কালো মার্বেল। ঘন বুনট দাবা বোর্ডের নক্‌শা। এত পরিষ্কার, তকতকে একটা বাড়ি—কিন্তু কোথায় যেন কিসের অভাব বোঝা যায়। ছবিগুলো শুধু ছবিই। কাঠেব আলমারিগুলো বড় বেশি কাঠের। কাচে ময়লা ঘোলাটে আলোর ছায়া পড়ে শুধু। বাইরেব সুন্দর বিকেল, চমৎকার পোশাক পরা তরুণ-তরুণী, ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতা, শৌখিন নুড়ি পাথরের পথ, মূর্তি, মালা ও জাদুঘরের গাদা বন্দুকের ঠাসাঠাসি ভিড়ে কাদা মাখানো নরম পায়ের ছাপ ওই অসম্পূর্ণতার পরিবেশে আশ্চর্য এক সিম্ফনির সৃষ্টি করল। অন্ধকারে লেকের প্রান্ত ছুঁয়ে ওরা সেদিন অনেকক্ষণ বসেছিল। শিশুটির চোখ নয়, নয় মায়াবী চেহারা, শুধু তার রোগা দুটি পায়ের কথা বারবার ওদের মনে পড়ল। ওই পা ধারণ করে শরীরকে। শরীরের ডানা ধরে ঝুলে থাকে দুটি হাত, যা পৃথিবীর সমস্ত ছিটকিনি খোলে এবং বন্ধ করে। ছেলেটির অপুষ্ট টালমাটাল দুটি পায়ের প্রসঙ্গে অমলের নেহাত আকস্মিকভাবেই, কার্য কারণের যোগাযোগ না থাকলেও, প্রথমে একটি ছোট্ট ভীষণভাবে জ্যান্ত ছিটকিনির কথা মনে পড়ল। ছিটকিনি থেকে সে প্রবেশ করল বৃহত্তর জগৎসংসারে যার কেন্দ্রে আছে সৎ ও সরল একটি শিশু ও তার সঙ্কোচহীন স্বাভাবিক ব্যবহার। হাত বাড়িয়ে কিছু চাইতে তার দ্বিধা নেই, অমল যা পারে না, তা সে অনায়াসে পেরেছে—মানুষের মধ্যে ড্রয়ারগুলো সে খুলে খুলে দেখেছে, ড্রয়ারের ভিতর তন্নতন্ন করে দেখেছে, রুপোর জরি দেওয়া জামাকাপড়, পুরনো চিঠির তাড়া ও সিঁদুর মাখানো গিনি। সমস্ত পৃথিবীর বুকে আলোড়ন তোলে তার পা। পা অর্থাৎ ছিটকিনি, যে জানে

স্বর্গের দরজা খোলার মন্ত্র। স্বর্গে সাজানো বেশ কিছু ঝকঝকে টেলিফোন ও অতপ্ত রবার স্ট্যাম্প। নগ্ন শরীরের ডিম। ডিমের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে প্রেমিকাকে উপলক্ষ করে কে যেন বলল—তুমি কি সেই মেয়ে যে আমাকে আফিম দিয়েছিলে? নেশা না করে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো বেঁচে থাকা কিংবা জীবনের উদ্দেশ্য কী সে জানে না।

সেদিন লেকের জল ছুঁয়ে বসেছিল ওরা দুজন। বিপরীত স্বভাবের দুটি চরিত্র। বিষণ্ণ আত্মমুখী গম্ভীর অমল। অন্যজন উচ্ছল, ব্যাপ্ত, মুখর। ওদের মাঝখানে অদৃশ্য একটা কাচের দেওয়াল। রমা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে দেয়ালে প্রতিহত হল। কিন্তু বুঝতে পারল না। হয়তো সে কিছুক্ষণ বুকে মাথা রাখল অমলের কিংবা কাঠের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল, কিন্তু ঠোঁটের মাংস মাংসের স্বাদ পেল না, বুকটা যেন ঠান্ডা হিম পাথরের চাতাল, কিংবা ফাঁকা তোবড়ানো টিন, আঙুলে টোকা দিলে ঢপ্ ঢপ্ করে শব্দ উঠবে। যে কথাগুলো বলল অমল তারও কোনও পারম্পর্য খুঁজে পেল না রমা—

বড়বাবুর স্ত্রীর ক্যান্সার। জরায়ুতে—

বড় সাহেব বিলাত যাচ্ছেন—সেলস প্রোমশন—

নতুন একজন রিসেপনিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে—

সমস্ত শরীরটা যেন ওর হাওয়া দিয়ে তৈরি—

ছোটবেলায় আমগাছ থেকে পড়ে আমার একবার হাত ভেঙে গিয়েছিল, জানো? --

অমল বোধ হয় কিছু জানাতে চায় রমাকে অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে। পারছে না, গুছিয়ে কোনও একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার মানসিকতাই বোধ হয় তার তৈরি হয়নি। কিংবা একটা চিন্তা থেকে আরেকটা চিন্তা সে খুব দ্রুত পেরিয়ে যায়। মাঝখানের সরু কোমরের মতো ঝর্না বা ছোট টিলা যখন সে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় অন্যেরা বুঝতে পারে না। কোনও কিছু সে বাখ্যা করে বলে না। তার পছন্দ নয় বিস্তার, গভীরতার দুয়েকটি ইঙ্গিত সে শুধু ফুটিয়ে তুলতে চায় জীবন দিয়ে। ছোটবেলায় যখন সে গ্রামে থাকত, স্টেশন ছিঁড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়া মেলট্রেনের কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ তাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলত। কিছু স্ফুলিঙ্গ আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। অন্ধকার তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমল যখন কথা বলে, কিংবা কোনও কিছু চিন্তা করে, তার মনে পড়ে এই স্ফুলিঙ্গের ছবি। বন্ধুরা যখন লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়, অমল গ্রামের হারান মাঝির কথা ভাবে। কোচড় থেকে সে বের করত চকমকি। বিড়ি ধরাত। দুটি পাথর ঠুকে ঠুকে তার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে অমলের। যে আগুন শিখাসর্বস্ব, যেখানে থাকে না কোনও স্ফুলিঙ্গ বা প্রাণ তা অমলকে কোনওমতেই আনন্দিত করে না। স্ফুলিঙ্গের মতোই তার জীবন এবং কথাবার্তা যা অনেকের কাছেই অসংলগ্ন মনে হতে পারে।

অমল তুমি কি সুখী?—এক সময় সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে।

সুখী, হ্যাঁ সুখী ছাড়া আর কী?

তুমি কি দুঃখী?

দুঃখ আমার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

কেন সুখী, দুঃখেরই বা কারণ কী?

সুখ না দুঃখের আসল কারণ মানুষ কখনও তলিয়ে দেখে না। যারা দেখে, তারা ওই দুটোরই জাল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বহু বিচার বিশ্লেষণ করেও অমল নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। তার অবস্থা অনেকটা সেই মাছের মতো যে বড়শির টানে জলের গভীরে প্রাণপণ এদিক ওদিক ছুটে যায়, যত ছোটে ততই অনুভব করে সুতোর টান, মুক্ত করতে পারে না নিজেকে, শালুক, শাপলা ও শামুক কাছিমের সুন্দর জগৎ থেকে এভাবে তার বেদনাদায়ক চিরবিদায়ের মুহূর্ত নিদারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু আবার এমনও মুহূর্ত আসে যে, অমল ওই লোভী, সমস্যাপীড়িত মাছের সঙ্গে কোনওভাবেই নিজের তুলনা করতে পারে না। রবিবারের দুপুরে একদিন শুয়েছিল বিছানায়। সাবা সপ্তাহ জুড়েই তার কাজ। সেদিন সত্যিই ছুটি। খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমের মিষ্টি একটা আমেজে সে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। গরমের দিন। খালি গা। ফ্যান ঘুরছে। আলতো নরম আঙুল দিয়ে কে তখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠে। পাশ ফিরে অমল দেখল বুবুল। ছ' বছরের ছেলে। এখন থেকেই ও সব কিছু জানে। বাবা মার ঝগড়া হলে কষ্ট পায়। দুজনকে থামাতে চেষ্টা করে। মাসের শেষে যখন দেখে অভাব, আবার থালায় নেই বরাদ্দ এক টুকরো মাছ, কিংবা দুধ একটু জলো, সে সব কিছু টের পায়। কোনও কিছুই এড়িয়ে যায় না তার চোখ। তখন সে বিস্কুট বা লজেন্সের জন্যে বায়না ধরে না। যা পায় খায়, ঘুমিয়ে পড়ে, খুব ভোরবেলা উঠে নিজে থেকেই মুখ ধুতে যায়, চা, রুটির জন্যে অপেক্ষা করে না, বই খুলে পড়ে। কিন্তু অমল ওর এই শান্ত সুন্দর স্বভাবের জন্যেও সুখী হতে পারে না। ভাবে ওর মুখের হাসি সে কেড়ে নিচ্ছে। ওকে আদর করার সময় অপরাধী মনে করে নিজেকে। কিন্তু সেদিন ছেলে যে ওব পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আব সে যখন পাশ ফিরে ওকে দেখল কী যেন হল অমলের। বুবুলকে সে কাছে টেনে নিল—

তোমাকে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না, তুমি আমার বুকে এসো।

রমা বিছানার পাশে বসে অমলের মাথার চুলে, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বুবুল দেখেছে। কিন্তু মায়ের অনুকরণ করে সে তার বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়নি, দিয়েছে নিজের মমতায়। বাবা যে সাবা দিন বাড়ি থাকে না, ফেরে অনেক রাত করে, এমনকি বহু দিন যে তাব বাবার সঙ্গে কথা পর্যন্ত হয় না—এ সব কিছুই কি ছেলেকে তার বাবার প্রতি মমতাশীল, স্নেহময় করে তুলেছে? যে মমতা ওই বয়সের ছেলের কাছ থেকে বড় একটা আশা করা যায় না? অমল খুব সুখী হল সেদিন। বিকেলে বেড়াতে গেল ওরা তিনজন। ছেলে বউ যাতে বাসের ভিড়ে কষ্ট না পায়, অমল, একটু বেহিসেবি খরচ করল। আসা-যাওয়ার পথে মিনি বাস নিল, রেস্টুরেন্টে খেল আর ছেলেকে কিনে দিল বেশ দামি একটা মেকানো।

কিন্তু যখন রাত এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে নিঃসঙ্গতা ও নগ্নতার চরম মুহূর্ত, অমল পুরোপুরি বদলে যায়। যে স্ত্রী তার একান্ত আপন তাকে মনে হয় যেন সে তার নয়। অচেনা মানুষের সঙ্গে যেন পান্থশালার একটি বিছানা শুধু একটি রাতের জন্যে ভাগ করে নিচ্ছে। অমল ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় সারা ঘর। ঘর তো নয়, যেন নদী। ভবজলধি। স্রোতে ভেসে বাইরে ছিটকে পড়তে চায় সে। হাতছানি দেয় ঘাস ফুলে ভরা মাঠ, হেমন্তের কাশবন আর মেঘের রাজবাড়ি। অমল একা যাবে না, সবাইকে নিয়ে যাবে। পুরনো দিনের সুন্দর একটা বাসে চেপে ওরা যাচ্ছে। প্রতি চটিতে থামছে বাস। ঘরোয়া আমেজ। কন্ডাকটার প্রতিদিনের চেনা যাত্রীদের নিয়ে রঙ্গরসিকতায় মেতে উঠছে। বাস গন্তব্যে পৌঁছনো নিয়ে কারও কোনও ব্যাকুলতা নেই। বাসের সিটে বসে আছে মাথায় কাঠের চিরুনি ও টকটকে লাল জবাফুল গোঁজা সাঁওতাল যুবতী, হাট ফেরত ওঁরাও যুবক, বাসের মাথায় কয়েক ঝুড়ি তাজা মোরগ মুরগি, বরজের পান। বাইরে শরতের মেঘ, রৌদ্র, হাওয়া। দূরে গৈরিক ময়ূরাক্ষীর জল। সবুজ ধান মাঠ। জলভর্তি ক্ষেত। মাঝেমধ্যে পাথুরে জমি। বাংলা বিহার সীমান্ত। সুন্দর গাছের ছায়া। গোল করে গাছের তল বাঁধানো। চায়ের দোকান। পাথর কোয়ারির মালিক মোটর বাইক থামিয়ে গল্প করছে পাহারঅলার সঙ্গে। দূরে মাসাঞ্জোরের পাহাড়ের মেঘ। বড় বাঁধের জল তিলপাড়া ব্যারাজে পৌঁছতে সময় নেয় আট ঘণ্টা। জলের মতো নিশ্চিন্ত আরামে বয়ে যায় যাত্রীরা, কোথাও পৌঁছনোর জন্যে তারা উতলা হয় না, সন্ধেয় ফিরবে বলে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে এসে বসে থাকে বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু ওদের মতো অমলের যাওয়া হয় না, শুধু একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য যে সামান্য একটা ছিটকিনিই অমলের জীবনে প্রবলতম বাধার সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই ছিটকিনিই সে খুলল। হঠাৎই তাকে দিয়ে যেন কেউ খোলাল বাইরে থেকে। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে অমল, বিছানার চার পাশে, ড্রেসিং টেবিলের পিছনে গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় কড়া নড়ে উঠল দরজায়। কে ডাকছে দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে বাইরে থেকে। সম্বিত ফিরে পেল অমল। ছিটকিনি খুলল। কোনও কষ্ট হল না, এতটুকুও ভয় পেল না সে। বাইরে দাঁড়িয়ে রহস্যময় এক ডাকপিওন। তার হাত থেকে বরফের ধোঁয়া মেশানো, ঠান্ডা সাদা সরবতের মতো টেলিগ্রামটা অমল চেয়ে নিল। টেলিগ্রামটা ফিরে গেল আবার পিওনের হাতে। ভুল ঠিকানায় ভুল মানুষের টেলিগ্রাম।

নতুন চাকরি আমার—এ পাড়ার কাউকেই চিনি না।

আমিও নতুন—মনে মনে বলল অমল। এক পাড়ায় একাদিক্রমে বহু বছর থাকলেও সে নতুন। পড়শিদের কাউকেই চেনে না, দেখাসাক্ষাৎ হয় না কারও সঙ্গে। অমল দেখল টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে ডাকপিওন সাইকেলে উঠছে। টেলিগ্রামটা লাল। অমল নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল মরচে পড়েছে। মরচের রঙে লাল হয়ে গেছে টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটাকে ওর শরীরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে হয় এবার। ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে টেলিগ্রামটা চলে যাচ্ছে দূরে—ক্রমশ তার নাগালের বাইরে। ওকে

ডাকবে, অমল ভাবল। কিন্তু ডাকল না। যে চলে যাচ্ছে সে আর ফিরে আসবে না। ছিটকিনি লাগাল অমল।

এবার বাড়ি ফেরার পথে, ঘরের ভেতরে সে ভাবল, যে গল্পটা নিজের মধ্যে লেখা শুরু হয়েছিল এতদিন, এব পর তাকে এভাবেই আরম্ভ করবে। অর্থাৎ শেষ থেকে, হারিয়ে যাবার জন্যেই চিরদিন লেখা হয়ে থাকে মানুষের হৃদয় নামক রহস্যময়, রঙিন, শতচ্ছিন্ন আকাশে।

মাঝনদীর বাসিন্দা

পৃথিবীতে কত সেতু এখনও বাঁধবার আছে. কত পথ গড়ে তুলতে হবে। অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে কথাটা প্রায়ই মনে হয় ঘনশ্যামের। ওপারে পাণ্ডবেশ্বর। এপারে ভীমগড়। একসময় যা ছিল বনাঞ্চল, তাই এখন পাণ্ডবেশ্বর-রানীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। পাঁচ পাণ্ডব নাকি ওখানে বনবাসে এসেছিলেন। বনের সবুজ গাছপালা মাটি চাপা পড়ে কয়েক হাজার বছর আগে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর-ভীমগড়ের মধ্যে আছে রেলসেতু। অণ্ডাল থেকে সাঁইকিয়া ট্রেন চলাচল করে। সাহেবরা এই রেল লাইন তৈরি করেছিল। রেলসেতুটিও তাদের তৈরি। কিন্তু পাশাপাশি সড়কসেতুটি আর তারা তৈরি করে যায়নি। তাই বর্ষায় যখন অজয়ের বুকে নেমে আসে গেরুয়া জলের ঢল তখন ভীমগড় থেকে পাণ্ডবেশ্বরের দিকে যাওয়া আসার রাস্তাটাই অকেজো হয়ে যায়। সেতুর দরকার। সারা বছর যে সেতু খোলা থাকবে। যার ওপর দিয়ে পথচলতি মানুষ আসা যাওয়া করবে। যাবে ট্রাক, গাড়ি, সাইকেল। সড়কসেতুর অভাবে বর্ষায় আশেপাশের মানুষকে সত্যিই খুব দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

তখনই কথাটা মনে হয় ঘনশ্যামের। এরকম আরও কত জায়গায় যে সেতু বাঁধবার আছে। নতুন নতুন কত পথই যে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

সেতু না থাকায় অবশ্য আখেরে লাভই হয়েছে ঘনশ্যামের। লোকে বলে ঘাটোয়াল ঘনশ্যাম। কারণও আছে। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত বাদ দিয়ে বছরের পাঁচ ছ' মাস অজয়ের বুকে অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়। পাথর ও চাঙড়া চাঙড়া মাটি ফেলে গড়ে তোলা হয় রাস্তা। শুখা মরশুমে অজয় ঘুমিয়ে থাকে। শীর্ণ জলের ধারা আঁকাবাঁকা স্রোতে বয়ে যায়। দু এক জায়াগায় অবশ্য জল গভীর থাকে। সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয় কংক্রিটের হিউম পাইপ। বড় গোল গোল পাইপের ভিতর দিয়ে জল বয়ে যায়। বাকি রাস্তাটা শুধু মাটি আর পাথর। ট্রাক, বাস, সাইকেল, টেম্পো চলাচলের আর বাধা থাকে না। অজয়ের এই ঘাটের মালিক তখন ঘনশ্যাম। জেলা পরিষদের কাছ থেকে এই ঘাট সে ডেকে নেয়। বদলে জেলা পরিষদকে সে দেয় হাজার পঞ্চাশেক টাকা। সেতুর ওপর সরকার যেমন টোল ট্যাক্স আদায় করে তেমনি ঘাট ডেকে নেওয়ার পর চলাচলকারী বাস ট্রাক গাড়ি টেম্পোর কাছ থেকে 'তোলা' নেয় ঘনশ্যাম। 'তোলা' দিয়েই ঘাট পারাপারের নিয়ম।

'তোলা' মানে কাঁচা টাকা। রানীগঞ্জ কালীপাহাড়ি আসানসোল থেকে ট্রাক ট্রাক কয়লা আসে এপারে। আবার এপার থেকে লাইন দিয়ে ট্রাক যায় কয়লা আনতে। দিন রাত চলে এই বেসাতি। ঘাটোয়াল ঘনশ্যামের 'তোলার' মোটা টাকাটাই আসে এই ট্রাক

থেকেই। পারানির এই ব্যবস্থা না থাকলে ট্রাকগুলোকে ইলামবাজারের পাকা সেতু হয়ে পানাগড় দিয়ে আসা যাওয়া করতে হত। মাইল চল্লিশেক ঘুর পথে অর্থ ও সময় দুটোরই সাশ্রয় হত না। ঘনশ্যাম জানে ট্রাকগুলোই তার লক্ষ্মী।

মানবী কোনও লক্ষ্মী কিন্তু আজও এল না ঘনশ্যামের জীবনে। বয়স এই তো সেদিন চল্লিশের কোঠা ছুঁয়েছে। দেখতে দেখতে তাও তো প্রায় দু বছর হতে চলল। কিন্তু কোথাও আজও থিতু হতে পারল না ঘনশ্যাম। এ ঘাটে ও ঘাটে ভাসতে ভাসতেই কী করে যেন জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেল। আর এটাই বোধ হয় মাঝবয়স। আজও একটা বাড়ি নেই ঘনশ্যামের। পাকা চার চারটি বছর সে এই ঘাটের ডাক পাচ্ছে। কিন্তু ডাক পাওয়া ব্যাপারটাই বড় অনিশ্চিত। ঠিক যেন নীলাম। যে বেশি দাম দেবে সেই পাবে পারানির ভার। হয়তো আগামী বছরই ঘনশ্যামকে আর এই ঘাটে দেখা যাবে না। অন্য কেউ বেশি টাকা গুনে দিয়ে এসে ঘাট জুড়ে বসে থাকবে। বুঁচিকে ঠিক এই কথাটাই বোঝাচ্ছিল ঘনশ্যাম।

আমি হলাম মাঝনদীর বাসিন্দা বুঝেছিস?

সে আবার কী!

এই যে খড়ের চালাঘর তুলে বসে আছি নদীতে। ঢেউ এলেই চালাঘর ভেসে যাবে।

এতো তোমার মহাজনের গদি। দিন নেই রাত নেই শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি নোট গুনে নিচ্ছ। খুচরো পয়সাও তো কয়েক থলি পাও রোজ।

তুই কি ভাবিস সবটাই লাভ? তা হলে আর ভাবনা ছিল না! নদীর এই রাস্তা ঠিক রাখতেই রোজ ক'টা মুনিষ পুষতে হয় জানিস? একবার বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। কাঁচা মাটির রাস্তাটাই খানাখন্দে ভরে যাবে। এই তো সেদিন ওপর পাহাড়ে বৃষ্টি হল আমরা টেরও পাইনি। তারপর যখন জল বাড়তে থাকল হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। পুরো রাস্তাটাই ভেসে গেল, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনছি এটাই শুধু দেখতে পাস। আর সব ঝক্কিঝামেলা বুঝি তোর চোখে পড়ে না? ভাবিস না সরকার বিনি পয়সায় এই ঘাট আমাকে দিচ্ছেন।

হাসতে হাসেত কথাটা বলল ঘনশ্যাম। তার জীবনের আঁকাবাঁকা রাস্তা বহুবার অতর্কিত বানের জলে ভেসে গেছে। কিন্তু সে ঠিক সাঁতরে ডাঙায় উঠতে পেরেছে। ডুবে যায়নি। ভেসে থাকাটাই তার কাছে বড়। বড় বলেই জীবন তার কাছে এখনও তিক্ত হয়ে ওঠেনি।

বুঁচির সম্বন্ধেও কথাটা খাটে। ভীমগড় পলাশথলি লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তের ছোট্ট একটি গ্রাম নিসুন্দি। সেখানেই তার ছোটবেলা কেটেছে। এই গ্রামে সেই কবে মরে হেজে গেছে বুঁচির বাবা মা। এরকম তো কত মানুষই মরে। তাদের স্মৃতি কারও মনে থাকে না। মনে থাকার কথাও নয়। বুঁচিও তার মা-বাবাকে ভুলে গেছে। ছোটবেলায় ওদের হারিয়েছে, আজ মুখও মনে পড়ে না। এটুকু জানে, মা বাবা না থাকলে পৃথিবীর মুখ সে

দেখত না। সুতরাং তাঁরা ছিলেন। ঘুমন্ত নিসুন্দি গ্রাম থেকে বুঁচি তারপর ঠিক[illegible] গিয়ে পড়েছিল কয়লাখনির এক গোমস্তার বাড়িতে। বড় জোর দশটা বছর সে নিসুন্দি গ্রামে ছিল। মামা বাড়িতে। বাবুদের বাড়িতে মাহিন্দারের কাজ করতেন মামা। মাহিন্দারের কাজ মানে ভোররাতে গোয়াল পরিষ্কার থেকে শুরু করে রাত অবধি ফাইফরমাস খাটা। বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে মামাকে ওঁদের গাই গরু ছাগলেরও যত্ন নিতে হত। নিজের বাড়ির দিকে আর মন দেওয়ার সময় থাকত না। মামা কি আজও উদয়াস্ত ওই কাজ করে যাচ্ছেন? বুঁচি মাঝেমধ্যে ভাবে। আবার এসব কথা কাজের চাপে ভুলেও যায়।

ভীমগড় পলাশথলি লাইনে সারাদিনে একটাই ট্রেন যায়। বিকেলবেলা ওই ট্রেনই আবার ফিরে আসে। ওইরকমই বিকেলের ট্রেনে বুঁচি একদিন ভীমগড় এসে পৌঁছেছিল। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা। বুঁচি দেখেছিল অজয়ের ওপারে ঝিকমিক করছে কয়লাখনির আলো। সে ভেবেছিল রেলস্টেশনে কয়লাকুড়ানির কাজ করবে। নিসুন্দির দু একটি মেয়ে করে। তারা অবশ্য বুঁচির থেকে বয়সে বড়। বিয়েথাও হয়েছে। কিন্তু দশ বছরের মেয়েই বা এ কাজ করতে পারবে না কেন? কাজটা কঠিনই বা কী! রেলইয়ার্ডে এঞ্জিনের বয়লার থেকে পোড়া কয়লা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। গনগনে কয়লা জ্বলতে জ্বলতে একসময় জুড়িয়ে যায়। মেয়েরা ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসে, গ্রামের বাবুদের বাড়িতে বিক্রি করে। বুঁচি এই কাজই করতে চেয়েছিল। ভীমগড় স্টেশনে সারারাত কয়লা জোগাড় করে ভেবেছিল ভোরের ট্রেনে নিসুন্দি ফিরে যাবে। তা আর হল না।

বস্তা কোথায়, কয়লা নিয়ে যাবি?

রেলইয়ার্ডের আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করতে না করতেই একটা লোক এসে বুঁচিকে জিজ্ঞেস করেছিল। বুঁচি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

এই ব্যবসায় কে নামিয়েছে তোকে?

বুঁচি তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবসা তো তখনও শুরুই হয়নি। তাছাড়া লোকটা জানলই বা কী করে, সে কয়লা কুড়োতে এসেছে।

আমি জানি তুই কয়লা কুড়োতে এসেছিস।

মাথা নাড়ল বুঁচি।

জানিস কত পয়সা লাগে এতে?

বুঁচি এবার লোকটির মুখের দিকে তাকাল। পয়সা? ফেলে দেওয়া কয়লা কুড়িয়ে নিতে পয়সা লাগবে কেন?

মোটা নীল জামা পরা লোকটির হাতে চৌকো একটা লণ্ঠন।

তুমি কি রেলে কাজ করো?

বুঁচি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলল।

আমার প্রশ্নের জবাবটা দে। কে বলেছে কয়লা কুড়োতে? বাপ দাদাদের কি কাজ জোটে না যে তোকে পাঠাল।

বুঁচি জানিয়ে দিল বাপ দাদা বলে কেউ তার নেই। মামা তাকে বাড়িতে ঠাই

দিয়েছে।

কাজ করে মামা? মামার ঘর সংসার আছে?

বুঁচি আবার চুপ করে থাকল।

কাজ করে। বাবুদের বাড়িতে থাকে।

বয়স কত তোর মামার? বিয়েথা করেছে?

বয়স? বুঁচি অনেকক্ষণ ভেবে বলল—

তা আমার থেকে বছর পাঁচ বড়। না, বিয়ে থা করেনি।

তুই একা থাকিস?

হ্যাঁ।

কয়লা কুড়নোর কাজে অনেক ঝামেলা। একে ওকে পয়সা ঘুষ দিতে হবে।

তাহলে কী করবে বুঁচি?

আমি তোকে কাজ জুটিয়ে দেব। আঁধারে রেললাইনের পাথরকুচিতে ঠোক্কর খেতে হবে না। নদী পেরোলেই চাকরি পাবি। নদীর এপারটা মরছে আর ওপারে উড়ছে কাঁচা পয়সা। পোড়া কয়লার আর জীবন কতটুকু। বরং কাঁচা কয়লার দেশে যা। কাঁচা কয়লার আঁচ বেশি। পোড়ে অনেকক্ষণ।

পরে গোমস্তাবাবুও বুঁচিকে বলেছিলেন---

আমাদের এই দেশটা বড় কাঁচা। যেমন দেখছিস মাটির তলা থেকে তাল তাল কাঁচা কয়লা উঠে আসছে, মানুষগুলোও তেমনি কাঁচা।

এ ধরনের বাঁকা কথাবার্তার অর্থ বুঁচি তেমন বোঝে না। ভীমগড় স্টেশনের রেলের গোকুল গ্যাংম্যান সেদিন নেহাত দয়াপরবশ হয়ে তাকে এই কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। গোমস্তাবাবুর বাড়িতে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, বাসন ধোয়া, ঘর মোছার জন্য মাস মাইনে আর কত হবে? খাওয়াপরা সমেত মাসে দশ টাকা। গোকুলের চেনা এই গোমস্তাবাবু। একই গাঁয়ের মানুষ। গোমস্তাবাবুই গোকুলকে বলেছিলেন, একটা অল্পবয়সি মেয়ে দেখে দিতে পারো? ঘর মুছবে, বাসন ধোবে, কাপড় কাচবে। বেতন খারাপ দেব না। অল্প বয়সি মেয়ে। ধিঙ্গি মেয়ে চাই না। টিকবে না। কারও সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে পালিয়ে যাবে।

তা ওই দশ টাকা। খাওয়া পরার খরচও তো আছে। সেই টাকাটা তো যোগ করতে হবে মাইনের সঙ্গে। তাছাড়া বুঁচির আর বয়স কত? আর একটু বড় হলে আমি ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব। গোমস্তাবাবু বলেছিলেন।

গোমস্তাবাবুই বলেছিলেন. এখানের মানুষগুলো কাঁচা। গোরক্ষপুর, বালিয়া কিম্বা আরা জেলার লোকেরা প্যাঁচট্যাচ বোঝে না। যা বোঝাও বুঝবে।

সন্ধ্যাবেলা গোমস্তাবাবুর বৈঠকখানাতেই সেই মানুষদের দেখত বুঁচি। সাবাদিন কয়লা কেটে সবে খাদ থেকে উঠে এসেছে। সারা গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো কয়লা। গাঁইতি শাবল নিয়ে লোকগুলো ভিড় করত বৈঠকখানায় ও বৈঠকখানার বাইরে। গোমস্তাবাবু

বাঁধানো কয়েকটা খাতা খুলে ওদের নাম ধরে ধরে ডাকতেন—

লখিয়া, এখানে টিপসই দে, যাদব কালকে তুই টিপসই দিতে ভুলে গিয়েছিস। এই খাতাটায় দে। হ্যাঁরে যদু, দেখছি তুইও কালকে টিপ দিসনি। নে নে, চটপট কর। তা হলে কি আমি মিথ্যা বলছি? এই তো দেখছি তোর নামের পাশে টিপ সই নেই।

এটা তো নীল মলাটের খাতা দেখছি বাবু। কাল আমি সবুজ রঙেব খাতায় সই দিয়েছি।

বলি নীল সবুজ আসছে কোথায়? এটা তো কয়লার দেশ বাবা। কয়লার রঙ তো একটাইরে। কালো। নে নে, টিপ সইটা দে। তারপর কথা বলিস।

বুঁচি দেখত মোটা মোটা আঙুলের ছাপে খাতা ভরে যেত। খাতাগুলো যত্ন করে কাঠের আলমারিতে রেখে দিতেন গোমস্তাবাবু। সাতদিন পর পর কয়েকটা খাতা বেছে নিয়ে ক্যাশিয়ারবাবুর কাছে নিয়ে যেতেন।

গোমস্তাবাবুর মতো তুমিও তো খাতাপত্র রাখলে পারভে। সব সময় কি হিসেব করতে ভাল লাগে? দিন রাত কত গাড়িই না যাচ্ছে। একটা খাতায় কি এত গাড়ির হিসেব রাখা সম্ভব?

বুঁচি ঘনশ্যামকে বলল—

এখনও তুই গোমস্তাবাবুকে ভুলতে পারছিস না? ক'বছর হল?

ঘড়িঘণ্টা ধরে কি আর বছরের হিসেব বাখা যায়? তা বছর দুই হতে চলল।

আমার এখানে ক' বছর হল?

গোমস্তাবাবু মারা যাবার পরেই তো তোমার এখানে কাজে লেগেছি।

দু বছর? বলিস কী! এই তো সেদিন কাজে লাগলি। দেখতে দেখতে কী কবে দুটো বছর কেটে গেল? কে যেন তোকে এনে দিল আমার কাছে?

কে আবার? আমি নিজেই তো এলাম।

নিজেই এলি? আমার গুমটির পাহারাদার হারু তোকে এনে দিল না?

হারুকে আমি চিনিই না।

হারুকে চিনিস না? বললেই হল? যেদিন থেকে এই ঘাট নিচ্ছি সেদিন থেকেই হারু আমার সঙ্গে আছে।

চিনব না কেন? আলাপ নেই। আমি নিজেই এসেছি তোমার এখানে।

সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি। কী করে এলি? ঘাট পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তখনই দেখলাম তুমি গদিতে বসে আছ। তারপর ওপারে স্টেশনের বাইরে যে চায়ের দোকানটা আছে সেখানে গিয়ে বসলাম।

তুই তো চা খাস না। তা হলে চায়ের দোকানে কেন?

কে বলল চা খাই না? পেলে খাই। চায়ের দোকানের কুলিকামিনরাই আমাকে কাজের ঠিকানা দিল। বলল, ওই লোকটার সঙ্গে যা। শ্যামবাবুর চা নিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

হারু আমার চা আনত।

ওর পিছু পিছু তোমার এখানে এলাম। তোমরা রাঁধুনি খুঁজছিলে।

ঘনশ্যামকে মাছের ঝোলের বাটি এগিয়ে দিয়ে বলল বুঁচি।

মাছ কোথায় পেলি?

পাতাসি মাছ। জেলেরা দ-য়ে জাল ফেলছিল। সকালে এসে দিয়ে গেল।

তা ভাল। তুই আসার পর খাওয়া-দাওয়াটা ভালই হচ্ছে।

বুঁচির ভাল লাগল। তা বাইশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে তার কাজের প্রশংসা শুনতে পেল।

আমার তো চালচুলোর ঠিক নেই। এই তো বৃষ্টি বাদল শুরু হল বলে। তখনই তো পাততাড়ি গুটোতে হবে।

শুখা মরশুমই ভাল।

আমারও এক আধবার মনে হয়। তার পর ভাবি বড় স্বার্থপরের মতো এই চিন্তা। কেউ যদি পৃথিবীর সব সেতু বেঁধে দিতে পারত ভাল হত। লোকের এত কষ্ট করে ঘাট পেরতে হত না। যাক গে বাদ দে। তোর কথা বল। ঘাট পেরিয়ে সেদিন কোথায় যাচ্ছিলি?

তা তো জানি না।

তোর বাড়ি পলাশথলি, তাই না?

কী করে জানলে?

খোঁজখবর নিয়েছি। এত কাছাকাছি এলি, যাবি না মামাকে দেখতে?

মামাও তো আমার খোঁজ নিতে পারত।

তোর মামা হয়তো বাবুদের বাড়িতেই এখনও কাজ করে যাচ্ছেন।

তা হলে গিয়ে কী লাভ।

চোখের দেখা দেখবি না? মামা হয়তো অনেক খুঁজেছেন তোকে। তারপর খোঁজখবর না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

না না , তুমি আবার মন খারাপ করে দিয়ো না। গাঁ ছেড়ে আমি চলে এসেছি। আর ফিরতে চাই না। যাবই বা কী করে। লোকেরাই বা বলবে কী।

ঘনশ্যাম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বালির চড়ায় একটা ট্রাক আটকে গেছে। অজয়ের বালি নিতে এসে মাঝনদীতে নেমে পড়েছে ট্রাকটা। মাঝনদী, কিন্তু একেবারে শুকনো। শুকনো বালিতেই ট্রাকের টায়ার বসে গেছে।

একটা কথা বলতে পারিস?

বলো না। হাজার কথা জিজ্ঞেস করো। উত্তর দেব। আজ কথা বলতে ভাল লাগছে। এভাবে আমার কথা কেউ ভাবেনি।

আমি যখন থাকি না, এই ঘাটপারানির বন্দোবস্ত যখন বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে যায়, তুই কোথায় যাস?

তাই তো বলছিলুম, শুখা মরশুমই ভাল। বৃষ্টি বাদলে তুই কোথায় থাকিস, সেটাই

জানতে চাই।

তুমি কোথায় থাকো?

এই প্রথম কারও চোখে সরাসরি চোখ রেখে প্রশ্ন করল বুঁচি। এবং দেখল ঘনশ্যামও স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভেসে বেড়াই। আগে যেমন বেরিয়ে পড়তাম এখনও তেমনি বেরিয়ে পড়ি। বছরের আধখানা সময় ঘর বাঁধি। বাকি আধখানা সময় ভাসতে থাকি।

বুঁচি যে উত্তর খুঁজছিল পেল না। ঘনশ্যামের প্রশ্নের উত্তরও তার জানা নেই।

ধরে রাখা

অনীতার গায়ের কয়েক বছরের পুরনো কাশ্মীরি লাল শালটার রঙ যেমন ধূসর, তেমনি এই ভোরের আকাশ। সুরকির রঙ লেগেছে মেঘের গায়ে। রোদ এখনও স্পষ্ট হয়নি। কেমন একটা ঘোলাটে চেহারা। আর এই আকাশ দেখতেই অনীতার ভাল লাগে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়, না, আজও তার দেরি হয়নি। সে ঠিক সময়েই স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

কিন্তু সব দিন তো আকাশে মেঘ জমে না। কুয়াশা থাকে না আশেপাশে। তখন আকাশের লাল রঙটা একটু উজ্জ্বল দেখায়। সেই উজ্জ্বলতাই ভয় পাইয়ে দেয় অনীতাকে। এই বুঝি দেরি হয়ে গেল। অনন্তপুর গ্রামে অনেকের বাড়িতেই ঘড়ি নেই। অল্প যে ক'জনের বাড়িতে আছে, তাঁদেরই একজন হলেন গার্লস হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস। অনন্তপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তাই ঘড়ির কাঁটা ধরে সকাল সাড়ে ছ'টাতেই বসে। শেষ হয় সাড়ে দশটায়। তারপর ওই বিল্ডিংয়েই শুরু হয়ে যায় ছেলেদেব স্কুল। অনীতা পডায় মেয়েদের স্কুলে। ওকে তাই ঠিক সকাল সাড়ে ছ'টাতেই হাজিরা দিতে হয়।

তোমরা যদি ভাবো, এটা আর নতুন কথা কী, তা হলে তোমাদের খুব একটা ভুল হবে না। কিন্তু যদি শোনো, অনীতা কোথা থেকে এই গ্রামের স্কুলে এসে রোজ হাজিরা দেয়, আর ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে গিয়ে শীতের ভোরে টিচার্স রুমে পৌঁছেই তাকে হাত ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিতে হয়, তা হলে হয়তো অবাকই হবে। কিংবা হবে না। চাকবি যার দরকার, প্রয়োজন হলে তাকে তো এই পরিশ্রম করতেই হবে। অনীতাও এনিয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে চায় না। কিন্তু আমরা তো জানি, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, মাঝরাতে রিক্সা এসে দাঁড়িয়ে থাকে ওর বাড়ির দরজায়। অনীতাই এই ব্যবস্থা করেছে। যাদবপুর স্টেশনে এসে লোকাল ধরতে হয় ভোর পৌনে চারটের। সেখান থেকে শেয়ালদা। পাঁচটা কুড়িতে ছাড়ে নৈহাটি লোকাল। শেয়ালদা সাউথ সেকশনে পৌঁছে শুরু হয় অনীতার হার্ডল রেস। চারশো, না আটশো মিটার? মেইন সেকশনে এসে ওই ট্রেন ধরতে হয় অনীতাকে। বারাকপুরে নেমে আবার রিক্সায় মিনিট কুড়ির পথ। অনীতার অবশ্য এসব সহ্য হয়ে গেছে। ট্রেন এক-আধটু দেরি করলে বারাকপুরের রিক্সাওয়ালা সময়ের সেই ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেয়। ঝামা ইঁটের পথে ভিন্টেজ রিক্সাটা হাওয়াগাড়ির মতো চালানোর ক্ষমতা রাখে শুধু নরেন। তার সঙ্গে মাসান্তিক ব্যবস্থা অনীতার। নৈহাটি লোকাল বারাকপুরে ঢোকার অনেক আগেই, নরেন তার রিক্সাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর কোনও ভাড়া পেলেও নেয় না। অনীতার সঙ্গে তার কখনও বিশেষ কথা হয়নি। কিন্তু সে

জানে, তার গ্রামের স্কুলের এই দিদিমণি অনেক দূর থেকে আসছেন। সময়মতো তাঁকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নৈহাটি লোকালের ড্রাইভারের নয়, রিক্সাওয়ালা নরেনের। এই দায়িত্বে নরেন স্বেচ্ছায় নিজেকে অর্পণ করে আনন্দ পেয়েছে। যাদবপুর স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরের কলোনিতে যে রিক্সাওয়ালা মাঝরাতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, সেও বা কী কম যায়। আধবুড়ো পঞ্চাননের বাড়িতেও ফসফরাস ডায়ালের ঘড়ি নেই। তবু রাত দুটো নাগাদ তার ঘুম ভেঙে যায়। সেও আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় আন্দাজ করে নেয়। তারপর রিক্সাটি নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে থাকে অনীতার ঘরের বাইরে। আকাশে নক্ষত্র থাকুক আর না থাকুক, মেঘ জমুক বা না জমুক, থাকুক জ্যোৎস্না কিংবা কৃষ্ণা চতুর্দশীর অন্ধকার, কোনও রাতেই এর ব্যতিক্রম হবে না। ঝুঁকি নিতে চায় না পঞ্চানন। বলা যায় না, যদি কোনও দিন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, দিদিমণি যদি ট্রেন না পান, তাই অনেক আগেই সে এসে হাজির হয়। অনীতাও জানে, দরজা খুলে বা বাইরে বেরিয়ে এলেই সে দেখতে পাবে, রিক্সার সিটে কুঁকড়ে শুয়ে আছে পঞ্চানন। সময় নাকি কারও জন্য অপেক্ষা করে না। অপেক্ষা করে এই পঞ্চানন। অনীতাকে সে পৌনে চারটের লোকাল ধরিয়ে দেবেই। সেও জানে সময়মতো তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

সময়মতো এই পৌঁছনো নিয়ে হেডমিস্ট্রেস প্রশ্ন করেছিলেন অনীতাকে ইন্টারভিউয়ের সময়।

তোমার বাড়ি তো বলছ, যাদবপুর থেকেও মাইল তিনেক দূরে। অতদূর থেকে এখানে সাড়ে ছ'টার মধ্যে পৌঁছতে পারবে? ফার্স্ট বাস শুনেছি পৌনে পাঁচটার আগে রাস্তায় বেরোয় না। অত ভোরে শেয়ালদায় এসে লোকাল ধরতে পাবে তো?

অনীতা মাথা নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

কী করে পারবে? আমার এখানে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হলে তো তোমাকে ভোররাতে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। রোজ কি বাড়ি থেকে হেঁটে স্টেশনে আসতে পারবে? তোমার বাড়ির লোকরোই বা বলবে কী! পুরুষ হলে না হয় কথা ছিল।

অনীতা ব্যাকুল হয়ে বলেছিল, না না, এ-নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক পারব। নিশ্চয় পারব। আর আমার বাড়ি?

আর কিছু বলেনি অনীতা। হেডমিস্ট্রেস যা বোঝার বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন, মেয়েটি মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে না। অনীতার নিজের মনেও তখন কোনও দ্বিধা ছিল না। ইন্টারভিউয়ের সময় অনেকে অনেক কথা বলে। না হলে চাকরি জোটানো মুশকিল।

অনীতা শুধু এটুকুই জানত যে, চাকরিটা তার খুবই দরকার। যত অসুবিধাই হোক, তাকে তা মেনে নিতে হবে. ট্রেন যদি ভোর পৌনে চারটেয় না হয়ে আরও আগে হয়, তা হলেও তাকে ট্রেনের অপেক্ষায় একা এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নিঝুম প্ল্যাট ফর্মে। ট্রেনের যে টাইম টেবলই হোক, তার নিজেরও আলাদা একটা টাইম টেবল থাকবে। তা হলে আর ট্রেন ধরতে অসুবিধা হবে না। চাকরির জন্য মানুষ কত কী করে। আর আমি এটুকু পারব

না। ব্যাপারটা অবশ্য মোটেই 'এটুকু' নয়। প্রথম দিনেই টিফিনের সময় টিচার্স রুমে এটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। ইংরেজির হেড টিচার শেফালী বলল, তুমি এতদূর থেকে আসো ভাবাই যায় না। আমি হলে তো পারতামই না।

শেফালীর বয়স কত হবে? বছর বত্রিশ। বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছে। হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর তার স্বামী। পোস্টিং বারাকপুরে। বাসাও স্কুলের কাছে।

অঙ্কের টিচার শুভ্রা থাকে ইছাপুরে। বয়সে সে শেফালীর চেয়ে কিছু বড়। সেও গলা মেলাল শেফালীর সঙ্গে।

সত্যি কী দিনকাল পড়ল! তোর বয়স কত রে?

চব্বিশ। অনীতা বলল। শুভ্রাদি অঙ্ক পড়ান, তার ওপর তাঁর চালচলনও বেশ গম্ভীর। প্রথম আলাপেই তুই বলার অধিকারটা এই গম্ভীর চলনবলন দিয়েই তিনি অর্জন করে নিয়েছেন। এখন তো তোর শুয়ে বসে থাকার বয়স। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে বাড়ির আশেপাশেই চাকরি পেতিস।

অনীতা কিছু বলল না। ইতিহাসে এম. এ পাশ করার পর বছর দুয়েক তো সে ওই চেষ্টাই করেছিল। কে দিয়েছে তাকে চাকরি?

শুভ্রাদিদেরও কি কষ্ট করে চাকরি পেতে হয় না? নাকি ইন্টারভিউ দেওয়ামাত্রই যে-যার পছন্দমাফিক চাকরি পেয়ে যায়?

ও তো ডেপুটেশন ভেকান্সিতে এসেছে। মাস ছয়েক না হয় কষ্টই করল। অল্প বয়সেই তো লোকে কষ্ট করে।

এবার অনীতার হয়ে কথা বললেন হেডমিস্ট্রেস নন্দিতাদি। ইন্টারভিউয়ে প্রথম দেখার পর থেকেই অনীতার ওপর ওঁর কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে। নন্দিতাদির স্বামী রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কাজ করতেন। বছর দেড়েক আগে তিনি মারা গেছেন। অনন্তপুর গ্রামে মেয়েদের হাইস্কুল তাঁরই হাতে গড়া। এই গ্রামেই তাঁর বাড়ি। এখান থেকেই তিনি রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস যেতেন। নন্দিতাদিও আগে পড়াতেন বসিরহাটের কাছে একটা স্কুলে। বারাকপুর থেকে লোকাল ট্রেনে দমদম গিয়ে, সেখান থেকে আবার ট্রেন ধরতেন। ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছনোর জন্য তখন তাঁকেও কম উদ্বেগ পোহাতে হয়নি। নন্দিতাদি হয়তো সেইজন্যই অনীতার কষ্ট বুঝতে পারেন। আর এটাও জানেন, কষ্ট না করে উপায়ই বা কী! আর মুখে যে যতই কষ্টের কথা বলুক, তাতে তার কষ্ট কমে না।

টিচার্স রুমে টিফিনের সময় প্রতিদিনই নন্দিতাদি এসে সবার সঙ্গে চা খান। চা তৈরি করে সুশীলা। সে এই স্কুলের মেয়ে বেয়ারা। নন্দিতাদি আসার আগেই সে স্কুলের অফিসঘর ও ক্লাসরুমগুলো খুলে দেয়, অফিসঘরের আলমারির কাচ ও ফাইলপত্রের ধুলো মোছে। তারপর নন্দিতাদি ও একে একে অন্য টিচাররা এসে পড়েন। স্কুল শুরুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় সুশীলা। তার আর একটা কাজ টিফিনেরর সময় টিচারদের চা ও বিস্কুট দেওয়া। এর জন্য টিচাররা মাইনে পেয়েই প্রত্যেকে কুড়ি টাকা করে সুশীলাকে দেয়।

নতুন টিচার অনীতাকেও সেদিন চা এনে দিল সুশীলা। সঙ্গে বিস্কুট। নন্দিতাদি টিচারদের সঙ্গে অনীতার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু-একজনের সঙ্গে অবশ্য ওর কিছু আগেই আলাপ হয়েছে। শেফালী ইংরেজি পড়ায়। কয়েকটা ক্লাসে অনীতাকেও ইংরেজি পড়াতে হবে। তাছাড়া ইতিহাসের ক্লাস তো আছেই। ইতিহাসের টিচার সান্তা বি. এড. পড়তে গেছে। তার জায়গাতেই এসেছে অনীতা। হেডমিস্ট্রেস আগেই রুটিন করে রেখেছিলেন টিচারদের।

ইংরেজি পড়ানোর সুবাদেই শেফালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল অনীতার। সম্পর্ক দাঁড়াল 'তুমি' থেকে 'তুই'।

তোকে আমি বলেছিলাম না, অত দূর থেকে এসে আমি চাকরি করতে পারতাম না। পরে ভেবে দেখলাম, আমারও তো তোর মতো অবস্থা হতে পারে। ধর, সমীর দূরে কোথাও বদলি হয়ে গেল। কিংবা ধর কলকাতাতেই ওর পোস্টিং হল। আর আমরাও বাসা উঠিয়ে নিয়ে গেলাম কলকাতার কোনও পাড়ায়। তখন আমাকেও তোর মতো ভোররাতে শেয়ালায় এসে ট্রেন ধরতে হবে।

শেফালী সেদিন বলল। সমীর ওর স্বামী। অবশ্য সমীরও তো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারে। তাই না? কিন্তু পারবে কি? আটটার আগে কোনও দিন ঘুম থেকে ওঠে না। হাসতে হাসতে বলল শেফালী। ছিপছিপে, সুন্দর চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা আর মুখে নিটোল এক পরিতৃপ্তির ছাপ। এখনও ওর ছেলেপুলে হয়নি। চেহারা নিয়ে বেশ সচেতন বলেই মনে হয় শেফালীকে। স্কুলের পর একদিন অনীতাকে সে তার বাড়িও নিয়ে গিয়েছিল। অনীতা দেখেছিল, সস্তা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাচে কালো কালো ছোপ পড়লেও, নামীদামি কোম্পানির ক্রিম, পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে শেফালী।

আচ্ছা শোন, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। রাত্রে রিক্সা করে আসতে তোর ভয় করে না?

ভয় করবে কেন? পঞ্চাননদা বেশ সাবধানী মানুষ। এক-একটা পাড়ার আঁকাবাঁকা অন্ধকার পথ পেরিয়ে এলেও আমার ভয় করে না। একবার একটা লোককে লাইট পোস্টের নীচে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়েছিল লোকটা। মনে হয়েছিল, কেউ বোধহয় খুনটুন করে ফেলে রেখে গেছে। পঞ্চাননদা কিন্তু ভয় পাননি। বলেছিলেন, বেহুঁশ মাতাল । আজকের রাতটা বেচারাকে রাস্তাতেই কাটাতে হল। এরকম আরও কত রাত লোকটা বাড়ি ফিরতে পারবে না, কে জানে?

শেফালী বলল, আমি কিন্তু সত্যিই ভয় পেতাম। তাছাড়া ধর, হঠাৎ যদি কেউ এসে হামলা করে। বদমাস লোকের কি আর অভাব আছে? অবিবাহিতা একটি মেয়েকে রাতের অন্ধকারে একা একা আসতে দেখে—হাসল অনীতা। হাসতে হাসতেই বলল—এত ভয় পেলে চলে শেফালীদি! পথে বেরিয়ে পড়লেই দেখা যায়, আমি একা নই। কত মানুষ যে নেমে পড়েছে রাস্তায়। তাদের সময় অসময় নেই। ভোররাতে একা

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি, আস্তে আস্তে কত মানুষই না জড়ো হয়। ট্রেনে উঠেও দেখেছি, অন্ধকারে চাদর মুড়ি দিয়ে সব বসে আছে। কেউ আসছে ক্যানিংয়ে মাতলা পেরিয়ে, কেউ বা লক্ষ্মীকান্তপুরের কোনও গ্রাম থেকে।

তুই ভাল কথা বলতে পারিস অনীতা। দেখবি, তুই ভাল পড়াতেও পারবি। মেয়েরা খুব পছন্দ করবে তোকে।

শেফালী ভুল বলেনি। সেভেন-এর মেয়েরা ক্লাস টিচার পেয়েছে অনীতাকে। অনীতা সেদিন ক্লাসে ঢোকার মুখে দেখল, রোগা একটি মেয়ে ফুল নিয়ে ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা আগেও কেউ কেউ ফুল নিয়ে আসত স্কুলে। কিন্তু অনীতার জন্য ফুল যেন বেড়ে গেল। গ্রীষ্মের সময় বাগানের বেলি কিংবা রজনীগন্ধা, শীতে মরসুমি ফুল গাঁদা। গাঁদা ফুলের জন্য বেশি যত্ন করতে হয় না। ফোটেও বেশি, গাছ আলো করে ফোটে। কিন্তু মেয়েটি গাঁদা ফুল নিয়ে আসেনি, এনেছে অপুষ্ট কিছু চন্দ্রমল্লিকা। চন্দ্রমল্লিকার সাদা পাপড়ি নীলচে হয়ে উঠেছে। অনীতা জানে, মেয়েটি পড়াশুনোয় খুব একটা ভাল নয়। কিন্তু মায়াবী, টানা টানা দুটো চোখ নিয়ে সে যখন সামনের বেঞ্চ থেকে অনীতাব দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তখন অনীতার কাছে লেখাপড়ার ব্যাপারটা খুব বড হয়ে ওঠে না।

পড়া না পাবলে কাউকেই সে অবশ্য কডা ভাষায় কিছু বলতে পারে না। ওর মনে হয়, মা বাবা বড় কষ্ট করে ওদের স্কুলে পাঠিয়েছেন। তাবা অনেকেই কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি। তাদের কাছে লেখাপড়া একটা স্বপ্নের জগৎ। পরীক্ষা পাস করলেই যেন চাকরির দবজা হাটপাট খুলে যায়। আর চাকরি মানেই সুখ-সাচ্ছল্য। মনে মনে হাসে অনীতা। চাকরি করে সে আর কতটা সুখ কিনতে পেরেছে তার সংসারের জন্য। সংসার বলতে মা, বাবা আর ছোট বোন। ওপার বাংলা থেকে এসে যাদবপুরের কাছে কলোনির এক টুকরো বসতজমি বাবা যত সহজে জোগাড় করতে পেরেছিলেন, চাকরি কিন্তু তত আয়াসলব্ধ হয়নি। নানা জায়গায় ঠেক খেতে খেতে একটা রঙ কোম্পানির অফিসে তিনি শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি অবশ্য জোটাতে পেরেছিলেন, কিন্তু বয়স তখন তাঁর পঞ্চান্ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। পেনসন, গ্রাচুইটি, প্রোভিডেন্ট ফান্ড এসব তাঁর জন্য নয়। চাকরি থেকে অবসব নিয়েও তাই তাঁকে উদয়াস্ত খাটতে হয়েছে। এরই মধ্যে অনীতাকে লেখাপডা শিখিয়েছেন। অনীতার ছোট বোনও আসছে বার বি. এ. পার্ট ওয়ান দেবে। ভোররাতে ট্রেনের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে অনীতা যেমন দেখেছে সে একা নয়, আরও অনেক লোক তার আগেই রাস্তায় বেবিয়ে এসেছে, সেরকম পড়াশুনো করার সময়ও পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ আগ বাড়িয়ে তাকে দু একটা টিউশনিও জোগাড করে দিয়েছেন। সংসাবের টালমাটাল নৌকোটাকে ঠিকঠাক চালানোর পক্ষে সেটা অবশ্য যথেষ্ট নয়। তাই এই চাকরি। কিন্তু এও তো সাময়িক। কয়েক মাস পরে আবার তাকে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে

পড়তে হবে। তখন হয়তো পাঁচটা কুড়ির নৈহাটি লোকালে চেপে এই পথে আর আসাই হবে না। দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তিই হয়তো তখন স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠবে। ঘোলাটে আকাশটাকে তখন স্মৃতিতে মনে হবে কাশ্মীরের সেরা ফলবাগানের আপেলের মতো টুকটুকে লাল। কিংবা শেফালীদির ড্রেসিং টেবিলের রুজ-এর কৌটো। না, এর বেশি আর এখন চিন্তা করা উচিত নয়। অনীতা বরং আরও মন দিয়ে ক্লাস করবে। সোডা দিয়ে কাচা, কোঁচকানো সাদা ফ্রক আর লাল বেল্ট পরা কচি কচি মেয়েদের সুখ-দুঃখের দিকে নজর দেবে। 'ফুল এনেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু বাগানের ফুল ছিঁড়তে নেই।' অনীতা ওর মায়াবী ছাত্রীটিকে বলল।

আমাদের বাগানে অনেক ফুল আছে দিদিমণি।

কে লাগাল ফুল? ফুল গাছগুলোয় তুমি জল দাও?

বাবা লাগিয়েছেন।

বাবা কী করেন? চাকরি?

না দিদিমণি। বাবা চায়ের দোকান করেছেন বাসস্ট্যান্ডে। ভোরে উঠে বাগানের গাছাপালাগুলো দেখেন। বিকেলে চায়ের দোকান খোলার আগে গাছে জল দিয়ে যান।

কত দূরে তোমাব বাড়ি?

এই তো, গঙ্গার এপারে। যাবেন একদিন আমাদের বাড়ি?

যে-মেয়েটি চুপচাপ বসে থাকে ক্লাসে সে-ই এখন এত কথা বলছে। আপন করে নিয়েছে অনীতাকে।

অনীতাকে আপন করে নিয়েছে অন্য টিচাররাও। হেডমিস্ট্রেস থেকে শুরু করে সুশীলা পর্যন্ত সবাই দেখেছে, অনীতার কোনও অভিযোগ নেই, নেই নিজের অবসাদ বা ক্লান্তি দিয়ে অন্যদের বিষণ্ণ করে তোলার প্রবণতা। তোর পঞ্চাননদা'র বুঝি জ্বরজ্বালা নেই! ধব, একদিন সে কামাই করল। তা হলে আসবি কী করে?

সংস্কৃত টিচার মালবী জিজ্ঞেস করেছিল।

এ ক'দিন তো আমি হেঁটেই আসছি।

পঞ্চাননদা আসছেন না। কাল যাদবপুরের রিক্সা স্ট্যান্ডে খোঁজখবর নিয়ে ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখলাম রেললাইনের ধারে হোগলার ঘরে মাদুরে শুয়ে বেচারা ধুঁকছে। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

তা হলে এলি কী করে? সেটাই তো বলছিস না।

হেঁটে এলাম। হাঁটার লোকেরও তো অভাব নেই।

নন্দিতাদি বললেন, এ ক'দিন তুমি আমার বাড়িতে থেকে যাও অনীতা।

আমার বাড়িতেও তো কাজ থাকে নন্দিতাদি। পরে বরং একদিন আপনার বাড়ি যাব। এর পরের দিনই নন্দিতাদির বাড়ি যেতে হল অনীতাকে। নন্দিতাদিই জোব করে

নিয়ে গেলেন। পৌনে চারটের ট্রেন যাদবপুরে এসে দাঁড়াতেই দেখা গেল, কোনও কামরাতেই আলো নেই। ট্রেনের মাঝামাঝি একটা লেডিজ কম্পার্টমেন্ট থাকে। অনীতা ওই কম্পার্টমেন্টে ওঠে না। ওঠে সামনের দিকের একটা কামরায়, যাতে শেয়ালদায় পৌঁছে চটপট সে মেইন সেকশনে এসে ট্রেনে ধরতে পারে। সেদিনও তা-ই করল। কিন্তু ট্রেনে উঠেই হাতে একটা কাঁটার খোঁচা লাগল। দরজায় ওঠার মুখেই বড় বড় কয়েকটা ঝুড়ি। এই সব ঝুড়িতে গ্রামগঞ্জের সবুজ তরকারি যায় কলকাতায়। ভেন্ডারদের ঝুড়ি। সেদিন ওরা কলকাতার ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য কী নিয়ে যাচ্ছে?

অন্ধকারে একটু এগোতেই ট্রেনের মেঝেয় বসা লোকদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অনীতা। একটু সামলে নিতেই আবার গিয়ে পড়ল ঝুড়িগুলোর ওপর। পানিফলের কাঁটার খোঁচায় শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে গেল' শেয়ালদায় পৌঁছে দেখল, আঁচলটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। পানিফলের ঝুড়িগুলোকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আসলে শাড়িটাই যে পুরনো। স্কুলে প্রথম ব্যাপারটা নজরে পড়ল নন্দিতাদির।

এ কি, শাড়ি ছিঁড়ল কী করে?

হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

আমার বাড়ি চলো। শাড়ি বদলে নেবে।

ইতস্তত করছিল অনীতা।

বিধবার শাড়ি পরতে ভয় পাচ্ছ? পুরনো সব শাড়ি তো আমি ফেলে দিইনি। খুঁজলে এক আধখানা এখনও হয়তো পাওযা যাবে।

নন্দিতাদি গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্কুলের কাছেই ওঁর বাড়ি। অনীতাকে উনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অনীতা ফিরল সরু লাল পাড় একটা শাড়ি পবে।

বড় মায়া হচ্ছে অনীতার। সবুজ-হলুদ ধানমাঠ, প্রায-পরিপূর্ণ এক একটা ধানের শিস ও তারই মধ্যে ভাঙাচোরা এই স্কুলবাড়ি, শ'তিনেক ছাত্রী ও তাদের কয়েকজন শিক্ষিকার সঙ্গে অদ্ভুত এক মায়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল অনীতা। না, এতটা মায়া-মমতা বোধহয় ভাল নয। মানুষকে তা হলে অহেতুক কষ্ট পেতে হয়। সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে যাবার আগে যতটা সম্ভব নিস্পৃহ থাকাই ভাল। অনীতা ভাবল। আব তোমরা যদি ভাবো, অনীতা মনে মনে খুব নিষ্ঠুর, এখানে মানুষের ভালবাসার কোনও মূল্য সে দিতে চায় না, তা হলে কিন্তু ভুল করবে। ব্রাহ্ম মুহূর্তের পৃথিবীটাকে সে দেখেছে। দেখেছে সম্ভাবনাময় এক-একটা দিন ফুলের মতো নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে কী করে পাপড়ি মেলে। এই ফুলকে তোমরা কী বলবে? চন্দ্রমল্লিকা, না কৌলীন্যহীন গাঁদা? ব্রাহ্মমুহূর্তে ফোটা ফুলের বঙ ওর সমস্ত অস্তিত্ব রাঙিয়ে দিযেছে।

তোমরা অন্তত এটুকু মনে রাখার চেষ্টা করো যে, এই ফুলের রঙ বহু বছরের পুরনো কাশ্মীরি শালের মতো ধূসর নয়। এ ফুল রোজ ফোটে, রোজ তার রঙ থাকে স্নিগ্ধ

উজ্জ্বল। আর অনীতা তার পাপড়িরই একটা অংশ।

তোর আর ক'মাস বাকি আছে রে?

শেফালী একদিন ওকে জিজ্ঞেস করল।

হিসেব করে দেখিনি।

তুই কী রে! আমরা তোর জন্য এত ভাবছি, আর তোর নিজেরই কোনও চেষ্টা নেই!

চেষ্টা করে লাভ কী বলো? এখানে যে চাকরি হবে তা কি আমি কোনওদিন ভেবেছিলাম?

ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে কখনও আলাপ হবে?

তার মানে তুই চাকরির চেষ্টা করছিস না, তা-ই তো?

হ্যাঁ, তা-ই।

কিন্তু এখন থেকে চাকরি না খুঁজলে তো তোকে আবার বসে থাকতে হবে। জানিস না, একবার চাকরি করলে অভ্যেস খারাপ হয়ে যায়? রিটায়ার করার আগের দিন পর্যন্ত যাকে কম-বয়সি দেখায়, সেই লোকটাই রিটায়ার করার পরের দিনই বুড়ো হয়ে যায়।

জানো তো, আমি বেশি ভাবনাচিন্তা করতে পারি না। ওটা আমার ধাতে সয় না। এটাই শুধু মনে রেখেছি যে, এখানের পালা শেষ হলে আবার কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। কখনও ভেবেছিস সেই আশ্রয় এখানে আবার পেতে পারিস কিনা?

বললাম তো, সেভাবে আমি কোনও কিছুই ভাবি না।

আমরা কিন্তু তোর জন্য ভাবি, জানিস।

নন্দিতাদির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কী কথা, তা অবশ্য তখন জানাল না শেফালী। ভোর পৌনে চারটের যাদবপুর স্টেশন, পাঁচটা কুড়ির নৈহাটি লোকাল, ধানমাঠের শিশির ও কুয়াশার সঙ্গে আরও কয়েক দিন মিশে থাকল অনীতা। কলোনির যে অন্ধকার রাস্তার লাইটপোস্টের বাল্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাও আর নতুন করে লাগানো হয়নি। এরই মধ্যে একদিন নন্দিতাদি ওকে ডাকলেন।

তুমি তো কলকাতা থেকে আসো। এখানকার জন্য কিছু ভাল চা ও বিস্কুট কিনে আনতে পারবে?

মাথা নাড়ল অনীতা। একশ টাকার দুটো নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন নন্দিতাদি।

পাঁচশ গ্রাম পাতা চা আর পাঁচশ গ্রাম বিস্কুট।

এত টাকার কী দরকার?

কবিতার কয়েকটা বই কিনে আনতে হবে। জীবনানন্দের কবিতার বই। আমি

একটা লিস্ট দিচ্ছি। দু কপি করে আনবে। আর এনো রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। দু কপি।

অনীতার মন খারাপ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। এবার তা হলে সত্যিই বিদায় নেবার মুহূর্ত এসে গেছে। ফেয়ারওয়েলের আয়োজন চলছে? না হলে এসবের কী প্রয়োজন?

প্রয়োজনটা বোঝা গেল পরে। বার্ষিক পরীক্ষার কৃতী ছাত্রীদের প্রাইজ দেওয়া হবে। নন্দিতাদি কবিতা ভালবাসেন। চতুরঙ্গকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখা। তাই তিনি কবিতার বই আর চতুরঙ্গ আনতে বলেছেন। সঙ্গে ভাল চা আর বিস্কুট। টিফিনের সময় টিচার্স রুমে লাগবে।

আর একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

শেফালীই তোমাকে বলবে।

চলে যেতে হবে এই কথাটা কি নন্দিতাদি নিজে ওকে বলতে চান না? ভালবাসার মানুষ যাতে কষ্ট পায় সেরকম কোনও কথা তাকে সরাসরি বলতে নেই? ম্লান হয়ে যায় অনীতার মুখ।

তুই একেবারেই ছেলেমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

শেফালী ধমকে উঠল। তারপরই অনীতার চোখে চোখ রেখে হাসিতে ঝলমল করে উঠল শেফালী।

তোকে যেতে হবে না।

কী বলছ তুমি।

হ্যাঁ রে। তোকে আমরা আরও কিছুদিন এখানে রেখে দেব।

কী করে রাখবে। কবে যেতে হবে তা তো আগেই আমার চাকরির চিঠিতে লিখে দেওয়া হয়েছে।

বললাম না, তুই খুব বোকা। বাংলার টিচার কল্পনা ছুটিতে যাচ্ছে। তিন মাসের ছুটি। ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হিসেবে এখানে থাকতে তোর কোনও অসুবিধে হবে না।

অনীতা কথা বলতে পারে না। শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। টিচার্স রুমে অন্য টিচাররা তখন বিস্কুট চায়ে ভিজিয়ে খাচ্ছে। ওরা কথা বলছে বড় ঘরটার এক কোণে দাঁড়িয়ে।

মেটারনিটি লিভ। এখন তিন মাসের জন্য যাচ্ছে কল্পনা। ছুটি পরে আরও দু-তিন মাস বাড়াতে পারে। কী রে, খুশি তো? এই ক'দিন তোর মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না।

তোকে এত গম্ভীরও আগে দেখিনি। শেফালী বলল।

কিন্তু শেফালীদি।

যা বলার এখনই বল। তোর কি থাকতে ইচ্ছে নেই?

কোনওরকমে চোখের জল সামলে অনীতা শুধু মাথা নাড়ে। সে যেতে চায় না।

সত্যিই যেতে চায় না।

কিন্তু হাতে গোনা দিনগুলোও বড় দ্রুত ফুরিয়ে আসে। আবার ম্লান হতে থাকে অনীতার মুখ। এটা লক্ষ করেও শেফালী কিন্তু খুশিতে ঝলমল করে ওঠে।

তোর আর ক'দিন আছে রে, অনীতা?

পনেরো দিন। তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে শেফালীদি, ভাবতেই পারছি না।

মুখে চাপা হাসি নিয়ে একটা কাগজ এগিয়ে দেয় শেফালী—

নে, আমার মেটারনিটি লিভের দরখাস্তটা একটু দেখে দে তো। বড়দিকে আজই জমা দিতে হবে।

শেফালীদি! তুমি!

এছাড়া তোকে ধরে রাখার আর কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না রে। কেন? আমি কি মা হতেও পারি না?

ট্রেনের ঘণ্টা

বাবু আমাকে টেরেন ডেইভার করে দেবে? ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে কাঞ্চন বলল।

ধানমাঠ আর লালমাটির উঁচুনিচু প্রান্তরের মধ্যে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ছোট লাইন। সকাল সন্ধ্যা ছ'খানা ট্রেন আসে যায়। কাঞ্চন ও সদাশিব রোজ এই লাইনে ধনঞ্জয়বাবুকে ট্রলিতে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় অনেক দূর। ধনঞ্জয়বাবু লাইন ইন্সপেকটার। রেল লাইন, ফিস প্লেট, রেলের বাঁধ সব ঠিকঠাক আছে কি না, ট্রলিতে বড় একটা ছাতার নীচে বসে যেতে যেতে তিনি লক্ষ রাখেন।

বাবু, ও বাবু।

ট্রলি জোরে ঠেলতে ঠেলতে কাঞ্চন আবার ধনঞ্জয়বাবুকে ডাকল। সামনে ছোট একটা টিলার দিকে বাঁক নিয়েছে রেললাইন। ট্রলি এখানে জোরে ঠেলতে হবে। সদাশিবের দিকে তাকাল কাঞ্চন। সদাশিব মাথা নিচু করে ট্রলি ঠেলছে। এই লাইনে গত পনেরো বছর ধরে দিনের পর দিন যেভাবে সে ট্রলি ঠেলেছে সেই একইভাবে। যতটা বয়স তার থেকেও তাকে বুড়ো দেখায়। কাঞ্চনের চাকরি সবে দু'বছর পূর্ণ হতে চলল। সদাশিব জানে, কাঁচা বয়সে প্রথম প্রথম সেও কাঞ্চনের মতোই জোরে ট্রলি ঠেলেছিল। ঠেলত। তারপর কখন এক সময় লাল মাটির ঢিপি আর উঁচু প্রান্তরটা তার বুকে চেপে বসেছে। এখন ট্রলি ঠেলা তার কাছে নিছক একটা অভ্যাস। গায়ের জোর দেখানোর চেয়ে ট্রলির চারটে চাকায় নিয়মিত তেল বা ভেসলিন লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ বলে তার মনে হয়। কাঞ্চন ওদিকে হাঁক দিয়ে উঠল – সদাশিব কাকা, জোরে হাত লাগাও ক্যানে।

ভরপেট খেয়ে এসে ট্রলির ঝাঁকুনিতে ধনঞ্জয়বাবুর দু'চোখের পাতা তখন সবে একটু লেগেছে। কাঞ্চনের হাঁকডাকে সদাশিবের বিশেষ কিছু হল না, কিন্তু কাঠের বেঞ্চে ধনঞ্জয়বাবু নড়েচড়ে বসলেন।

কী হয়েছে রে কাঞ্চন, কাকে ডাকছিস?

সদাশিবকাকাকে গো, সদাশিবকাকাকে। হাত লাগাও, ঢাল এইসে পড়ল। এটুন ঠেললেই ট্রলিতে চাপতে পারবা।

লালমাটির প্রান্তর জুড়ে তালগাছ আর তালগাছ। সবুজ ছায়া নেমে এসেছে সারা প্রান্তরে। লালমাটির রুক্ষতার কাছে বশ না মেনে এখানে ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অবাধ্য ঘাস। শ্রাবণের জল-ভরা জমির ধানের চারাগুলো থেকেও ঠিকরে বেরোচ্ছে সেই সবুজ রঙ। দূরে কোপাইয়ের ঘোলা জলেও সেই সবুজ ছায়া। এরই মাঝখানে ঢালু

রেললাইনে ট্রলির চাকায় লেগেছে নিজের চলার ছন্দ। টিলা থেকে নেমে নিজেই সে এখন বেশ কিছুদূর চলতে পারবে। ঠেলতে হবে না। সদাশিব সময় বুঝে আগেই তড়াক করে ট্রলিতে লাফিয়ে উঠেছে। কাঞ্চনের কথাই আলাদা। সে তখনও চলেছে। এখন যে গতিতে ট্রলিটা চলছে তার থেকেও তাকে জোরে চলতে হবে। ট্রলির গতির সঙ্গে গতি মিলিয়ে একটা লাইনের ওপর দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় দৌড়তে দৌড়তে কাঞ্চনও এখন যে কোনও সময় ট্রলিতে উঠে পড়তে পারে। কিন্তু তার যুক্তি হল ট্রলি যখন ঠেলতে এসেছি, তখন যতক্ষণ পারছি ঠেলেই যাব। হাত পা জিরান পাবে বাড়িতে। যতদিন ট্রলি ঠেলার কাজে আছি, ততদিন এর অন্যথা হবে না।

কিরে, ট্রলি ঠেললেই হবে। তালবাগানের কিনারাটা দেখেছিস?

রেললাইন বাঁক নিয়ে দূরে যেখানে দিগন্তের দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে এখন কালো মেঘের ছায়া। আগাম শরৎ এসেছে রাঢ়ের মাটিতে। কড়িধ্যা তাঁতিপাড়া কিংবা বসোয়া-বিষ্ণুপুরের রেশনের মতো রৌদ্রের রঙ। সেই রঙে লেগেছে মেঘের ছায়া! মেঘ নয়, এঞ্জিনের ধোঁযা। ট্রেন আসছে।

তোর হরেনদাদার ট্রেন আসছে। নে ট্রলিটা নামা। দেরি করলে, হুড়মুড় করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে।

এখনও দেরি আছে বাবু। হরেনদাদাকে তো জানি। লুকে বলে, উয়ার ট্রেন যেন গরুর গাড়ি।

নে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। লাইন ছেড়ে দিতে হবে।

লাইনে লাল পতাকাখানা পুঁতে দিব বাবু। আজই ক্ষার দিয়ে কেচে এইনেছি। জবা ফুলের মতো টকটকাচ্ছে। হরেনদাদা ভাববে লাইন খারাপ। টেরেন দাঁড়িন যাবে। আমরা লাইন না ছাড়লে হরেনদাদার টেরেন যাবে ক্যামনে গো? তুমি লাইন কিলিয়ার দাও, তবে তো উয়ার টেরেন যায়।

নে নে ট্রলিটা আগে থামা। যেভাবে ঠেলছিস মনে হচ্ছে সোজা ট্রেনে গিয়ে ধাক্কা মারবে।

গড়ান জমি বাবু।

বাবা সদাশিব গা গতব ঘামিয়ে ট্রলিটা থামাও আগে। কাঞ্চনটাকে বিশ্বাস নেই। মাথা খারাপ।

ভয় নাই কত্তা। চৌহট্টার টেরেন এখুন কমসে কম সিকি ঘণ্টা থামবে। তারপর তো গোপালপুর হল্ট। আমরা তো অয় টেরেনেই বাড়ি ফিরব কত্তা।

আজ আর ট্রেনে চেপে ফেরা তোদের কপালে নেই। চৌহাট্টা পেরিয়ে লাইন ইন্সপেকশনে যেতে হবে। বিকেলের ট্রেনে ফিরতে পারিস। তা ততক্ষণ যে পেটে আগুন ধরে যাবে রে।

কুজোতে জল লিয়েছো তো বাবু। অয় জলেই আগুন নিভিন যাবে।

খিক খিক করে হেসে উঠল কাঞ্চন।

ব্যাটা, ইয়ার্কি করছি? থামা ট্রলি।

রেললাইনের এক পাশে ট্রলি থামাতে না থামাতেই ট্রেন এসে পড়ল। ধনঞ্জয়বাবু ট্রলির বেঞ্চে বসে আছেন। দু পাশে দাঁড়িয়ে সদাশিব ও কাঞ্চন। কাঞ্চন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে ট্রেন ও তার হরেনদাদাকে। ডেইভার হরেনদাদার মাথায় রুমাল বাঁধা। ছোটবেলায় ভিনগায়ের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে ব্যাকে খেলার সময় কাঞ্চন মাথায় এ রকম রুমাল বেঁধে খেলত। উঁচু বলে সহজেই হেড দিত। মাথায় রুমাল বাঁধলে যেন হেড দেবাব সুবিধা হয়। গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেরা তাই ভাবত। কাঞ্চনের সেই বীরত্বব্যঞ্জক রুমাল এখন হরেনদাদার মাথায় উঠেছে।

হরেনদাদার ট্রেন এবার টিলার দিকে এগোচ্ছে। এঞ্জিন যেন এগোতেই চাইছে না। ছুটে গিয়ে কাঞ্চন ধরে ফেলল এঞ্জিনটাকে। এঞ্জিনের পাশাপাশি দৌড়তে থাকল।

তুমার টেরেন সদাশিবকাকাকে হার মানাচ্ছে হরেনদাদা। তা বুড়া এঞ্জিনে কি ছোকরা ড্রেইভার মানায়?

ট্রলি লয়ে ওই গাবাতেই পড়ে থাক। মনে রাখিস এই টেবেনই কাল টলি চাপিন ফিরতে হবে। তা, সবুজ পতাকাখান তোব হাতে কেন রে কাঞ্চন? গার্ডসাহেব হতে চাস!

বিছুটি লাগলেও গায়ে এত জ্বালা ধরত না কাঞ্চনের। দেশে হবেনদাদা ছাড়া আর টেরেন ড্রেইভার নাই নাকি? এত ডাঁট উযাব।

পা থেমে গেল কাঞ্চনের। আস্তে আস্তে ট্রেন ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

ফেরাব পথে সে একটাও কথা বলল না। স্টেশনে ফিরে এসে ট্রলিটা লাইন থেকে নামিয়ে টিকিট ঘরেব পাশের গুমটিতে রাখল। সদাশিব ততক্ষণ ট্রলির ছাতা, ধনঞ্জয়বাবুর বাক্স, জলের কুঁজো নামিয়ে এনেছে। ছাতা, বাক্স কুজো পতাকা ও টুকিটাকি জিনিসপত্র অফিসঘরে জিম্মা দিয়ে সে বাড়ি ফিরবে। ট্রলির বেঞ্চ, চাকা ধুয়েমুছে তকতকে করে রাখবে কাঞ্চন। আজ ফিরতে দেরি হয়েছে। তবু এ কাজটা সে আগামীকালের জন্য তুলে রাখবে না।

ওদিকে তালগাছগুলোর ওপারে সূর্য অনেকটা ঢলে পড়েছে। কীর্ণহার থেকে আমোদপুরের ট্রেন আসার সময হয়ে গেছে। লাঘাটা ব্রিজের কাছে দেখা যাচ্ছে ট্রেনের ধোঁয়া। বিকেলের যাত্রীরা মোরাম ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁইথিয়া থেকে একজন বাউল দুপুবের ট্রেনে এখানে আসে। ট্রেনে গান শুনিয়ে দু'চার পয়সা রোজগার করে। বিকেলের ট্রেনে আমোদপুর হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ওই বাউল এখন প্ল্যাটফর্মে ঘুবে ঘুরে গাইছে—কিন্তু আজ পড়ন্ত বিকেলে গুমটি ঘরের হলুদ ছায়ায় ট্রলির চাকা পরিষ্কার করতে করতে গানটা তার হঠাৎ ভাল লেগে গেল। কিন্তু ভাল-লাগার বোধ ওকে আচ্ছন্ন করার আগেই ঘ্যাচ ঘ্যাচ শব্দে ট্রেনে এসে পড়ল। ট্রেনের দিকে তাকানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই কাঞ্চনের। ট্রলির চাকায় আরও কয়েক বালতি জল ঢেলে

সে বাড়ির পথে পা বাড়াল। পথেই পড়ে ধনঞ্জয়বাবুর মাঠকোটা। লাল মাটি দিয়ে নিকানো তকতকে দাওয়া। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে মোড়ায় বসে আছেন ধনঞ্জয়বাবু। গেলাসে চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছেন।

কী রে, এত দেরি হল?

ট্রলিটা ধুয়ে মুছে রাখলাম।

তোর না ট্রলি চালাতে ভাল লাগে না?

ভাল লাগবে না ক্যানে বাবু? তাই ধুয়েমুছে রাখি। তবে ইযার চেয়েও ভাল টেরেন চালানো। টলির লুকেরাই তো রাস্তা সাফ রাখে। উহারা চালায়। হরেনদাদার দেমাক দেখলে বাবু! সরকারদের ইটখোলার কিলনারও তো এখন টেরাক চালাচ্ছে। অয় তো সেদিনও টেরাক চালাতো বাসু।

ধনঞ্জয়বাবু কোন জন্মে মেকানিকাল একটা কলেজ থেকে পাশ করে নানা গ্রামগঞ্জে ঘুরে এই চাকরিতে এসেছেন। কাঞ্চনের কথায় কখনও কখনও তাঁর বিরক্তি হয়। অন্তত যখন কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু ঢিমে তালের এই পৃথিবীতে ছেলেটার জন্য তাঁর মায়াও হয়। তিনি তাকে প্রশ্রয় না দিয়েও পারেন না। একা থাকার মুহূর্তে কখনও না কখনও তিনি নিজেকে বলেছেন— তোর পাগলামিটা আমি বুঝতে পারি কাঞ্চন। সদাশিব বেঁচে আছে কিন্তু থাকার কোনও অনুভূতিই ওর নেই। আর নিজেও আধমরা। তোর ট্রলিতে চেপে এটা অন্তত আমার মনে হয়, আমি বেঁচে আছি, আমি বেঁচে আছি। তুই যা পেয়েছিস তার থেকেও আরও বেশি কিছু, ভাল কিছু চাওয়ার যন্ত্রণাটা আমি বুঝি কাঞ্চন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন ধনঞ্জয়বাবু। কাঞ্চন তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। না, পিছু ডেকে ওর দেরি করিয়ে দেবার মানে হয় না।

কাঞ্চনের অবশ্য কখনও দেরি হয় না। প্রতিদিনের মতো পরের দিনও সে সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় ধনঞ্জয়বাবুর বাড়িতে হাজির।

চলো বাবু। লাইনে যাবে না?

তাড়া যেন কাঞ্চনেরই বেশি। ট্রলির মতো ওর নিজের পায়েও যেন চাকা লাগানো আছে। খেয়ে উঠে বউয়ের সাজা পানটিও মুখে ফেলার ফুরসৎ পান না ধনঞ্জয়বাবু। শুধু ট্রলিতে বসার অপেক্ষা। আর ট্রলিতে বসতে না বসতেই একের পর এক উঁচু নিচু প্রান্তর চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসেন লাইন ইন্সপেকটার ধনঞ্জয়বাবু। লাইন ঠিকঠাক আছে কি নেই, ফিস প্লেট আঁটোসাটো আছে কিনা অথবা কোথাও কিছু ওলট পালট হয়ে আছে, কাঞ্চন তা ট্রলির চাকার শব্দেই বুঝতে পারে। ধনঞ্জয়বাবু যেমন নিশ্চিন্ত, তেমনি নিশ্চিন্ত সদাশিব। সদাশিব জানে, 'হাত লাগাও ক্যানে কাকা'— এটা কাঞ্চনের কথার কথা আসলে হাতটা লাগায় কাঞ্চন নিজেই। কারও মুখ চেয়ে সে বসে থাকে না।

সেদিন চৌহট্টা থেকে কাঞ্চনদের ফেরার কথা। ট্রলি গুটিয়ে হরেনদাদার ট্রেনে তুলে নিয়ে আসবে। কিন্তু চৌহট্টায় পৌঁছে দেখল, তখনও সিগন্যাল পড়েনি। ট্রেনের

ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে না।

হরেনদাদার টেরেনের তো এত দেরি হয় না বাবু। টিকিটের ঘণ্টাও হয় নাই।

অজয়ের ওপারে বড় লাইনের ট্রেন আটকেছে লোকেরা। কী সব দাবিদাওয়া আছে।

অজয় পেরিন হরেনদাদার টেরেন যায়?

সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের ট্রেন আসতে পারছে না। ওই লাইনের প্যাসেঞ্জার নিয়েই তো তোর হরেনদাদার ট্রেন ছাড়ে।

তালে হরেনদাদার টিকি বাঁধা বলো?

এত বড় খুশির কথা কাঞ্চন আর আগে শোনেনি। বড় লাইনের টেরেন আসবে, তবে হরেনদাদার টেরেন আসবে, তবে হরেনদাদার টেরেন ছাড়বে? যদি অয় টেরেন না আসে বাবু?

অপেক্ষা করবে। খুব দেরি হলে ছেড়ে চলে আসবে।

রোজই হরেনদাদাকে ওই টেরেনের লেগে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? কাঞ্চনের হাসি থামতে চায় না! ধনঞ্জয়বাবু ভাবলেন, এও এক নতুন পাগলামি কাঞ্চনের।

চলো, বাবু তাড়াতাড়ি ফিরি।

কেন রে? তাড়া কিসের?

খবরটা দিতি হবে না?

ঘরের পথে ট্রলি ঠেলতে শুরু করেছে কাঞ্চন। সদাশিবও চটপট হাত লাগিয়েছে। ওর উৎসাহও আজ বেড়ে গেছে।

অয় যে উনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন—ফেরার স্টেশনে প্লাটফর্মের কাছাকাছি আসতেই কাঞ্চন উচ্চকিত হয়ে উঠল।

হরেন ড্রাইভারের স্ত্রী চাঁপা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মাজা কালো, ছিপছিপে চেহারা। স্নান সেরে পারপাটি হয়ে এসেছে। হাতে এনামেলের টিফিন কেরিয়ার। দুপুরে এই স্টেশনে আপ ডাউন দুটো ট্রেনের ক্রসিং হয়। দুটো ট্রেনই অনেকক্ষণ থাকে। চাঁপা রোজ এই সময় টিফিন কেরিয়ারে স্বামীর ভাত তরকারি নিয়ে আসে। কাঞ্চন ট্রলি থামিয়ে চাঁপার সামনে দাঁড়াল।

চাঁপা বউদিদি তুমার কত্তার টেরেন আসতে দেরি হবে। বুঝেছ, হরেনদাদারও টিকি বাঁধা রইছে। বড় লাইনের টেরেন এলে তবে তুমার কত্তার টেরেনের সিটি পড়ে।

কাঞ্চনের হঠাৎ এত উচ্ছ্বাস ও আনন্দের কারণ চাঁপা বুঝতে পারে না। টিকিটঘরে গিয়ে সে জেনে নেয়, ট্রেন এখনও আমোদপুর ছাড়েনি। এখানে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। এর বেশি আর কিছু চাঁপার জানার নেই।

স্টেশনের বাইরে রাস্তার দুপাশে সারিসারি চালাঘরে কয়েকটা চায়ের দোকান। পাইস হোটেল। সেলুন। সাইকেল মেরামতের দোকান। রাস্তা দিয়ে যেতেই চাঁপার চোখে

পড়ল। ধোঁয়া ওঠা একটা চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চে বসে কাঞ্চন চায়ে ডুবিয়ে শুকনো একটুকরো পাউরুটি দাঁতে টেনে টেনে খাচ্ছে। কবে কার পাউরুটি কে জানে! সেই রুটি সে খাচ্ছে তৃপ্তি করে। চাঁপা ওব সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এই কাঞ্চন শোন। তুই দাদার খাবারটা খেয়ে লে।

কী বলছে গো? দাদার লেগে ভাত এনেছ আর আমি খাব?

চাঁপা ওর চোখে তাকিয়ে থাকল। চোখ ফেরাতে পারল না কিছুক্ষণ। তারপর একসময় গাছতলায় গিয়ে বসে টিফিন কেরিয়ার খুলে বলল—কাঞ্চন তুই ইখেনে আয়।

মানিক ডুবুরি

ছেলেটা ডুবে ডুবে জল খায় না। সত্যিই ভাল ডুব-সাঁতার জানে। নাম মানিক ভুঁইএগ্রা। বয়স কুড়ি কিংবা একুশ। ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রঙ কালো। বাড়ি বাঁশজোড়া। বীরভূমের আর পাঁচটা গ্রামের মতোই একটি গ্রাম। তফাত এই যে, গ্রাম ছাড়ালেই বালির চর আর শরগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ময়ূরাক্ষী তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার ময়ূরাক্ষীতে মানিক জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে না, আসলে সে কখনও নদীতে সাঁতার দেয়নি। ভরা নদীর স্রোত আর গভীরতাকে দু'পায়ে মাড়ানোর যে কী আনন্দ সে কখনও অনুভব করেনি। সে সাঁতার শিখেছে গ্রামের পুকুরে। লম্বা চওড়ায় সে সব পুকুর কিছু আহামরি না হলেও তারও একটা নিজস্ব গভীরতা আছে। আছে তার নিজস্ব পাঁক, গুগলি, শামুক, চুঙড়ি পাতা, পানকৌড়ি আর জলপিঁপি। বাউলের গেরুয়া আলখাল্লার মতো যে নদীব রঙ, সে যে কেন মানিককে আকৃষ্ট করেনি তার কারণ খোঁজার দরকার নেই। তোমবা যে বলো মানিক ভাল সাঁতার জানে, তার চেয়েও ভাল জানে ডুব-সাঁতার—এটাই যথেষ্ট।

মানিককে গ্রামের লোকেরা বলে জলপোকা। ঘোষপুকুরে দুপুববেলা হঠাৎ দেখা গেল মড়া ভাসছে। ঘোষপুকুরের গা বরাবর জেলা পরিষদের রাস্তা। লোকেরা পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। "উটা কী হে, মড়া নাকি?" গুঞ্জন মানিকের কানেও পৌঁছয়। দু'চোখ বন্ধ করে চিৎ হয়ে সে এতক্ষণ নিশ্চল ভঙ্গিতে ভেসেছিল। এবার নিঃশব্দে জলের তলায় তলিয়ে যায়। ভিন গাঁয়ের লোকেরা ভ্যাবাচাকায় পড়ে। তাবপর হঠাৎই মানিক ওদের কাছাকাছি ভেসে ওঠে। এটা মানিকের একটা খেলা। গ্রামের এমন কোনও পুকুব নেই যেখানে সে এই খেলা খেলেনি। ওর খেলার শেষ নেই। পুকুর দেখলেই ওকে খেলার নেশায় পেয়ে বসে।

গ্রামের আর সব পুকুররের চেয়ে ঘোষপুকুরের জল ভাল; স্থানীয় লোকদের ধারণা। বাতাস দিলে এ পুকুরে এখনও ঢেউ ওঠে। স্নানের পুকুর বলতে এই একটাই। রোদ চড়া হতে না হতেই ছোট ছোট ছেলেরা জলে নেমে পড়ে। হাঁটু জলে কাভুক কুভুক করে। এক সময় মানিক হয়তো নিঃশব্দে জলের তলা দিয়ে এসে ওদেরই কারও একজনের পা চেপে ধরল। সে তো ভয়ে ককিয়ে ওঠে। মানিক ওকে একটু ডুবান জলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। দু তিন ঢোক জল গেলার আগেই মানিক আবার ওকে হাঁটুজলে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এই নিয়ে ঘোষবাড়ির গিন্নির কাছে অনেকবার ধমক খেয়েছে মানিক। এখন তিনিও আর তত গা করেন না। ছেলেরাও মানিকের এই খেলাটায় মজা পায়। ওরা

মানিককে দেখলেই এখন শোরগোল তোলে —মানিকদাদা তোমার পিইঠে কইরে মাঝপুকুরে লিয়ে চলো। মানিকও ওদের খুশি করে। একের পর এক ছেলেরা ওর পিঠে চাপে। মানিক সাঁতার কাটে। ক্লান্তি নেই। সূর্য মাথায় ওঠে।

পুকুরে ছেলেদের নিয়ে মানিক যে মজা করে তাতে এখন ঘোষগিন্নির তত আপত্তি নেই। তাঁর আপত্তিটা অন্য। স্নানের ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে উঠে আসতে আসতে তিনি বিড় বিড় করেন—ছোঁড়ার জ্বালায় মেইয়্যারা আর ঘাটে নাইমতে পাববে না। মেইয়্যাদের দেখলেই ছোঁড়া মাগুর মাছের মতন ঘাটের কাছে খলবল করে।

জলে ও স্থলে ঘোষকর্তা বেশ পরাক্রমশালী। গ্রামে তাঁর মালিকানাধীন পুকুরের সংখ্যা গণ্ডা দেড়েক। কাগজে-কলমে তাঁর নিজের নামে জমি কম থাকলেও নিন্দুকেরা বলে তিনি অন্তত শ'চারেক বিঘে জমির মালিক। খুদে জমিদার ঘোষকর্তার বয়স যত বাড়ছে ততই বাড়ছে মেজাজ। মুখ দেখলে মনে হয়, মেজাজটা সব সময় খিঁচড়ে আছে। জমি, পুকুর, ধান, মাছ, গোয়ালের গরু, সব মিলে ছোটখাটো একটি রাজ্যপাটের অধীশ্বর হয়েও তাঁর মুখের ভঙ্গি কেন এমন অপ্রসন্ন তা তিনিই বলতে পারবেন। ইদানীং তাঁর মেজাজটা আরও খিঁচড়ে আছে। তার কারণ ওই মানিক ছোঁড়া। ঘোষগিন্নি কথাটা তাঁর কানে তুলে দিয়েছেন—তুমাদের ওই মানিক ডুবুরির জ্বালায় মেইয়্যাদের চান বন্ধ হইয়ে যাবে। ছোঁড়া বিয়ে থা কইরে বউকে লিয়ে ঘরে কেলি করুক। বয়স হয়্যাছে। ছোঁড়ার দাদাটোকেই বা কী বইলি। ঘোষকর্তা স্ত্রৈণ এমন অপবাদ কেউ দেবে না। কিন্তু স্ত্রীর কথা তার কাছে কখনও কখনও বেদবাক্য হয়ে ওঠে, এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ঘোষ গিন্নিও জানেন কোন কথাটায় কখন কর্তার মনে কাজ হয়।

ঘোষকর্তা পায়চারি করতে করতে পুকুরের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মানিকের দেখা পেলেন না। কিন্তু তাঁকে দেখে স্নানরতা মেয়েরা শশব্যস্ত হয়ে উঠল। ভিজে ব্লাউজ বুকের ঢিপ ঢিপ মাংসের সঙ্গে আঠা হয়ে লেগে গিয়েছে। যে যেভাবে পারে তাড়াতাড়ি বুকে আঁচল চাপা দিল। কর্তার হল মুশকিল। ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ঘরে ঢুকলেন। পিছন ফিরে দেখলেন কেউ আসছে কি না। দরজাটা ঠেকিয়ে দিয়ে দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। আয়নার আয়নাত্ব বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। তার ওপর ঘরটা দিনদুপুরেই আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। মুখের চামড়া কতটা কুঁচকেছে এই অবস্থায় ঠিকমতো বোঝা না গেলেও, মাথার চুলে যে সাদা শামিয়ানা ইতিমধ্যেই অনেকটা জায়গা জুড়ে টাঙানো হয়ে গিয়েছে তা তিনি এই প্রথম ভাল করে টের পেলেন। মনে মনে অবশ্য এই ভেবে সান্ত্বনা পেলেন যে, আজকাল আর চুল পাকার বয়স নেই। কথায় বলে, বলবুদ্ধি ভরসা তিরিশে সব ফর্সা। বলবুদ্ধি হোক বা না হোক মাথার চুল তো ফর্সা হয়ে যাচ্ছেই। তিনি অনেক দেখেছেন। অবশ্য তাঁর বয়স তিরিশের চেয়ে আরও তিরিশ বছর বেশি হতে বছর সাতেক মাত্র বাকি আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ঘোষকর্তা দেখলেন, ছোট মেয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে।

কী রে, কোথায় চললি? আজ বুঝি ইস্কুল যাস নাই?

ইস্কুল গেলে কি এখন আমাকে দেইখতে পেতে?

হ্যাঁ, তাই তো বটে। তা শোন, একটা কাজ করে দে দিখিনি। চুল তুলে দিতে পাইরবি?

সবই তো পাকা চুল। এখন খুঁজে পেতে ক'টা কাঁচা চুল আছে তাই দেইখতে হবে।

মেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। ঘোষকর্তা পড়লেন মহা ফাঁপরে। মানিক ডুবুরি তাঁকেও ডুবান জলে টেনে নিয়ে গেল দেখছি। একটা ছবি বারবার তাঁর কল্পনায় ফুটে উঠতে লাগল। তিনি পুকুরের ঘাটে স্নান করতে নেমেছেন; এমন সময় মানিক ডুব-সাঁতার দিয়ে এসে তাঁর পা চেপে ধরে তাঁকে জলের তলে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। নাঃ, ছোঁড়া শুধু মেইয়্যাদের ইজ্জতই লষ্ট করছে না, আমার ইজ্জতও লষ্ট করছে দেখছি। বিহিত করতেই হয়।

কিন্তু বিহিত করবেন কী করে? মানিকরা তো তাঁর জমির কৃষাণ, মাহিন্দার, ভাগচাষি কোনওটাই নয়। ভাগচাষি হলে জমি থেকে উৎখাত করে দিতেন। চাষের ন্যায্য পাওনা আটকে রাখতেন। কৃষাণ হলে বছরের মাঝামাঝি তাদের ছাঁটাই করে দিতেন। বাকি ক'টা মাস ওরা গাঁয়ে কোনও কাজই পেত না। বিহিতটা করবেন কী করে? ওরা তো তাঁর খাতকও নয়। মানিকের বাব মাবা যাবার সময় দু' ভাইয়ের জন্য রেখে গিয়েছেন একটি পানের বরজ। বড় ভাই সোনা বরজটা দেখাশোনা করে। আর মানিক ঘোষবাড়ির সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করতে করতে পানের বোঝা সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে সোজা চলে যায় সিউড়ি। সেখানে পানদোকানগুলোতে অর্ডার আছে। যত জোগান দেবে ততই ওরা পান নেবে। লোকেরাও বেশি পান খাচ্ছে এখন। মানিকদের আর পায় কে?

ডুব-সাঁতার দিয়ে যে মানিক বার বার হাসিমুখে জলের ওপরে ভেসে ওঠে, ডুবসাঁতার দেওয়া যার নেশা, জলের নীচে ডুবে থাকার সময় ক্রমশই যে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই মানিককে বাগে পাওয়া সত্যিই কঠিন কাজ। বরং এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে ঘোষবাড়িকে মানিকের দ্বারস্থ হতে হল। উপায় নেই। মানিক ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ঘোষের বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে ইলামবাজারে। চল্লিশ ভরি সোনা, দশ হাজার টাকা নগদ, দানের বাসনকোসন খাট বিছানা ইত্যাদি মিলে প্রায় পৌনে লাখ টাকা খরচ করে ঘোষকর্তা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বাপের এক ছেলে পাত্রের জমিজমা খারাপ নেই। তাছাড়াও পানাগড় বাজারে সে একটা গোলদারির দোকান চালায়। নগদ টাকার জোর না থাকলেও পাত্রের কোমরে জোর আছে। আরও উন্নতি করবে সন্দেহ নেই। এরকম সম্ভাবনাময় পাত্র, তার ওপর মেয়ে বড় আদরের। ঘোষকর্তা তো দরাজ হাতে খরচ করবেনই। তাঁর একটা বড় সুবিধে, সোনা তাঁকে বাজার থেকে কিনতে হয় না। ঠাকুমার আমল থেকেই বিবাহসূত্রে বাড়িতে বহু সোনা আসছে। ঘোষগিন্নিও প্রচুর সোনা এনেছেন বাপের বাড়ি থেকে। গিন্নির বাবা মাঠে সোনা ফলান, আর বাড়িতে জমান সোনা। দূরদর্শী

ব্যক্তি। বেশ কয়েক ভরি সোনা এনেছেন বলেই তো ঘোষগিন্নি এখনও মাঝেমধ্যে কর্তাকে মুখ ঝাপটা দিয়ে উঠতে পারেন।

বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে ঘোষের মেয়ে সৌদামিনীর। স্বামীকে নিয়ে আগেও সে অনেকবার বাপের বাড়ি এসেছে। তবে এবাব স্বামী তো আছেই, নতুন সংযোজন কোলের বাচ্চা। ন্যূনতম সময়ে নাতিলাভের আনন্দে বেজায় খুশি ঘোষবাড়ির কর্তা-গিন্নি দুজনেই। যুগপৎ মেয়ে ও জামাইয়ের কৃতিত্বে বিহ্বল তাঁরা আর নাতিকে কোল ছাড়া করতে চায় না। সৌদামিনীকে রীতিমতো ছিনতাই করে নিয়ে যেতে হয় তার বাচ্চাকে।

দাদুর কোলে নাতি। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে। সৌদামিনী এসে ওর বাপের কাছে দাঁড়াতেই ব্যাপারটা কর্তার চোখে পড়ল। তাঁর নজর কড়া, ফাঁকি দেবার উপায় নেই। মেয়ের আড়াই ভরি ওজনের বিছে হারটা গলায় নেই। হারিয়েছে, নাকি খুলে রেখেছে? তাই বা কী করে হবে? বাড়িতে পরার জন্যই তো ওই বিছেহার। বিয়ের পর মেয়ে একবারও তা গলা থেকে খোলেনি। কর্তা বার বার বলেছেন, চুরি ছিনতাই বেইড়ে যাচ্ছে। ওই হার পইরে ট্রেনে বাসে ঘুইরিস না। মেয়ে কিন্তু নিষেধ শোনেনি। ভাবটা এই, আমার গলা থেকে হার ছিঁড়ে নেবে এমন পুরুষ জন্মায়নি। লেবার রুমে ফরসেপ দিয়ে বাচ্চা বের করার আগে ওকে অজ্ঞান করার সময় ডাক্তার বলেছিলেন, হারটা খুলে কাউকে দিন। এর পর ঘণ্টা দুয়েক আপনার জ্ঞান থাকবে না। ওয়ার্ডে কতরকম লোকের আনাগোনা। হারটা খুলে নিতে পারে। আপনি টেরও পাবেন না। লেবার পেনে ছটফট করেও সৌদামিনী বলতে ভোলেনি, হারটা থাকুক। বড় পয়মন্ত হার।

সেই পয়মন্ত হারটাই এখন সৌদামিনীর গলায় নেই। চুপিচুপি কথাটা কর্তা গিন্নিকে জানালেন। গিন্নি এক সময় মেয়েকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস ফাস করে বললেন, হ্যাঁরে তোর বাবা বলছিল, হারটা কুথায়? এই তো কালই দেইখল্যাম পইরে আছিস।

বাক্সে খুইলে রেখ্যাছি।

চানের পর পইরে নিস বাপু তোর বাপ না হলে আমাকে আর আস্ত রাইখবে না। জেরা কইরবে। যেন আমিই নিয়্যাছি।

স্নানের পরও হার মেয়ের গলায় না দেখে অজানিত ভয়ে ঘোষগিন্নি ছটফট করে উঠলেন।

কথা শুনিস না কেনে? যা পইরে আয়।

হেই মা, কী হবে, তোমাকে বলি নাই। চানের সময় কাল ঘাটে পইড়ে গিয়্যাছে। কত খুঁইজলাম। পাই নাই।

সে কী রে। আগে বলিস নাই ক্যানে। তা ঘাটে পইড়লে আর যাবে কুথায়? গাবাতেই আছে। দাঁড়া, তোর বাপকে বলি।

শোনামাত্রই হায় হায় করে উঠলেন ঘোষকর্তা।

আর কী আছে গো উই হার? বাজারে চার হাজার টাকা দাম বটে। কাল সকালে মাছ ধইরাইল্যাম। জেইল্যাদের জালে উঠে নাই তো?

তা ক্যানে হবে? মেইয়্যা তো ঘাটে গিয়্যাছে দুপুরে। জেইল্যারা মাছ ধরল। সে মাছ রান্না হল। জামাই তো সে মাছ খেইয়ে বিকালের বাসে চইল্যে গেল।

তুমি বুলছ জেইল্যারা উঠার পর মেইয়্যা ঘাটে গিয়্যাছে? তা আগে আগে বুলে নাই ক্যানে?

ভয়ে বুলে নাই। মানকে ছোঁড়াকে ডাক। ডুবুরি ভাল। উই পাইরবে উঠাতে। কূয়ার মতন এখন জল পুকুরে। পাইরবে কি?

হ্যাঁ গো, উ ছাড়া আর কেউ পাইরবে না। হাজরা বাড়ির কুয়া দেইখেছো? পাতালের মতন গর্ত। সিখানে ডুব দিয়ে মানকে হাজরার মেইয়্যার কানের মাকড়ি তুইলে দিয়্যাছে। আর হার পারবে নাই?

মানিক ডুবুরির ডাক পড়ল। যে ঘোযগিন্নি এতদিন 'মেইয়্যাদের ইজ্জত লিল' বলে মানিককে গালমন্দ করতেন, তিনিই মানিককে দেখামাত্র হাতে চাঁদ পেলেন। মেয়ের হার হারানোর জন্য যেমন তিনি মাথার চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়তে লাগলেন, তেমনই আবার মানিককে যে তিনি কত ভালবাসেন, মানিক যে গ্রামের এক রত্নবিশেষ, সাত কাহন করে একথাও জানাতে ভুললেন না। কাজটা এখন হাসিল করতে হবে তো। তিনি যে এখন মানিকের পায়েও পড়তে পারেন সে লক্ষণও দেখা গেল।

হইয়েছেটো কী? তলব কইরেছেন ক্যানে? মানিকের মুখে যে হাসিটা সবসময় লেগে থাকে তাই এখন আরও একটু বিস্তৃত হল।

তিন ভরি ওজনের গলার হার খুইলে পড়্যাছে ঘাটে। তুকে তুইলে দিইতে হবে। হারটা যে খুব দামি তা বোঝাতে তিনি ওজনটা বাড়িয়ে বললেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, কাজটা ঠিক হল না। তিন ভরি ওজনের হার শুনে যদি ছোঁড়ার লোভ লকলকিয়ে ওঠে।

ওজনটা যা হবার হউক বাবা, তুই মেইয়্যার হারটা তুইলে দে। মেইয়্যা আমার পাঁচ পাঁচটা টাকা বখশিশ দিইবে বল্যাছে।

বখশিস চাই না গো। রোজই তো হাজার বার ডুব দিইতে হয়। এখন না হয় আবার দিইব।

ঘাটের কাছে পুকুর পাড়ে মোড়া পেতে বসলেন ঘোষকর্তা। গিন্নিমা দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চা কোলে সৌদামিনী। বাড়ির মাহিন্দারদের কানেও এখন খবরটা পৌঁছেছে। হাল বলদ বাড়িতে রাখতে এসেছিল দুই কৃষাণ—জামাল ও জলিল। তারাও এখন পুকুর পাড়ে। যেন একটা প্রদর্শনী খেলা শুরু হতে যাচ্ছে, খবরটা সে ভাবে রটে গেল। তাছাড়া ঘোষকর্তার মেয়ের হার হারানো যে সে ব্যাপার নয় এ তল্লাটে। সুতরাং মৌখিক সমবেদনা জানাতে লোকের অভাব হবে না। তারা এখন আস্তে আস্তে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

মানিক এক একবার ডুব দিচ্ছে আর বুকের ধুকপুকুনিটা বেড়ে যাচ্ছে ঘোষকর্তার। গিন্নিমা নারায়ণকে সিন্নি মানত করেছেন। ওই তো মানিক আবার ডুব দিয়েছে। এখনও

উঠছে না। দেরি করছে। বড় বেশি দেরি করছে। তাহলে এবারই হয়তো পাওয়া যাবে হারখানা। কানের মাকড়ির মতো ছোট্ট একটুকুন জিনিস তো নয়। পাওয়া যাবেই। ওই তো মানিক উঠল! এবারই পাওয়া যাবে। বুক জলে ডুবে থেকে মানিক দু মুঠো পাঁক ছুঁড়ে দিল ডাঙায়। একেবারে কত্তামশাইয়ের কোল ঘেঁষে।

দ্যাখিস ব্যাটা, কাপড় লষ্ট কইরে দিস না।

ধড়ফড় করে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা কঞ্চি দিয়ে পাঁকটা ঘাঁটতে শুরু করলেন। না, এবারও পাওয়া গেল না। ওঠেনি।

মানিক ডুব দেয়, আর মুঠো ভরে তুলে আনে পচা কালো পাঁক। ডাঙায় ছুঁড়ে দেয়। কর্তা-গিন্নি পাঁকে কাউকে হাত লাগাতে দিচ্ছেন না। নিজেরাই খুঁজছেন। মানিক আবার পাঁক ছুঁড়ে দিল ওপরে। মুঠো ভরে পাঁক ছোঁড়ার সময় চোখে চোখ পড়ে গেল সৌদামিনীর। সৌদামিনী চোখ নামিয়ে নিল। মানিক দেখল সৌদামিনীর দৃষ্টিতে কোথাও কোনও ব্যাকুলতা নেই। শূন্য দৃষ্টি। তারই মধ্যে সামান্য একটু মমতা হয়তো চোখের কোণ সিক্ত করে রেখেছে। এটা অবশ্য মানিকের কল্পনা। গোপন কামনা। কিন্তু এখন যা চোখে পড়ল তাতে তার কোনও আগ্রহ জন্মাল না। মানিকের চেয়ে বয়সে বছর খানেক ছোট সৌদামিনী। আগে ছিপছিপে চেহারা ছিল। বিয়ের পর এখন গা গতরে মেদ জমেছে। সস্তা সুখের লক্ষণই এই।

কত্তা, ডোবা হচ্ছে না। আঁধার লাইগছে। জলের তলে কিসসু দেইখা যেছে না।

ডুব দে ব্যাটা, ডুব দে আঁধার হয় নাই।

শুধু ডুব দেওয়া নয়, জলের তলা তোলপাড় করে মানিক। বাজপাখির মতো চোখে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। চোখ দুটো এখন লাল। কিন্তু রাগে তার চেয়েও আর লাল হয়ে উঠেছে কত্তামশাইয়ের চোখ।

রেতের বেলা মাছ চুরি আটকাইতে কত্তা সারা পুকুরে বাঁশের ছিটকি, গাছের ডালপালা ফেইল্যাছেন। বাবলা আর কুলের ডালপালা সারা পুকুরে। গায়ের মাংস ছিঁইড়ে ফালা ফালা হইয়ে গেল। আর দম নাই।

তুকে আমি পুলিশে দিব। ব্যাটা কুয়া থেকে মাকড়ি তুলতে পার আর পুকুরের ঘাট থেইকে বড় এক গাছ হার তুইলতে পার না? তুই নির্ঘাত পেইয়েছিস। গাবায় পুঁইতে রাইখ্যাছিস। রাতের বেলা লিয়ে যাইবি। ডুব দে ব্যাটা, ডুব দে। মাইর‍্যা ফেইলব।

এতক্ষণ কঞ্চি দিয়ে পাঁক ঘাঁটছিলেন কত্তামশাই। রাগের মাথায় এখন নিজের হাতে এক দলা পাঁক তুলে নিয়ে মানিককে ছুঁড়ে মারলেন। মানিকের লাগল না। সে তখন ডুব দিয়েছে। একটু পরেই ভেসে উঠে বলল—কত্তা, হার পুকুরে নাই। থাইকলে মানিক ডুবুরিকে ফাঁকি দিইতে পাইরত না।

মানিক এখন বুঝতে পেরেছে হারটা পুকুরে নেই। তবু বাধ্য হয়েই সে আবার ডুব দেয়। ওঠে। ডুব দেয়। ওঠে। আবার ডুব দিয়ে যায়। তারপর একসময় আর ওঠে না। পাঁচ—দশ—পনেরো—কুড়ি মিনিট—হয়তো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। পাড়ের

লোকগুলো হই হই করে উঠল। তারাও নেমে পড়ল জলে। এদিক ওদিক খুঁজে মানিকের বেঁহুশ দেহটাকে ডাঙায় তুলল।

সৌদামিনীর সেই হার ওদিকে এতক্ষণ পানাগড়ের এক স্যাকবার হেফাজতে জমা পড়েছে। সৌদামিনীর স্বামীর নাম বংশী। তার কেষ্টলীলার হেপা সামলাতে সতীসাধ্বী স্ত্রীকে গলার হার খুলে দিতে হয়েছে। সৌদামিনী অবশ্য জানে, স্বামীর পানাগড়ের ব্যবসাপত্র বাড়ছে, সেইজন্য টাকা দরকার। টাকার বদলে সোনার হার হলেও চলবে। কোলের বাচ্চার পয় আছে বলতে হবে। বাচ্চাকে আদর করার সময়ই হার খুলে দিয়েছে সৌদামিনী। এভাবে সে আগেও হাতের চুড়ি আংটি খুলে দিয়েছে। ঘোষকর্তা ও গিন্নির চোখে পড়েনি। চোখ থাকলে তাঁরা দেখতে পেতেন মেয়ের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত চুড়িও অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

জলজামিন

বালির ঝড়ে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সারাদিন বালি ওড়ে। কখনও জোরে কখনও আস্তে। আর ঝড় শুরু হলে তো কথাই নেই। বাইরে বেরনো দূরে থাক, জানলা-দরজার বন্ধ পাল্লার ফাঁকফোকর খুঁজে ঘরের ভেতর বালি ঢুকে যায়। মনের হয়, পুরো এই সিনসিরা গ্রামটাকেই বালির চাবুক দিয়ে মারা হচ্ছে। ঝড়ের সময় চাবুকের শব্দ শোনা যায়।

বিশাল মরুভূমির গা ছুঁয়ে এখানে ওখানে যে কটা গ্রাম আছে, তারই একটা সিনসিরা। ঝড় থেমে গেলে দেখা যায়, বাড়ির দাওয়ায় বালির পাহাড় জেগে উঠেছে। এই গ্রামের আঁকাবাঁকা কয়েকটা গলিও এখন বালির দখলে। মাটি আর নেই। সব বালি চাপা পড়েছে। ভুট্টা খেত, সবজিবাগান, মোষ ও ছাগল চরানোর জমি—এরকম আরও কত কী ছিল এই গ্রামে। এখন সব বালির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ষা বলে কোনও ঋতু নেই। ঋতু বলতে মাত্র দুটো। শীত আর গ্রীষ্ম। ঝড় অবশ্য কোনও ঋতু মেনে চলে না।

এমন দিন নেই, যেদিন ঝড় ওঠে না। দীর্ঘস্থায়ী নয় ঝড়, এটাই সুখের কথা।

ঝড় যখন থাকে না, তখন গ্রামের লোকেরা বাইরে বেরোয়। তখনও মিহি বালি ওদের গায়ে এসে লাগে। বুঝতে পারে, বাতাস শান্ত হওয়ার নয়। মরুভূমির দিকে চোখ পড়ে যায়। দেখে, ঢেউ-খেলানো বালির পাহাড়ও বাতাসের মতো চঞ্চল। ছোট ঢেউ, বড় ঢেউ। লক্ষ লক্ষ বালির ঢেউয়ে মরুভূমি চঞ্চল।

"লক্ষণ ভাল নয়"। সুখরাম বলল।

"কেন? আর কী ভাল হওয়ার আছে!" সিতানি উৎকণ্ঠিত চোখে ওর দিকে তাকাল। খেজুরপাতার পাটিতে খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সুখরাম। পেশীবহুল চেহারা। গোটা গা ঘামে চ্যাটচ্যাট করছে। গামছা দিয়ে মুছে দিয়েছিল সিতানি। তবু ঘাম শুকোয়নি। সুখরামের গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে ওর সুখী বউ। ওর নামই সিতানি। বয়স বছর তেইশ। রুক্ষ বালিয়াড়ি, বাবলা কাঁটার ঝোপ, মাটির বাড়ির এবড়ো খেবড়ো দেওয়ালের মাঝখানে এই বছর তেইশ বছরের লাবণ্যময়ী মেয়েটিকে মানায় না। ওর স্বাস্থ্য, ওর রূপ—রুক্ষতার পটভূমিতে কাঁটাগাছের ফুলের মতো ফুটে আছে। সিতানির শরীরটাও ঘামে ভিজে উঠেছে। আঁচল দিয়ে ঘাম মোছার সময়ও সে একটা হাতে স্বামীর পা টিপতে লাগল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোদাল নিয়ে বাড়ির উঠোন আর দাওয়ার বালি পরিষ্কার করেছে সুখরাম। রাশি রাশি বালি কোদাল দিয়ে কেটে ঝুড়িতে তুলে বাড়ির

বাইরে ফেলতে হয়েছে। প্রচণ্ড খাটনি। সুখরামের মতো জোয়ান মরদও কাহিল হয়ে গেছে।

"হাওয়া ভাল ঠেকছে না। সারা গ্রামটাকেই বালিতে গিলে খাবে মনে হচ্ছে।" সুখরাম বলল।

"লোকেরা বলছে মরুভূমিটা এগিয়ে আসছে।"

"এত বালি আগে দেখিনি, আগে যখন মোষ চরাতে যেতাম, তখনও চারপাশটা ছিল সবুজ। এখন তো সবুজ রংটা শুধু বাবলা গাছের পাতায় লটকে গেছে।"

"তোমার খুব কষ্ট। কত আর বালি পরিষ্কার করবে।"

"দূর ছাই! কষ্ট হবে কেন? পুরুষমানুষের কি খাটনিকে ভয় পেলে চলে? তবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এত বালি যে ঝুড়ি দিয়ে তুলেও শেষ করতে পারছি না। বালিধুতুরা আমাদের খেয়ে ফেলবে।"

এখানকার লোকেরা মরুভূমিকে বলে বালিধুতুরা। বালির ঝড়কে বলে চরগম।

"তোমার কী দোষ! চরগম তো বন্ধ হবে না।" সিতানি বলল।

"কিছুটা যদি কমত তা হলে এত কষ্ট হত না। এ যে দেখছি বেড়েই যাচ্ছে।"

সুখরাম বলল। ওর মাথার চুলে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে বালি ঝেড়ে ফেলেছে সিতানি। সে ভাবল, চরগম তো সারাদিন থাকে না। কিন্তু এখানকার হাওয়ায় যে সব সময় মিহি বালি উড়ছে, সেটাই বা কম কী!

"এরপর আর খাওয়া জুটবে না। মিহি বালি রান্না করে খেতে হবে।" সুখরাম এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সকাল থেকে কত ঝুড়ি বালি সে ফেলেছে তার হিসেব নেই। দুপুরে খাওয়ার পরে এই যে একটু জিরিয়ে নিল তারপরই আবার বালি ফেলতে যেতে হবে। ভাবতেই খারাপ লাগছে সুখরামের। রাগ হচ্ছে। হাজার হাজার ঝুড়ি বালি ফেলতে তার কষ্ট হবে না। কিন্তু বালিটা সে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কোথায়। বালিধুতুরাকে ফিরিয়ে দেবে? বলবে "তোমার জিনিস তোমাকেই ফেরত দিয়ে গেলাম?" কিন্তু তার তো উপায় নেই। দিনের পর দিন বালির ঝড় আসছে। ফিরে যাচ্ছে, আবার আসছে। হানাদারদের মতো। একটা দিনও বাদ নেই। ওই যে শব্দ ভেসে আসছে দিগন্তের ওপার থেকে। এল, ওই এল, এসে পড়ল বলে। বালির নদীর বান আবার ধেয়ে আসছে সিনসিরা গ্রামের দিকে। "বন্ধ করো. দরজা বন্ধ করো। আর সহ্য হচ্ছে না।" সুখরাম বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো চিৎকার করে উঠল। তার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল চরগমের উথলে-ওঠা শব্দে।

সিতানি দরজা-জানালা বন্ধ করতে না করতেই আছড়ে পড়ল ঝড়। দরজা জানলা থর থর করে কাঁপছে। বাইরের ঘোলাটে রোদ বালি-ঢাকা সূর্যের তাপটুকু নিয়ে মাথা কুটে মরছে বন্ধ কপাটের গায়ে। ঘরের মধ্যেও শুরু হয়ে গেছে আর একটা ঝড়। যে ঝড়টাকে ঘৃণা করে সুখরাম, নিজেই এখন সে ওই ঝড়টার মতোই হয়ে উঠেছে দুরন্ত। খেজুর পাতার পাটির ওপর সিতানিকে সে আছড়ে ফেলে দিয়েছে। সিতানি বুঝতে পারছে তার সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে এই ঝড়ের প্রবলতা। তছনছ হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীর।

সিতানি ও সিনসিবা গ্রামের মধ্যে এখন কোনও তফাত নেই। বালির পাহাড় সরিয়ে সুখরাম ও গ্রামের জোয়ান মরদরা যে মাটির আশ্রয়টুকু ফিরিয়ে আনতে চায়, সেই মাটির মতোই এখন নরম হয়ে গেছে সিতানি। ঘরের ভেতর কোদাল কোপানোর শব্দ। শব্দের মধ্যে ফুটে উঠছে যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা। বাইরে চরগরমও এতটা ব্যাকুল নয়।

মাটির মধ্যে হঠাৎ ধাতুর স্পর্শে চমকে উঠল সুখরাম। তার হাতে এসে ঠেকেছে এক টুকরো লোহা। আসলে একটা চাবি। ঘাগরার ছেঁড়া পাড দিয়ে কোমরে এই চাবিটা ঝুলিয়ে নিয়েছে সিতানি।

"কিসের চাবি?" সুখরাম জিজ্ঞেস করল। ঝড়টা যেমন মরুভূমির দিক থেকে এসে আবার মরুভূমির দিকে ফিরে যায়, ফিরে যাওয়ার সময় যেমন শব্দটা আস্তে আস্তে কমে আসে, ঘরের ভেতরে ঠিক সেই ছবিটাই জেগে উঠেছে। ঘরে একটাও বাক্স নেই, সিন্দুক নেই। বাক্স বা সিন্দুকে রাখার মতো জিনিসই তো নেই। তা হলে কিসের এই চাবি? সুখরাম জানতে চাইছে।

উঠে বসার চেষ্টা করল সিতানি। এক ঝটকায় ওকে আবার খেজুরপাটিতে চিত করে শুইয়ে দিয়ে ওর বুকেব ওপর চেপে বসল সুখরাম। সিতানি ছটফট করে উঠল। দু হাত দিয়ে সুখরামকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। বালির পাহাড় সবাতে সরাতে সুখবামেব গায়ে পাঁচটা পুরুষের শক্তি ভর করেছে। সিতানির দুটো হাত সে মেঝেতে চেপে ধরে আছে, আর একটু একটু করে চাপ দিচ্ছে।

"কেন ওই চাবি নিয়েছ বলো? কে তোমাকে নিতে বলল?" সুখবাম এখন আব জানতে চায় না চাবিটা কিসের। সে বুঝতে পেরেছে চাবিটা তাব ঘরেব নয। সদর দরজায় শিকল তুলে, তালা এঁটে একবার সে সিতানিকে নিয়ে বিজাতুরা শহরে বেড়াতে গেছে। সিনসিরা থেকে বিজাতুরা বেশি দূরে নয। বালিধুতুবার ধার ঘেঁষে মাইল তিনেক পশ্চিমে হাঁটলে ভাণ্ডির মোড। এখানকার লোকেরা বলে চাক্কিব মোড। কারণ, পিচ-ঢালা সড়কে এখানেই চার চাকার গাড়ির দেখা পাওয়া যায়। জয়পুব থেকে দিগ জলমহলেব বাস চাক্কির মোড়ে এসে দাঁড়ায়। ওই বাসে ঘণ্টাখানেক গেলেই বিজাতুবা। জেলার সদর শহর বিজাতুরার গাঁ-গঞ্জের লোকেরা যায় কাজকর্মে। সিতানিকে নিয়ে সুখরাম গেছিল বেড়াতে। ওকে কিনে দিয়েছিল রঙিন ঘাগবা, নকল রুপোর হাঁসুলি ও কাচের চুড়ি। ফেরার আগে বাইসস্কোপ দেখে ফিরেছিল। ফিরতে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে বাত। ছোট্ট তালা খুলে ঘরে ঢুকেছিল।

ছোট্ট তালার ছোট্ট চাবি। কিন্তু এখন সিতানিব কোমরে ঝুলছে বড় একটা চাবি। সুখরাম আবছা অন্ধকারে চাবিটা নাড়াচাড়া করেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। সে ধমকে উঠল, "আমাকে বলোনি কেন? আজই ফেরত দিয়ে আসবে।"

সিতানি কোনও উত্তর দিল না। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই সে সুখরামকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিয়ে ওব বুকের ওপর চেপে বসল একটু আগে সুখরামও ঠিক এভাবে সিতানির বুকের ওপর বসে ছিল। সুখরামের শক্তি বলতে দুটো হাত। সেটাও

দুমড়ে মুচড়ে বোধহয় ভেঙে ফেলবে ওর স্ত্রী। বাইরের ঝড়ের হাহাকারের চেয়েও বুকে এসে বিঁধছে ঘরের ভেতরে সুখরামের আর্তনাদ। সিতানির মন তাতে নরম হল না।

"চাবি কেন ফেরত দিতে বলছ?"

"কেন বলছি বুঝতে পারছ না?"

'না।"

"ইচ্ছে করে ঝামেলা পাকাতে চাও?"

"কিসের ঝামেলা? কেউ—আমাকে চাবিটা রাখতে দেয়নি। আমি নিজেই রেখেছি।"

সুখরাম সব শক্তি দিয়ে সিতানিকে বুকের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করল। পারল না। হাঁপাতে লাগল।

"তুমি জমিদার, না মহাজন? কক্ষনো এরকম করবে না। চাবিটা কাছে রেখেছি বলে আমার ওপর জোর খাটাতে এসেছ? ভাবছ আমি তোমার চাকরানি।" সিতানি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে দাঁড়াল। ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবল, হুড়কো খুলে ঘরের বাইরে চলে যাবে। খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নেবে। কিন্তু যাবে কোথায়? ঝড়ের হাহাকার বন্ধ দরজা-জানলার ফুটোফাটা দিয়ে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ছে। হাহাকারটা বেড়েছে। অসহ্য লাগছে সিতানির। ঘরের ভেতর শক্ত সমর্থ একটা পুরুষের হাহাকার। বাইরে মাথা কুটে মরছে বালির সমুদ্র। কী চায় ওরা? অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এলাকা বাড়াতে বাড়াতে বালির সমুদ্র একেবারে বাড়ির উঠোনটুকুও গ্রাস করে নিয়েছে। সিতানির শরীরটা পুরোপুরি গ্রাস করেও সুখী নয় সুখরাম। সিতানি কখন কী করবে, না করবে---এসব বিষয়েও সে হুকুম দিতে চায়। তার মনের অলিগলিতেও চায় ভোগস্বত্ব কায়েম করতে। সিতানি যেন কাঠপুতলি। আড়াল থেকে সুখরাম সুতো জড়াবে, আর সেই সুতোর টানে বাঁধাধরা একটা জায়গার মধ্যে সে নড়াচড়া করবে। এটা সে মানবে না। কোমরে শক্ত করে চাবিটা গুঁজল সিতানি, মনটাকে করল আরও শক্ত। লোহার চেয়েও কঠিন।

দুই

ঝড় থামল অনেক পরে। ততক্ষণ মেঝেতে ছটফট করল সুখরাম। ঘরের কোণে মাথা গুঁজে বসে থাকল সিতানি। সুখরামের দিকে তাকানোর ইচ্ছে পর্যন্ত তার হচ্ছে না। সুখরাম অবশ্য বেশ কয়েকবারই তার দিকে তাকাল। তবে এমনভাবে তাকাল, যাতে সিতানির চোখে ধরা না পড়ে যায়।

ঝড় থামার প্রথম লক্ষণ, বাইরে থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। অর্থাৎ ঝড় থেমে যাওয়ার পর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে প্রথমে বেরলো

সিতানি। ঝড় থেমে গেলেও আলো এখনও স্বাভাবিক হয়নি। হয়তো আজ আর সে তার স্বাভাবিক রঙ ফিরে পাবে না। তার আগেই সন্ধে এসে পড়বে। সুখময় মেঝেতে পড়ে থাকতে থাকতে দেখল, বিকেলের ঘোলাটে আলো খোলা দরজা দিয়ে তেরছাভাবে তার ঘরে এসে পড়েছে। সে এবার আস্তে আস্তে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে ও বুকে বেশ ব্যথা হচ্ছে। সিতানি যেভাবে হাতদুটো দুমড়ে দিয়েছে, তাতে যে হাড়গোড় ভাঙেনি সেটাই যথেষ্ট। পুরুষ্টু মাংসল দাবনা দিয়ে যেভাবে বুকের খাঁচাটা দু'দিক থেকে চেপে ধরেছিল তাতে পাঁজরার বেশ কয়েকটা হাড়ও ভেঙে যেতে পারত। কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল সুখরাম। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার ছাপ। যন্ত্রণার, না ভয়ের? যারই হোক, এ যেন সিতানির চোখে না পড়ে। পুরুষের ভয় কারও চোখে পড়তে নেই!

এদিক ওদিক তাকিয়েও অবশ্য সিতানিকে দেখতে পেল না সুখরাম। বরং সে দেখল, গ্রামের মেয়েরা ঝুড়ি ও কোদাল নিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। বালি সরাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টার ঝড়ে যত বালি এসে জমেছে, তার একটি কণাও তারা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেবে না। কোদাল দিয়ে বালি তুলে ওরা ঝুড়িতে ভরে নিচ্ছে। বালি-ভর্তি ঝুড়ি এ ওর মাথায় তুলে দিচ্ছে। ঝুড়ির বালি হাসতে হাসতে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসছে। সিনসিরায় এটাই নিয়ম। পুরুষরা যে যখন পারে বালি সরায়। তবে ওই কাজের বেশিটাই করে মেয়েরা। যে মেয়ে রান্না করে সে চুলও বাঁধে। সিনসিরার মেয়েরা রান্নাও করে, বালিও সরায়। সকাল, দুপুর, বিকেল—একটুকুও বিরতি নেই। মেয়েদের দলে সিতানিও থাকে। থাকতে হয়। সুখরাম এবার দেখল, নানা বয়সের জনা তিরিশ মেয়েদের মধ্যে এখন সিতানিও আছে। সুখরামের কোদাল, সুখরামের ঝুড়ি এখন সিতানির জিম্মায়। বালির পাহাড় সরাতে সরাতে মেয়েদের চকচকে পিছল শরীর উঠছে নামছে, ঝুঁকে পড়ছে আবার সোজা হয়ে উঠছে—সুখরাম দেখতে থাকল। নরম শরীরের আর-একটা ঢেউ ওর চোখের সামনে উথাল পাথাল করছে। ঢেউয়ের একটা শরীর ছন্দ। আগ্রাসী, অতৃপ্ত বালির ঝড়ের মতোই গুজরে উঠল সুখরাম। সহ্য হয় না, সত্যিই সহ্য করা যায় না। ওর ইচ্ছে করছে, মাটির ঘরের যে জায়গাটায় ওদের মানায় ঠিক সেই জায়গাটাতেই ওদের এখন শক্ত হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে। ওর আরও ইচ্ছে করছে, এখনই গলা ফাটিয়ে বলে উঠবে, বালির সঙ্গে এই লড়াইয়ে তোমরা এসো না। তোমাদের শীররের জল ও উষ্ণতাও বালির মতো শুকিয়ে শন্ শন্ করে উঠবে। এই কাজে তোমাদের নামানো ঠিক হয়নি।

গ্রামের পুরুষরা কিন্তু বলে কয়ে এই কাজে সিতানিদের নামায়নি। ওরা নিজেরাই এসেছে। বালিধুতুরা যেদিন থেকে সিনসিরার দিকে নজর দিয়েছে সেদিন থেকেই ওরা এই কাজে নেমে পড়েছে। পুরুষের কোদালের বাঁট শক্ত মুঠোয় ধরে বালি সরিয়েছে। বালির সঙ্গে ঘাম হয়ে মিশেছে ওদের শরীরের সজলতা। ভিজে জবজবে শরীরও বালির চাবুকের সামনে টান-টান হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে। কারণ, ঝড়ের শেষে বালির পাহাড় সরাতে না সরাতেই ওরা আবার একটা ঝড়ের কবলে গিয়ে পড়েছে। সিনসিরায় না হয় বালিধুতুরার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। কিন্তু যেখানে বালিধুতুরা নেই, সেখানেও ঝড়ের চিহ্ন হিসেবে

কালসিটে পড়ে যায় ওদের শরীরে। দশ বিশ মাইল দূরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর ছেলেছোকরা ডাক্তারবাবুরাও আজকাল কালসিটে পড়া এ ধরনের শরীর দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। শরীরগুলো তাঁরা পোড়ামাটির শরীর বলে মনে করেন।

কিন্তু সিনসিরার এ গল্প তো শরীর নিয়ে নয়। মাটির গভীরে যে জল থাকে, এ গল্প সেই জল ও জলীয় উত্তাপের। আসলে, এ গল্প সিনসিরা গ্রামেরই নয়। আজ না হয় বালিধুতুরার লোভের কাছে স্বাস্থ্য বিলিয়ে দিতে হচ্ছে সিনসিরার মেয়েদের। কিন্তু বালিধুতুরা তো এর পরেই আরও পাঁচটা গ্রামের দিকে জিভ বাড়িয়ে দেবে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবে চাষের খেতি, মোষ ছাগল চরানোর মাঠ, যার ঘাস শীত ও গ্রীষ্মের মতো দুটো প্রবল ঋতুর প্রহারেও কাবু হয় না। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে চারণ কবিরা আজকাল শুধু বীরত্বের গানই করেন না, তৃষিতকে জল, ক্ষুধার্তকে রুটি দেওয়ার প্রার্থনাও ঝরে পড়ে তাঁদের গানে গানে। চারণ কবিদের গান শুনতে আসে গ্রামের মেয়েরা। কবিরা উপহার পান জল ও রুটি। তরুণ এক চারণকবি আরও উপহার পেয়েছিলেন, গ্রামের একটি মেয়ের সপ্রেম দৃষ্টি। তিনি তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বড় বিষণ্ণ সেই মেয়েটির চাহুনি, দু' চোখের কাজল তার সেই চাহনিকে আরও সুদূর করে তুলেছিল। কবি তার খোঁজে বারবার সেই গ্রামে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার আর দেখা পাননি। তবে তিনি আশা ছেড়ে দেননি। তাঁর সব ব্যাকুলতা গান হয়ে ঝরে পড়েছিল। বালির ঝড়ে সিনসিরায় এসেও তিনি বারবার গান শুনিয়ে গেছেন। মেয়েদের বলেছেন, পৃথিবীর জল, পৃথিবীর রস যতই শুকিয়ে আসুক, তোমাদেরই তা রক্ষা করেত হবে। তোমরা হবে জলের জামিনদার। সেই চারণকবি জানতেন, যে মেয়েটি একদিন তাঁকে উপহার দিয়েছিল সপ্রেম দৃষ্টি, সারাটি জীবন বিষণ্ণ করে তোলার মতো একটি মুহূর্ত, তার কাছে তাঁর গান ঠিক পৌঁছে যাবে।

আমাদের সিতানি সেই চারণ কবিকে কখনও চোখে দেখেনি। কিন্তু কবি যাকে বলেছেন জলেব জামিনদার, সে তো ঠিক তা-ই। কোমরে সে যে চাবি ঝুলিয়ে রেখেছে সে তো তালাবন্ধ একটা কুয়োর! সিনসিরা গ্রামে জল নেই। জল নেই এই অঞ্চলের অনেক গ্রামেই। মেয়েরা দু' পাঁচটা কলসি নিয়ে ভোরবেলা জল আনতে যায় দূরের এক ঝরনায়। উপায় তো নেই। শহর থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে মাটির নীচে পাথর ফাটিয়েও জল নিঙড়ে আনতে পারেননি এখানে। এমন অবস্থাও নয় যে, শহর থেকে ট্রাকে করে কয়েক ট্যাঙ্ক জল রোজ এখানে পৌঁছে দেওয়া যাবে। চাক্কির মোড় পর্যন্ত এসেই তো সেই ট্রাক থেমে যাবে। তারপর মাইল তিনেক পথ পেরিয়ে গ্রামে-গ্রামে উট বা মোষের পিঠে চামড়ার ভিস্তিতে করে জল পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। কয়েক আঁজলা জলই মাত্র পাঠানো যায়। কিন্তু কয়েক হাজার তৃষ্ণার্তের কাছে সেই জল কিছুই নয়। এখানকার গ্রামের লোক বলে, সব মিটতে পারে। ঝগড়া-বিবাদ, ধার দেনা—সব। সব মিটতে পারে! মেটে না শুধু তেষ্টা। কথাটা মিথ্যে নয়।

তাই গ্রামে একটা কুয়ো খুঁড়ে রাখা হয়েছে। কলসি কলসি জল সেখানে জমিয়ে রাখা হয়। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির মেয়েরো পালা করে ঝরনায় জল আনতে যায়! সেই জল

যে যার বাড়িতে বয়ে নিয়ে যায় না। কুয়োতে ঢেলে দেয়। তারপর যে যার প্রয়োজন মতো নিয়ে যায়। খরচ করে। সিনসিরা গ্রাম আর তার এই পাতকুয়ো—দুটোর বয়সই এক। অর্থাৎ, গ্রামসৃষ্টির সময় থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে. রক্ত জল করে বয়ে আনা জল নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদের সূচনাও সেই থেকে। মেয়েরা পালা করে জল আনত, আর ছেলেরা পালা করে দিত পাহারা। কিন্তু কড়া নজর রাখা সত্ত্বেও জল চুরি হয়ে যেত। এ নিয়ে বেশ বাড়াবাড়িও হয়েছিল একবার। শোকের ছায়া নেমে এসেছিল সারা গ্রামে।

সেই দিনটির কথা সুখরামের এখনও মনে আছে। তখন ওর বয়স বছর আট। মাথা পিছু তিন কলসি জল তখন ওদের পাওনা ছিল। মা, বাবা ও সুখরামরা তিন ভাই ও এক বোন মিলে পরিবারে ওরা ছিল মোট ছ'জন। প্রত্যেককে আধ কলসি করে জল দেওয়া হত। তাতেই স্নান, রান্না ও খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়ার কথা। এত অল্প জল যে, খরচ করতেও গায়ে লাগত. সপ্তাহে মাত্র একদিনই স্নান করার সুযোগ পেত সুখরাম। তাও ভাল করে নয়। পুরো শরীর ভিজত না। মাথায় জল ঢাললে সেই জলই গায়ে গড়িয়ে পড়ত। পিঠ ভিজলে পেট ভিজত না, পেট ভিজলে পিঠ ভিজত না। শুধু সুখবামেরই এই অবস্থা নয়, ওদের বাড়ির সবাই সপ্তাহে মাত্র একদিন করে স্নান করত। এবং প্রত্যেকের স্নান করার পদ্ধতিটাও ছিল ঠিক একই রকম। বলতে কী, পুরো সিনসিরা গ্রামেই স্নানের মধ্যে মিতব্যয়ের অদ্ভুত এক চেহারা ফুটে উঠেছিল। সমস্ত গ্রামের মানুষ ঠিক একভাবে স্নান করছে—এই দৃশ্য সিনসিরা গ্রামে না গেলে কল্পনাও কবা যায় না। এটা যে সাম্যেব ছবি নয়, বরং নিদারুণ অভাবের ছবি এটা বুঝতে কারও কষ্ট হওয়াব কথা নয়।

তা, সেই আট বছরের ছেলে সুখরাম দেখেছিল, জল নিয়ে একবার কী ঘটনাটাই না ঘটেছিল! দুপুরে সেবার কুয়ো পাহারা দিচ্ছিল মহাবীর প্রসাদ। গ্রামেব যুবকদের মধ্যে সব কাজেই তাকে পুরোভাগে দেখা যেত। মহাবীরই একবার প্রস্তাব দিয়েছিল, একা মেয়েরা কেন কষ্ট করবে, পুরুষদেরও জল আনতে যাওয়া উচিত। গ্রামেব মেয়েরাই তাতে রাজি হয়নি। ওদেরই একজন জুড়ানিয়া। মহাবীরকে সে বলেছিল, "তোমরা কলসি নিয়ে জল আনতে যাচ্ছ এটা দেখার আগে যেন আমাদের মৃত্যু হয়। যার যে কাজ মানায়—"

কিন্তু এই জুড়ানিয়াকে নিয়েই লাগল গন্ডগোল। কে যেন অভিযোগ করল, মহাবীর দুপুরবেলা যখন কুয়ো পাহারা দেয়, তখন জুড়ানিয়া গিয়ে ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কয়েক কলসি জল নিয়ে আসে। এমন কথাও রটে গেল যে, দুপুরবেলা ওদের দুজনকে বেশ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা গেছে। দুপুরবেলা মহাবীর নাকি বালিয়াড়ির আড়ালে জুড়ানিয়াকে নিয়ে চলে যায়। সেই ফাঁকে জুড়ানিয়ার বোন কুয়ো থেকে কলসি কলসি জল নিয়ে পালিয়ে যায়।

গ্রামের বয়স্করা বিচারে বসলেন। মহাবীরকে ডাকা হল। সেই বিচার সভায় শিশুদের প্রবেশ নিষেধ। সুখরাম তা জানত না। হঠাৎ গিয়ে পড়ায় খুব ধমক খেল। তাতে অবশ্য তার কষ্ট হয়নি। কষ্ট হয়েছিল তেজী যুবক মহাবীরকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সভা কিন্তু বেশিক্ষণ চলেনি। পাকুড়তলায় বিচারসভা বসেছিল। চরগম

এসে পড়ায় সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। বালির চাবুকের হাত থেকে গা বাঁচাতে বিচারকরা নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড় দিলেন।

সে এক কাণ্ড! যতবার পাকুড়তলায় বিচারসভা বসে, ততবারই এসে পড়ে চরগম। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, মহাবীর দোষ কবুল করুক। মহাবীর তা করলও। ওকে কি শাস্তি দেওয়া হবে? না, প্রথম অপরাধ বলে হুঁশিয়ার করে এবারের মতো ছেড়ে দেওয়া হবে? মহাবীর সেদিনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ মহাবীরের বাবা রামনরেশ চিৎকার করে উঠলেন, "এমন ছেলের আমি মুখ দেখতে চাই না। ও যদি মরেও যায় তাও আমার কোনও দুঃখ হবে না।"

মহাবীর বলল, "মরতে আমারও দুঃখ নেই। আমি বিষ খাব। কিন্তু একটি শর্ত। জুড়ানিয়াকে সারাজীবন স্নানের জল দিতে হবে। ওরা যা জল পায়, তাতে বেচারী স্নানও করতে পারে না।"

গুঞ্জন উঠল চারপাশে। কী এতবড় কথা? জুড়ানিয়াকে সারাজীবন জল দিয়ে যেতে হবে গাঁয়ের লোকদের? গাঁওদেবতিও স্নানের জল পায় না এখানে। আর জুড়ানিয়া?

মহাবীর জানতে চাইল, "কী, আপনারা রাজি?"

এতক্ষণ নিচু গলায় সবাই আলোচনা করছিল। মহাবীরের কথায় এবার সবাই কুলুপ এঁটে বসে রইল।

"আপনারা রাজি নন তা হলে?"

"গাঁওদেবতিকেও আমরা জল দিই না। গাঁওদেবতির পূজারিরাও আধ কলসির বেশি জল পান না। এটাই আমাদের নিয়ম।" বলল গজেন্দ্র। এ গ্রামে তারই বেশি মোষ আছে। সুতরাং যা খুশি বলার অধিকারও তার বেশি।

"এই নিয়মটাকেই আমি মানি না।"

"না মানলে তোমার এই গাঁয়ে থাকার কোনও অধিকার নেই।" গজেন্দ্র গর্জে উঠল।

"চেঁচাবেন না। আমি এখানে থাকতেও চাই না। চল জুড়ানিয়া, আমরা বিজাতুরা যাব। এখানে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করব না।" বয়স্করা দেখলেন, জুড়ানিয়া তাদের অগোচরে ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বয়স্কের দল এবার লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলেন মহাবীরের দিকে। ওঁরা আশা করেছিলেন মহাবীর বিষ খাবে। মুখে হা-হুতাশ করলেও সেই দৃশ্যটা ওঁরা উপভোগ করবেন। বিষ খেয়ে একজন শাস্তি ভোগ করছে, ছটফট করে মারা যাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়। সেই সৌভাগ্য থেকে মহাবীর ওঁদের বঞ্চিত করায় ওঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

মহাবীর তখন জুড়ানিয়াকে নিয়ে কুয়োতলায় দৌড়ে গিয়ে পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক খুলে দেখাল। "খাব বলে, এই বিষটা এনেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি বিষটা আপনাদেরই খাইয়ে যাওয়া উচিত।"

মোড়ক খুলে গুঁড়ো কিছুটা পদার্থ সে কুয়োয় ঢেলে দিল। সিনসিরা গ্রামের লোকদের এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি, পরেও হবে কি না সন্দেহ। সারা গাঁয়ে নেমে এল শোকের ছায়া। সবাই বলাবলি করতে লাগল, "দেখলে, মহাবীরের কাণ্ডটা দেখলে, কুয়োর জলে বিষ মিশিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল!" সবাই রামনরেশকে নিয়ে পড়ল। ওরই তো ছেলে, সুতরাং সব দোষ ওর! এরকম একটা কথা চালু হয়ে গেল সারা গ্রামে। জুড়ানিয়া ও মহাবীরকে যারা বালিয়াড়ির আড়ালে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছিল তারাই দেখল সেই বালিয়াড়ি ছাড়িয়ে বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল বেপরোয়া যুবক-যুবতী। পরের দিন ভোরবেলাতেও রামনরেশকেও আর দেখা গেল না। সে গাঁ-ছাড়া হল সপরিবারে।

কুয়োর জল ছেঁচে ফেলতে বেশ সময় লেগেছিল। সে ক'দিন গায়ের লোকদের আর কোনও কাজ ছিল না। সিনসিরা গ্রামের তপ্ত মাটি সেই প্রথম পেয়েছিল কুয়োর জলের স্বাদ। তাও আবার বিষমাখানো জল। মেয়েরা তারপর কলসি কলসি জল এনে ঢেলেছিল কুয়োয়। সারারাত তারা জল এনেছিল। পুরুষরা একজনও মাথায় কলসি বয়ে আনেনি। তারা রাতের বেলা মেয়েদের সঙ্গে যেত পাহারা দিতে। ভিন গাঁয়ের লোকেরা যাতে মেয়েদের দখল করে নিয়ে না যায়। তার জন্য সেই রাত্রে সশস্ত্র যুবকদের দেখা গিয়েছিল মেয়েদের পাশে। মাত্র সেই একটা রাত। তারপর থেকে মেয়েরা আবার একা। ভরা কলসি, ভরা স্বাস্থ্য পাহারা দিতে আর কোনও যুবককে দেখা যায়নি। তবে, যুবকরাই তৎপর হয়ে পাতকুয়োর মুখে ঢাকনা দিয়ে তালাচাবির ব্যবস্থা করেছিল।

চাবিটা কার কাছে থাকবে, এ নিয়েও কম সমস্যা হয়নি। সমস্যার সমাধানে বয়স্করাই আবার এগিয়ে এলেন। সমস্বরে বললেন, "মেয়েদের কাছে রেখে দাও। রান্না, বান্না, বাসন ধোওয়া, ঘর নিকনো—এ সব কাজ মেয়েরাই করে। জলের সঙ্গে ওদের আজন্ম সম্পর্ক। চাবিটা ওদের কাছেই থাক। ওরাই সামলাবে।" সেই থেকে চাবিটা মেয়েদের কাছেই থেকে গেল।

তবে, প্রতি মাসে একবার করে হাত বদল হয়। মেয়েরা যেমন পালা করে জল আনে, সে রকম পালা করে চাবিটাও ওরা নিজেদের কাছে রাখে। এ মাসে রাখার দায়িত্ব সিতানির। আর এই ব্যাপারটাই মেনে নিতে পারছে না সুখরাম। কেন সিতানি চাবি রাখবে? চাবি রাখা নিয়ে যদি কেউ এসে ওর ওপর হামলা করে?

"কেন করবে?"

"করবে না'ই বা কেন? ধরো, ঘরে তুমি একা আছ। ভরদুপুরে হঠাৎ একজন এসে তোমার কাছে চাবি চেয়ে বসল? তখন? দেবে না তাকে চাবি?

"লোক বুঝে দেব।"

"হ্যাঁ, সেখানেই তো আমার ভয়।"

"ভয়ের কী আছে?"

"চেয়েও যে তোমার কাছে চাবি পাবে না, সে কি ছেড়ে কথা বলবে? তেষ্টা পেলে মানুষ যে কী মরিয়া হয়ে ওঠে তুমি জানো না, সর্বস্ব কেড়ে নেবে। তেষ্টা মেটাবে।"

"এ তোমার কষ্ট কল্পনা। আমাকে দুর্বল ভেবেছ? কী করে নিজেকে রক্ষা করতে হয় আমি কি জানি না? আমার শক্তি কি কম? মেয়েদের শক্তি কি কম?"

"সব মেয়ে এই একটা কথাই বলে। কিন্তু আসলে তোমরা খুব দুর্বল। সহজেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারো।"

"কে বলল? ক'টা মেয়েকে তুমি দেখেছ? ক'টা মেয়ের সঙ্গে মিশেছ?"

"ধরো, কেউ যদি ছল করে তোমার কাছে চাবি চায়? তার জন্য যদি তোমার মায়া হয়? তার ছলনায় ভুলে যদি সব দিয়ে দাও।"

"সব বলতে তো ওই একটা চাবি। তা, ভুল তো হতেও পারে। সেটাকে গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।"

"আমি তো ওটাকে শুধু পাতকুয়োর চাবি বলেই ভাবছি না। আমি যে ভাবছি, ওই চাবি দিয়ে তোমার মনের দরজাটাও খুলে ফেলা যায়।"

"এ তোমার মনের বিকৃতি। মনের অসুখ। যে দরজা শুধু তোমাকে খোলার অধিকার দিয়েছি তা আর কে এসে খুলবে?"

"কেউ যদি এসে তোমাকে রাজি করায়? দয়া নয়, করুণা নয়, সে যদি সত্যিই তোমাকে ভালবাসে। ধরো, ভালবাসার মতো কোনও মানুষ যদি তোমার কাছে এসে দাঁড়ায়? চাবি চায়? তখন যদি আমি তোমার কাছে না থাকি।"

"তা হলে কী হবে বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয় না, তেমন কেউ আসবে। তা ছাড়া, চাবিটা তো মাত্র এক মাস আমার কাছে থাকবে। মাত্র তিরিশটা দিন। তার মধ্যে কয়েকটা দিন তো কেটেই গেছে।"

বালিধুতুরার প্রান্তে সিনসিরা গ্রামের এক দম্পতির এই কথোপকথনের মাঝখানে আবার শুরু হয়ে গেল বালির ঝড়। যত দিন যাচ্ছে, ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে বালিধুতুরা। ঝড়ের শব্দে চাপা পড়ে গেল সুখরামের কণ্ঠস্বর। সে ক্ষীণ গলায় প্রশ্ন করল, "চাবিটা এরপর কার কাছে যাবে?"

"সব ঠিক হয়ে গেছে। এরপর পাবে পাঞ্চালী, তারপর জুপা, জুপার পর নিমা।"

"ওরা যদি কেউ চাবিটা না নিতে চায়?"

"নিতে হবেই। গ্রামের মেয়েরা সবাই মিলে এটা ঠিক করেছে।"

"তার মানে, তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ।"

"এটা ফরমান। যাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হবে, তারা তা মানতে বাধ্য। জল যখন ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হয়, তখন দায়িত্বটাও সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে।"

আর কথা বাড়ায়নি সুখরাম। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার ভাবল, হুড়কো খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাবে। ঝড়ের মধ্যে বালিধুতুরার কাছে গিয়ে বলবে, "তুমি কি চাও? জল নিয়ে খুনোখুনি হোক? মেয়েদের কাছে চাবি চাইতে এসে কেউ যদি ওদের লুটপাট করে নিয়ে যায়? সিনসিরা গ্রামের ছেলে, বুড়ো সবাইকে আমি চিনি। কিন্তু কার মনে কী আছে জানব কী করে। মহাবীর যে জুড়ানিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাবে তা কে

জানত? একজন জলজামিনদার, আর একজন জলভিখারি! কেউ ভেবেছিল এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে?"

বালিধুতুরার কাছে কিন্তু যেতে পারল না সুখরাম। ঝড়ের শব্দ তখন আরও বেড়ে গেছে। মারাত্মক সেই খেলা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে রাস্তাটা চাপা পড়ল, তারপর বাড়ির উঠোন। দেখতে দেখতে বাড়ির দাওয়া। এখন মনে হচ্ছে সব বাড়িঘরই চাপা পড়ে যাবে বালির নীচে। কোন মেয়ে তার শরীরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল সমবায় কুয়োর চাবি এই প্রশ্নটাই এখন অবান্তর মনে হচ্ছে। একমাত্র সত্য এই বালির ঝড়, পুরো অঞ্চলটাকেই গ্রাস না করলে পর খিদে মিটবে না।

এবং এই খিদেরই মারাত্মক একটা চেহারা ক্রমেই সুখরামের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তার গলার স্বর বদলে গেছে, দু চোখ হয়ে উঠেছে লাল। সমস্ত শরীরটাই তার আনচান করছে। সে ডাকল, "সিতানি ও সিতানি।" ঝড় এলে রোজই তো এরকম বদলে যায়। রোজই সিতানিকে ডাকে। কিংবা তখন ওর সমস্ত চেহারাটা এমন ভিখারির মতো হয়ে ওঠে যে, সিতানির আর কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় না। সিতানির মায়া হয়। সিতানির বুকে মুখ গুঁজে দেয় সুখরাম। ওদের কোনও সন্তান থাকলে সেও ঠিক এরকম তার মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিত।

কিন্তু সিতানিকে আজ কেমন যেন উদাসীন মনে হচ্ছে। ঘরের খাপরার চালের দিকে নিশ্চল চোখে সে তাকিয়ে আছে। সুখরামের অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করছে। শরীরে কোনও অনুভূতিই কাজ করছে না। তারপর এক সময় সুখরামকে জিজ্ঞেস করল, "ঝড় কখন থামবে?"

"তা কে বলতে পারে? কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"ঝড়ের শব্দ কমে এল।"

"হ্যাঁ। আর একটু পরেই থেমে যাবে।"

"ও আসবে। আমাকে বলেছে ঝড় থামলেই আসবে।"

"কে?"

"যাকে তোমরা গাঁ-ছাড়া করেছ।"

"মহাবীর?"

"হ্যাঁ, মহাবীর। তুমি বলেছ, কুয়োয় সে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তো আর নিজের চোখে দেখিনি। তখন আমার জন্মই হয়নি।"

"আমি তখন একেবারেই বাচ্চা। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিনি।"

"সব মিথ্যে কথা।"

"কোনটা?"

"এই যে বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। সব রটনা।"

"তুমি কী করে জানলে?"

"মহাবীর বলেছে। আসলে ওটা চুন। গাঁয়ের লোকদের সে ঘাবড়ে দিতে

চেয়েছিল। মহাবীরের মতো মানুষ জলে কখনও বিষ মেশাতে পারে না।"

"ওর সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?"

"রোজ দেখা হয়।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছ। গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মহাবীরকে আমরা কেউ চোখে দেখিনি। গাঁয়ের লোকেরা ওকে ঘেন্না করে। ওর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না।"

"ওকে তাড়িয়ে দিয়েছ বলেই বালিধুতুরা প্রতিশোধ নিচ্ছে।"

"গাঁয়ের লোকদের কী দোষ? জুড়ানিয়াকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই না সে করেছে।"

"বললাম তো সব রটনা। ওদের আবার ফিরিয়ে আনো।"

"খবরদার। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ও কথা মুখেও আনবে না।" সুখরাম গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল।

"বলেছি না, তোমরা আমাদের চাকবানি পাওনি। আমরা যে তোমাদের জন্য এত করি তার কারণটা কী জানো?"

"জানার দরকার নেই। আমার কথা যদি শুনতে না চাও, তাহলে এই বাড়িতে থেকো না। যেখানে খুশি চলে যাও। আমি বাধা দেব না।"

"তুমি বাধা দেওয়ার কে?"

"তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এরকম করো না।"

"তোমাকেও বলছি, তোমরা অন্যায় করেছ, এখন সব শুধরে নাও।"

"মহাবীরের সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হয়েছে বলছ না কেন?"

"দেখা হয়নি। দেখা হবে। কাল সকালেই আমরা ওদের গাঁয়ে ফিরিয়ে আনতে যাব। আমরা সবাই এটা ঠিক করেছি। আমরা দল বেঁধে ওদের কাছে যাবে। ক্ষমা চাইব।"

"জানো, ওরা কোথায় থাকে?"

"তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাওনি। তুমি কালা, তাই শুনতে পাওনি। চাক্কির মোড়ে পান-বিড়ির এক দোকানি সেদিন তোমাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। একটি মেয়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ডেকো না, ওকে ডেকো না। তখনও বাস আসেনি। জল খাওয়ার নাম করে আমি তোমার কাছ থেকে চলে গেলাম সেই মেয়েটির কাছে। সে আমাকে জল খাওয়াল। বলল, যখন তেষ্টা পাবে জুড়ানিয়ার কাছে এসো। জুড়ানিয়া সেদিন অনেক কথাই বলেছে। সে সব নাই বা শুনলে!"

ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ। মাথার ওপর তারা ভরা রাত। সুখরাম সে দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে মিশে থাকা বালিধুতুরার দিকে হাঁটতে শুরু করল। গ্রামের মেয়েরা কাল চাক্কির মোড়ে যাবে, মহাবীর ও জুড়ানিয়াকে ফিরিয়ে আনবে। মেয়েরা চাক্কির মোড়ে পৌঁছনোর আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে চায় সুখরাম। মহাবীর ও জুড়ানিয়াকে সুখবরটা দিতে চায়।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরই পেছন থেকে ডাক শুনতে পেল সুখরাম। সিতানি ডাকছে, "আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলবে। যেও না। দোহাই, বালিধুতুরায় একা যেতে নেই।"

সুখরাম কোনও কথাই শুনছে না। বালিতে তার গোড়ালি ডুবে গেছে। একটু আগের ঝড়ে শিথিল বালির আস্তরণ পড়েছে। এখনও জমাট বাধেনি। এবার সিতানি গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল।

"শোনো এরকম করতে নেই। তোমাকে যেতে হবে না। আমরা গিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনব। যাওয়ার আগে তোমাকে চাবিটা দিয়ে যাব। এবার থেকে চাবিটা তোমার কাছেই থাকবে। তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।"

বালিধুতুরাকে পেছনে রেখে শান্ত আকাশের নীচে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল জল ও নারীর জামিনদার সুখরাম।

পুকুরপাড়ে

"যদি কল্পনা করিস সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুধু পাখির রাজত্ব, তা হলে দেখবি তোর চোখে শুধু পাখির ছবিই ফুটে উঠছে। যেদিকে তাকাবি শুধু পাখি, আর পাখি।" কথাটা বলেছিলেন অপূর্বদা।

স্কুলে আমার চেয়ে উনি দু' ক্লাস ওপরে পড়তেন। পড়াশোনাতেও খুব একটা খারাপ ছিলেন না। অন্তত আমার মতো অতিসাধারণ ছেলের চেয়ে অনেক ভাল। বয়সে বড়, লেখাপড়ায় ভাল—সুতরাং সবদিক থেকেই উনি আমার দাদা। অপূর্বদা।

তা, এই অপূর্বদা মাঝেমধ্যেই আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাতেন। আমাদের স্কুলের পেছনেই একটা পুকুর ছিল। যাকে বলে এঁদো পুকুর, ঠিক তা-ই। টিফিনের সময় সেই পুকুরপাড়ে এসে রোজ বসে থাকতাম। পুকুরপাড়ে গাবগাছের ছায়ায়। মাঝেমধ্যে অপূর্বদাও এসে আমার কাছে বসতেন। যেদিন আসতেন সেদিনই বুঝতাম, নতুন কিছু একটা গল্প ওঁর সংগ্রহে এসেছে। আর সেটা আমাকে না শুনিয়ে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না।

সেদিন উনি কিন্তু গল্প-টল্পের ধার দিয়েও গেলেন না। মানুষের কল্পনা দিয়েই শুরু করলেন। কল্পনা কতদূর যেতে পারে, এটাই ছিল ওঁর বলার বিষয়!

"কল্পনার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই রে।" উনি বললেন।

"কেন?" আমি বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম।

"কেন আবার? ধর, তুই কল্পনা করছিস আমরা এখন এই এঁদো পুকুরের পাড়ে বসে নেই। আমরা বসে আছি একেবারে সমুদ্রের ধারে। গোয়া কিংবা পুরীর সমুদ্র তীরে। আর যদি কল্পনাটাকে আর একটু ছড়িয়ে দিস তা হলে গোয়া কিংবা পুরীর সমুদ্রতীরটাই হয়ে যাবে ডোভার বিচ। তুই কী কল্পনা করছিস, সেটাই বড় কথা। তোর কল্পানায় আমাদের এই এঁদো পুকুরের ধারের ঝোপঝাড়সমেত জমিটাই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হয়ে যেতে পারে। ফুরফুরে বাতাস, নীল সমুদ্র কয়েকটা ইয়ট কিংবা স্পিডবোট...আর.. "

আমি কিন্তু চেষ্টা করেও অপূর্বদার মতো কিছু কল্পনা করতে পারলাম না। লেখাপড়ায় তেমন আমার মাথা খোলে না, কল্পনার বেলাতেও ঠিক তা-ই। অপূর্বদার কথাই আলাদা। যখন খুশি, যেমন খুশি তিনি কল্পনা কবতে পারেন। টিফিনের ঘণ্টা বাজামাত্রই সেই যে আমি গাবগাছের ছায়ায় গ্যাঁট হয়ে বসেছি, এখনও নড়নচড়ন নেই। ডোভার, না হয় হাওয়াই তো ছেড়েই দিলাম, গোয়া কিংবা পুরীর কোনও ছবিই আমার মাথায় আসছে না।

কথাটা আমি বলেও ফেললাম অপূর্বদাকে। "আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি এঁদো

পুকুরটা শ্যাওলায় মজে আছে। এখানে ওখানে দু' একটা চুংড়ি ফুল অবশ্য ফুটে আছে। কিন্তু শ্যাওলা ছাড়া আর বেশি কিছু চোখে পড়ছে না। ওপারে অবশ্য চাটুজ্জেদের কুড় বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি, তারও ওপারে কয়েকটা তালগাছ।"

"ও সব তালগাছ-টাছ চলবে না। আর একটু নিজেকে ছেড়ে দে।" অপূর্বদা বললেন।

"কোথায় ছাড়ব? ছাড়বটা কী করে?"

"সেটাই তো তোকে এতক্ষণ বোঝালাম। কল্পনার কাছে ছেড়ে দিতে হবে নিজেকে। আমি তোকে এতদিন যে সব গল্প-টল্প শোনাচ্ছিলাম, সেটাও তো কল্পনা। যার যত কল্পনা, সে তত বড় লেখক। তত বড় শিল্পী। কল্পনাটাই আসল।"

ওরে বাবা! এ তো দেখছি অঙ্কের চেয়েও কঠিন। মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অপূর্বদা এতদিন ধরে আমাকে যে সব গল্প শুনিয়ে এলেন, সেগুলো সব বানানো? সব কল্পনা?

অপূর্বদার কথা অবশ্য তখনও শেষ হয়নি। তিনি মহা উৎসাহে আবার শুরু করে দিলেন। "পৃথিবী জুড়ে শুধু পাখির রাজত্ব—এই ছবিটা কল্পনা করতে যদি তোর কষ্ট হয়, তা হলে অন্য কিছু একটা কল্পনা কর। আমি বুঝতে পারছি না, রাতদিন এত পাখি দেখছিস, অথচ —"

"পাখি কোথায়? সব তো কাক। কা—কা শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।"

যেন একটা কাক এসে ঠোক্কর দিল, ঠিক সেই ভাবে আমার মাথায় একটা টোকা মেরে অপূর্বদা বললেন, "কাকও তো পাখি, তাই না?"

"সারা পৃথিবীতে কাকের রাজত্ব চলছে এটা ভাবতেই কেমন লাগছে।"

"এই তো লাইনে এসেছিস। তা হলে তুই কিছু একটা ভাবছিস, ভাবার চেষ্টা করছিস, এটাই তো বড় কথা। আস্তে আস্তে মাথাটা খুলবে। তা মন্দ নয়! কাক দিয়েই শুরু করা যাক।"

চারপাশটা কালো হয়ে গেছে, শুধু কাক আর কাক—এটা ভাবতেই চোখে অন্ধকার দেখলাম। নিজে থেকেই দু'চোখ বন্ধ হয়ে এল আমার। চিৎকার করে অপূর্বদাকে বললাম, "দোহাই আপনার। আমাকে দিয়ে চলবে না। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।"

"চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি তোকে জোর করে কিছু করাচ্ছি?"

"কল্পনা টল্পনা আমার একেবারে ভাল লাগে না।"

অপূর্বদা অবশ্য তখনও হাল ছাড়েননি। তিনি বললেন, 'পাখির ছবি ভাবতেই তোর যখন কাকের কথা মনে হল, তখন বরং অন্য কিছু কল্পনা করা যাক।

এখানে কাক ছাড়া আর কিছুই তো দেখা যায় না। তা হলে আমি কেন মিছিমিছি অন্য পাখিদের কথা ভাবব? ক'টা পাখি আমি দেখেছি?"

"কেন, দুর্গাটুনটুনি দেখিসনি? ওই যে ছোট্ট, খুব ছোট্ট একটা পাখি, বেগুনগাছের পাতায় বসে দোল খেতে পারে, এত হালকা।"

"দেখেছি। কিন্তু ওর নাম যে দুর্গাটুনটুনি তা জানব কী করে?"

"এই তোর মুশকিল। কিছু জানতে চাস না, শুনতে চাস না! ছেড়ে দে। পাখির কথা ভুলে যা। বলি, প্রজাপতি দেখেছিস? না, তাও দেখিসনি?"

"দেখেছি।"

"কেমন দেখতে বল তো?"

"দুটো ডানা। ডানায় নানা রকমের রং।"

"ওড়ে, না হেঁটে হেঁটে বেড়ায়?"

"বললাম না, ডানা আছে? তা হলে হেঁটে বেড়াবে কেন শুনি?"

"ডানা থাকলেই কি সবাই উড়ে বেড়ায়। হাঁস-মুরগি ক'টা উড়তে দেখেছিস?"

"প্রজাপতিকে অবশ্য উড়তে দেখেছি। সবাই যেমন দ্যাখে, আমিও তা-ই দেখেছি।"

"ঠিক আছে। এবার তা হলে কল্পনা কর, সারা পৃথিবীতে শুধু প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি প্রজাপতি।"

"তা হলে তো দম বন্ধ হয়ে যাবে। প্রজাপতি উড়ে এসে আমাদের মুখে চোখে ধাক্কা খাবে।"

"তুই ভাল কিছু কল্পনা করতে পারিস না, সব সময় খারাপটাই ধরে নিস। প্রজাপতির ডানায় পৃথিবীটা রঙিন হয়ে যাবে, এটা ভাবতে পারছিস না?"

"না। ভেবে আমার লাভ?"

কাকের খরখরে ঠোঁটের আর একটা ঠোক্কর খেতে যাচ্ছিলাম মাথায়। অপূর্বদার গাঁট্টা। কিন্তু তার আগেই ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেল। টিফিন শেষ, অপূর্বদার উকিলের মতো জেরাও আপাতত মুলতুবি।

পরে, অনেক পরে ভেবে দেখেছি অপূর্বদা কিন্তু মিথ্যে বলেননি। পৃথিবীটা আনন্দে ভরে গেছে, কোথাও কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই, এঁদো পুকুরটায় জমে নেই শ্যাওলা, এমনকি পুকুরটা আর এঁদোও নয়, পরিষ্কার, টলটলে জল সেখানে ঢেউ তুলছে, আমাদের পুরনো স্কুল বাড়িটাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার বদলে সেখানে উঠেছে নতুন বাড়ি, নতুন দিনের ছেলেমেয়েরা ঝলমলে পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে, বন্ধুত্ব করছে—এই ছবি কল্পনা করতে দোষ কী। কল্পনা আছে বলেই তো আমরা অনেক কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন। খারাপ কী। ঠিক কথাই বলেছিলেন অপূর্বদা। কল্পনাটাই আসল!

অপূর্বদার কথাটাকেই আমি আর একটু এগিয়ে দিয়েছি। কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি স্বপ্নকে। যা কল্পনা, তা-ই স্বপ্ন। স্বপ্ন ও কল্পনা ছাড়া মানুষ এগোতে পারে না। কেউ হয়তো কল্পনা করে, দেশটা নতুন করে গড়বে। কেউ হয়তো কল্পনা করে, বড় হয়ে সে বিজ্ঞানী হবে। নামকরা বিজ্ঞানী, মৃত্যুকে জয় করবে। কেউ হয়তো কল্পনা করে পাড়ি দেবে অজানা দেশে। নতুন কিছু আবিষ্কার করবে। এরা নানা ধরনের মানুষ। কিন্তু এদের

মধ্যে একটাই মিল। এরা সবাই কল্পনাপ্রবণ। এরা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। স্বপ্ন দ্যাখে। এদের সব আবেশ, সব অনুভূতি কল্পনার রঙে মিশে যায় স্বপ্নের দেশে।

এই কথাটাই আমি অনেক দেরি করে বুঝেছি বলে দুঃখ হয়। অপূর্বদা আমার দু' বছর আগে স্কুল ছেড়েছিলেন। তারপর আর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করে উনি ভর্তি হয়েছিলেন শহরের কলেজে। সে নাকি নামকরা কলেজ। প্রতি বছর ভাল ভাল ছেলে সেখান থেকে পাশ করে বেরোয়। সে ভাল ছেলেদের ভিড়ে আরও একজন ভাল ছেলে হয়ে অপূর্বদাও হয়তো কোথাও হারিয়ে গেছেন। যেমন দেশটি তিনি কল্পনা করতেন, এতদিনে হয়তো পৌঁছে গেছেন সেখানে।

আর আমি? গ্রামের মাঠঘাটের বাইরে আমি আর কোথাও যেতে পারিনি। কয়েকবার ধাক্কা খেয়ে কোনও রকমে স্কুলের বেড়া টপকেছিলাম। কিন্তু শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হব, ভাল রেজাল্ট করব—সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। স্বপ্ন দেখলে তবে না মানুষ কোনও একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে। আমি তো স্বপ্নই দেখিনি, তা হলে আর স্বপ্নের শহরে পৌঁছব কী করে! আমার বাবাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতেন। রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারতেন না। পরে তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে হল আমাকে।

তিনি রেখে গিয়েছিলেন কয়েক বিঘে জমি, মাঠকোঠা বাড়ি, গোয়ালভর্তি গরু ছাগল আর একটা পুকুর। সেদিন দুপুরে পুকুরে মাছ ধরছিলাম। বলা ভাল, ছিপ নিয়ে বসেছিলাম। রোজই এরকম বসে থাকি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। চুনোপুঁটি না হয় চারাপোনা যদি কিছু বঁড়শিতে গেঁথে যায়, ভাল, সময়টা তো কাটে। কিন্তু সেদিন ঘটল দারুণ একটা ঘটনা।

ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে ছিলাম। এটাই অভ্যেস। পুকুরের ওপারের রাস্তা থেকে হঠাৎ হই হই করে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। চেহারায়, চাল-চলনে অত্যন্ত আধুনিক এক ভদ্রলোক। তিনি আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে প্রায় দৌড়ে এদিকে আসছেন, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারছি না। গলার স্বরটা অবশ্য খুব চেনা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরই বুঝতে পারলাম অপূর্বদা এসেছেন। আমার সেই অপূর্বদা। যাঁর কথাবার্তা আগে আমি বুঝতে পারিনি। এখন কিছু কিছু বোঝার চেষ্টা করছি।

"আপনি কত বদলে গেছেন! চিনতে পারিনি।" আমি ওঁকে প্রণাম করলাম।

"আমি কিন্তু আগের মতোই আছি। বাইরের চেহারাটা অবশ্য বদলেছে." হাসতে হাসতে বললেন অপূর্বদা। "তা এই ভরদুপুরে পুকুরপাড়ে বসে বসে কী করছিস?"

আমি ছিপটা পুকুরঘাটে রেখে ওঁর কাছে দৌড়ে গিয়েছিলাম। পুকুরঘাটে নজর পড়ল অপূর্বদার। ছিপটা দেখে বললেন, "এভাবে সময় নষ্ট করছিস কেন? কতক্ষণ বসে থাকলে ছিপে একটা মাছ ওঠে ভেবে দেখেছিস? ঘণ্টার হিসেবে ক'টা মাছ ধরা যায়? মজুরি কত?"

মাথা নিচু করে আমি বললাম, "তুমি না আমাকে কল্পনা করতে বলেছিলে? সারা পৃথিবীটা পাখির রাজত্ব, প্রজাপতির রাজত্ব। পৃথিবীটা অনেক বড় জায়গা। আমার কল্পনায় তা ধরা পড়েনি। আমি বরং কল্পনা করে নিয়েছি, আমার এই পুকুরটায় মাছ কিলবিল করছে। জলে-মাছে সমান হয়ে আছে। তাই ছিপ ফেলে বসে থাকি। একটা না একটা মাছ ধরা পড়েই।"

"তোর বিরক্তি লাগে না? ক্লান্তি বলে একটা ব্যাপার আছে জানিস তো? কখনও কখনও হতাশ মনে হয় না নিজেকে?"

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অপূর্বদা আবার বললেন, "আমিই এখন অন্যভাবে কল্পনা করি। এতদিন পর দেশে ফিরলাম। মাসখানেক থেকে আবার কাজের জায়গায় ফিরে যাব। সে যেন এক অন্য গ্রহ। তবে ভাল লাগছে, গাঁয়ে ঢুকতেই তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তোকে এখন অন্যভাবে কল্পনা করতে বলি।"

আমি এবার অপূর্বদার চোখের দিকে তাকালাম। স্পষ্ট দেখলাম, বহু বছরের ক্লান্তি ওঁর দু চোখে জমে আছে। উনি বললেন, "আমার কী মনে হয় জানিস? এখন তোর কল্পনা করা উচিত, তোর এই পুকুরে একটাই মাছ আছে। সেই মাছটা যদি ধরা দেয় ভাল, না হলে তোকে ছিপ ফেলে বছরের পর বছর বসে থাকতে হতে পারে।"

কী বলছেন অপূর্বদা! কল্পনার কি এখন-তখন আছে? সারা পৃথিবীটা পাখি ও প্রজাপতিতে ভরে গেছে এটা যদি আমি ছেলেবেলায় কল্পনা করতে না পারি, তা হলে এখন কল্পনা করতে দোষ কী!

অপূর্বদা বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, "এভাবে কল্পনা করলে মানুষকে হতাশ হতে হয় না। হতাশ মানুষের মুখ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নতুন করে আর হতাশা বাড়াতে চাই না।"

অপূর্বদা এগিয়ে গেলেন ওঁর বাড়ির দিকে। বাড়িতে কেউ নেই। শহরে পড়ার সময়ই ওঁর বাবা, মা মারা গিয়েছিলেন। তারপরই উনি দেশ ছাড়া। গ্রামের বাড়িতেও তালা ঝুলছে। সেই তালায় মরচে পড়েছে। বাড়িটাও ভরে গেছে আগাছায়।

আমি বললাম, "এই কয়েকটা দিন আমার কাছেই থাকুন অপূর্বদা। গল্প শুনব। সেই গাবগাছের ছায়ায় আপনি যেমন গল্প শোনাতেন সে রকম গল্প।"

অপূর্বদা শুনেও শুনলেন না। নিজের বাড়ির তালা খোলার চাবি ওঁর নেই। কিন্তু তবু তো তালাটা খুলতে হবে। আগের মতো এবারও অপূর্বদা আমাকে পেছনে রেখে আস্তে আস্তে অনেকটা দূর এগিয়ে গেলেন। এবার ওঁর নিজের বাড়ির দিকে।

কাছে যাওয়ার মুহূর্ত

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিনিবাসের স্টার্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ডালহৌসির টার্মিনাসে বাসটা রেখে ড্রাইভার যখন নেমে গিয়েছিল তখনও তার স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলো একে একে উঠল। বসার আসনগুলো দেখতে না দেখতেই ভরে গেল। লাইনের লোকগুলোও তখন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। ওরা পরের বাসে যাবে, বসার জায়গা পাবে। বাসটা ছাড়ল এক সময়। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে, ভবানীপুরে, এখানে-ওখানে জ্যামে'আটকে যাওয়ার সময়ও স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল রানিকুঠী স্টপে এসে।

শীতের সন্ধে। মিনিবাসটায় এখন লোকের দাঁড়ানোরও জায়গা নেই। এত ভিড়। দরজার হ্যান্ডেল ধরেও কয়েকজন ঝুলছে। পরিতোষ বাসের পেছন দিকে জানলার পাশে সিট পেয়েছিল। তার আগে দু'দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে তবেই এই সিটটা ওর দখলে এসেছে। পরিতোষ দেখল, টেলিভিশনের দোকানে সার সার কয়েকটা টেলিভিশনের নীল পর্দায় একই ছবি দেখানো হচ্ছে। ফুটপাথের ভিড় উপছে পড়েছে রাস্তায়। উজ্জ্বল আরও কয়েকটা দোকান। ফুটপাতে বসে একজন তরি-তরকারি বিক্রি করছে। অ্যাসিটিলিন আলো জ্বালিয়েছে লোকটি। সেই হলুদ আলোতেও পাকা টম্যাটোগুলো আরও লাল হয়ে উঠেছে। এরই পাশে কয়েক ঝুড়ি ফল নিয়ে আর একজন বিক্রি করছে। কমলালেবুর খোসার হলুদ রঙ কিন্তু তত চকচকে দেখাচ্ছে না। আপেলের গায়ে সব আলো ঠিকরে পড়ছে।

বাসরে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীরা কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল। তারপরই শুরু হল মৃদু গুঞ্জন। পরিতোষের পাশের ভদ্রলোক বলে উঠলেন, স্টার্টিং প্রবলেম! এরকম ঝরঝরে একটা বাস নিয়ে রাস্তায় বেরলো কী করে?

একটু ঠ্যালা দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে কে একজন মন্তব্য করল।

ঠেলবেটা কে? আমি ঠেলব?

আপনি একা ঠেললেই হবে? পালোয়ান ভাবছেন নাকি নিজেকে?

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। বাসের ভেতরেও তেমন সাড়াশব্দ নেই। কেউ এখন নেমে গিয়ে বাসটা ঠেলতে শুরু করবে, আর তাঁকে দেখে অন্যরাও গিয়ে হাত মেলাবে, তেমন চেষ্টাও নেই। তবে এতে বিশেষ ক্ষতিও হয় না। রাস্তার এদিকে-ওদিকে সব সময় কিছু উৎসাহী লোক দাঁড়িয়ে থাকে। কোথায় কী গন্ডগোল, এরা সহজেই টের পেয়ে যায়।

কন্ডাকটার-ক্লিনারকেও তেমন হাঁকডাক করতে হয় না।

আবার এমন কিছু লোক থাকে যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যাম দেখে। এটাই তাদের 'হবি'। দাঁড়িয়ে থাকে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। পরিতোষ বুঝতে পারল না, এখন ঠিক কোন ধরনের লোকেরা এসে তাদের বাসটা ঠেলতে শুরু করল। কিছুটা গড়িয়ে বাসটা স্টার্ট নেওয়ার চেষ্টা করল। একবার, দু'বার, তারপরই সেই আগের আওয়াজটা শোনা গেল। ড্রাইভার এতক্ষণ বাসের বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। ব্যাটারিটাও দুর্বল। শরীরে নানা রোগ। এভাবেই চলতে হবে। বাসের ভেতরটা অবশ্য অন্ধকার হয়ে যায়নি। রাস্তার দু'পাশের দোকানপাটের আলো এসে পড়েছিল, সে-আলো বাসেব হলুদ বাতিগুলোর চেয়েও জোরালো! স্টার্ট নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এবার অবশ্য ভেতরের বাতিগুলোও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। পরিতোষের শুধু একটা কথাই মনে হল। সে হয়তো আরও দশ মিনিট আগে বাসায় পৌঁছতে পারত। ঝুমা অপেক্ষা করে আছে। আশা করছে, পরিতোষের মুখ থেকে একটা ভাল খবর শুনতে পাবে। নিশ্চিন্ত হবে ঝুমা। পরিতোষ নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফিরবে।

বাসের সিটটা এক দিকে হেলে পড়েছে। গদিটাও ছেঁড়া। বসতে কষ্ট হয়। জানলার পাশের একটা পেরেকও বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে আছে। কী দরকার ছিল, ওখানে ওভাবে পেরেকটা লাগানোর! দায়সারা কাজ একেবারেই পছন্দ হয় না পরিতোষের। মরচে পড়া পেরেকটার দিকে আবার চোখ পড়ে গেল। কনুইয়ে একবার খোঁচা লাগার পরই সে পেরেকটার অস্তিত্ব টের পেয়েছে। পেরেকটাকে ভুলে-থাকার চেষ্টা করেও পারছে না। তাও ভাল, এভাবে কিছুটা সময় অন্তত কেটে যাবে। বাসটা যে দেরি করছে, সেটাও সে এখন শান্তভাবে মেনে নিয়েছে। ঝুমাকে গিয়ে কীভাবে সে বলবে, আমি পারিনি? দেরি হওয়াই ভাল।

এদিকে আদিগঙ্গার সাঁকো পেরিয়ে মহামায়াতলা পৌঁছতে না পৌঁছতেই সন্ধে ফুরিয়ে গেল। গাছপালা ও ছড়ানো ছিটনো বাড়িঘরের মধ্যে এই দিকটায় সন্ধে ও রাতের মধ্যে সময়ের বেশি ব্যবধান থাকে না। শীতের সন্ধে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, রাতও নামে অনেক আগে। মিনিবাসটা চলে গেল হরিনাভির দিকে। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে একটা লোকাল গেল। তার শব্দটাও বাতাসে ভেসে থাকল অনেকক্ষণ। ঠান্ডাও এখানে ঘাসে, মাটিতে জমাট হয়ে থাকে।

এখন বাসরাস্তা থেকে মিনিটদশেক হাঁটবে পরিতোষ। যেতে যেতে ভাবকে কী করে কথাটা বলবে ঝুমাকে। পায়ে চলার রাস্তার এদিকটায় লাইটপোস্টগুলো একটু দূরে দূরে। আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। পায়ের নীচে পিচ ঢালা সরু পথটাও এক সময় ফুরিয়ে যায়। তারপর একটা বড় মাঠ। বাড়িঘর এখনও ওঠেনি। খুঁটি পুঁতে, কেউ বা কিছুটা দেয়াল তুলে নিজেদের জায়গা মাপ করে রেখে গেছে। এক জায়গায় আধলা ইটের স্তূপ। আর এক জায়গায় কিছুটা বালি পড়ে আছে। পায়ে পায়ে বালিটা ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িঘরগুলো তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা স্পষ্ট একটা চেহারা নেবে। ততদিন বালি,

পাথর ও ভাঙা ইটের টুকরো পেরিয়ে লোকজন চলাফেরা করবে। ওদেরই একজন পরিতোষ, এই এখন আবছা আলো-অন্ধকারে বাড়ি ফিরছে।

পরিতোষ দেখল, রোজকার মতো আজও ওর বাসার দরজাটা বন্ধ। তৈরির পর কয়েকদিন কাটতে না কাটতেই কাঠের পাল্লাটা বেঁকে গেছে। শস্তা কাঠের কয়েকটা টুকরো জুড়ে এই পাল্লা। বেঁকে তো যাবেই। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগাতেও কষ্ট হয়। পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরের আলো তেরছা হয়ে সামনের ঘাসের জমিতে এসে পড়েছে। পরিতোষ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে খোলামকুচির মতো ভাঙা আলোর কিছুটা টুকরো ওর গায়ে এসে পড়ল। সে কড়া নাড়ল। রোজকার মতো এখনও আস্তে, বেশ আস্তে। ওর ভিতু স্বভাবটা এই কড়া নাড়ার মধ্যেই ধরা পড়ে যায়।

ঝুমা দরজা খুলল। কড়া দু'বার নাড়াতে হয়নি। ঝুমা হয় তো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। পরিতোষ ছাড়া আর কে! সে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো পরিতোষের মুখে গিয়ে পড়ল, মুখটাকে স্পষ্ট করে তুলল। ঝুমাকে পাশ কাটিয়ে, নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল পরিতোষ।

ঘরে একটা চৌকি, চেয়ার, টেবিল ও আলনা। রথের মেলায় এরকম আসবাব বিক্রি হয়। ছোট এক কামরার বাসা। এক কোণে কেরোসিন স্টোভ ও এনামেলের কিছু বাসনপত্র। স্টেনলেসের দুটো থালা তারই মধ্যে বেমানান লাগছে। চৌকির নীচে কয়েকটা কৌটো ও টিন। ঝুমা ও পরিতোষের সংসার এর বেশি বা কম আর কিছুই নেই।

দরজার কোণে চটিজোড়া খুলে নলকূপে গিয়ে মুখ, হাত, পা ধুয়ে নেবে পরিতোষ। তার আগে প্যান্ট-জামাটাও বদলেনেবে। গায়ে চাদর জড়াবে। ঘরের ভেতরটায় যেন বেশি শীত।

পাশাপাশি তিনটে ঘর। তারই একটা পরিতোষকে মাসিক দুশো টাকায় ভাড়া দিয়েছেন গঙ্গাধরবাবু। বাড়িটা এখনও শেষ করতে পারেননি। ভেতরে-বাইরে পলেস্তারা নেই। মেঝেটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়নি। সবসময় স্যাঁতস্যাঁত করে বাড়িটা অবশ্য পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠোনের এক কোণে পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনি তুলে কোনও রকমে ছোট একটা টয়লেট তৈরি করা হয়েছে। কাছাকাছি একটা নলকূপ। তার চারপাশটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখানেই স্নান, কাপড় কাচা বাসন মাজা : হাত, মুখ ধোওয়া সবই চলে। সরু একটা নালা এখান থেকে উঠোন পেরিয়ে পাঁচিলের ওপারে চলে গেছে।

এ-বাড়ির মেয়েরা—ঝুমা, বাড়িঅলা গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী সরমা ও কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়া আঠারো বছরের মেয়ে পারুল, যখন খোলা উঠোনে নলকূপের সিমেন্ট বাঁধানো ওই চাতালে স্নান করে, তখন পুরুষরা ছলছুতো করে ঘরেই দরজা বন্ধ করে থাকে। ভুলেও বাইরে বেরোয় না। মেয়েরা স্নান সেরে ঘরে ঢুকলে অন্য কথা। নলকূপের মতো টয়লেটটাও বাড়িঅলা ও ভাড়াটে দু'জনেই ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

হাত-মুখ ধুতে যাওয়ার সময় পরিতোষকে গামছাটা এগিয়ে দিল ঝুমা। সকালের তেলচিটে গামছাটা এখন পরিষ্কার লাগছে। ঝুমা সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছে।

গামছাটা হাতে নিয়ে পরিতোষ বলল, আজও দেরি হয়ে গেল। যা দূর।

ঝুমা বলতে পারত, এ আর নতুন কথা কী। তার বদলে বলল, তাড়াতাড়ি এস, চা বসাচ্ছি।

নলকূপ টিপে জল নিঙড়ে বের করতে তেমন সময় লাগে না। কিন্তু আজ রাত্রে পরিতোষ অনেক সময় নিচ্ছে। সময় ফুরিয়ে যাওয়াই ভাল, কথাটা যেন ঝুমাকে বলতে না হয়। অন্য দিনের চেয়ে আজ যেন অনেক আগেই এসে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত।

কিন্তু তারপর? এক সময় তো ঝুমা টের পাবেই। তা হলে? আসলে ঝুমাকে কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছে না পরিতোষ, সঙ্কোচ হচ্ছে। কখনও সে সহজভাবে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে না, এখনও হতে পারছে না। অথচ সে সবচেয়ে কঠিন কঠোর বাস্তবের মধ্যেই আছে। এক মুহূর্তের জন্যও ওর স্বস্তি নেই। পালিয়ে যাবে সে উপায়ও নেই। বিয়ে-থা করেছে, সংসারী হয়েছে। এসেছে দায়িত্ব। একা হলেও কথা ছিল, কিন্তু এখন ঝুমার কথা ওকে ভাবতে হয়। ঝুমা ওর ওপরেই নির্ভর করে আছে। বাবা-মা, বাড়ি ঘর, সব কিছু ছেড়ে এসেছে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে। সোনার দু গাছা চুড়ি, আর সরু সুতোর মতো একটা হার, সেটাও সে দিয়েছে পরিতোষকে। বিক্রি করে সামান্য যে ক'টা টাকা পাওয়ার কথা, তাও পরিতোষ পায়নি। সোনা থাকলে নাকি ভয় নেই। রাতবিরেতে সোনা বিক্রি করা যায়, টাকা পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক, কিন্তু পুরো ঠিক নয়। কিনতে যত টাকা লাগে, বিক্রির সময় সে টাকাও পাওয়া যায় না। সোনা বিক্রি করলেও মানুষকে ঠকতে হয়। পরিতোষও ঠকেছে। এভাবে প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণাটা টাকা না পাওয়ার দুঃখের চেয়েও বেশি। পরিতোষ যন্ত্রণার ভাগ ঝুমাকে দিতে চায়নি।

তবে ঝুমাকে কিছু বলতে হয় না। পরিতোষ মুখে কিছু না বললেও ঝুমা সব বুঝতে পারে। খোলা আকাশের নীচে অন্ধকারে মুখে চোখে নলকূপের জলের ঝাপটা দিয়ে পরিতোষ ঘরে ঢুকে দেখল, ঝুমা চা ছাঁকছে।

চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুট দিল ঝুমা। বলল, এখন কিছু খাবে?

না। চায়ে চুমুক দিল পরিতোষ।

অরুণকে নিশ্চয় কথাটা বলতে পারোনি?

বলা হল না।

জানতাম তুমি বলতে পারবে না।

ঝুমা ওর স্বামীর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। এতে পরিতোষের খারাপ লাগার কথা। কিন্তু লাগল না। অদ্ভুত স্বভাব পরিতোষের। কিছুতেই ওর কিছু যায় আসে না। আবার ওকে উদাসীন বা নির্লিপ্তও বলা যায় না। পরিতোষ চারপাশের হালচাল দেখে বুঝতে পেরেছে, কোনও কিছু নিয়ে বেশি ভাবতে নেই। যা হওয়ার তা হবেই। চেষ্টা করলেও হবে, এমনকি না করলেও হবে।

কিন্তু আজ না হয়, কোনওরকমে ভাতের ব্যবস্থা করেছে ঝুমা, কাল কী হবে? এমনকি, বাড়ি থেকে বেরোনোর পয়সাও নেই। এদিকে, গঙ্গাধরবাবুকেও ভোর হতে না

হতেই বাড়িভাড়ার টাকা গুনে দিতে হবে। তিনি অপেক্ষা করে আছেন। আগের মাসের ভাড়াও ওকে দেওয়া হয়নি। মিথ্যে কথা বলে, কিংবা কোনও অজুহাত দিয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়ার দরকার হয়তো হত, কিন্তু গঙ্গাধরবাবু তেমন পীড়াপীড়ি করেননি। তা বলে, আগামীকাল সকালেও তিনি আগের মতো ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকবেন, এমন মনে করার কারণ নেই। কারও কাছে টাকা ধার নেওয়াই একমাত্র উপায় পরিতোষের।

আজ কয়েকদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করছে। চারশো টাকা সে ধার করবে। গঙ্গাধরবাবুকে দু'মাসের বাড়িভাড়া দিয়ে ওর হাতে থাকবে একশো টাকা। যতদিন চলে চলবে। তারপর আবার ধার। একজনের কাছে টাকা নিয়ে আর একজনকে মেটাবে।

কিন্তু যদি ধার না পাওয়া যায়? এমন একটা দিন আসবে, যেদিন টাকা ধার নেওয়ার লোক একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সেদিন আসতে দেরি আছে। পরিতোষ চারশো টাকা ধার নেবে চারজনের কাছে। চারশো টাকা। কিন্তু একশো টাকা চাইলে কেউ কেউ নিশ্চয় ওকে ফিরিয়ে দেবে না। তেমন হলে আটজনের কাছে চারশো টাকা ধার নেবে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে পঞ্চাশ টাকা। ষোলোজনের কাছে ধার নিলে প্রত্যেকের টাকার অঙ্কটা আরও কমে যাবে। কাজটা সহজ হয়ে যাবে পরিতোষের । এটাই সে ভেবে নিয়েছিল।

কিন্তু এই ক'দিন ঘোরাঘুরি করে দেখল, টাকা ধার চাওয়ার মতো চেনাজানা লোক ওর তেমন নেই। দু'একজন আছে। কিন্তু মুখ ফুটে শেষপর্যন্ত কাউকেই সে কথাটা বলতে পারেনি।

শেষে ভেবেছিল, অরুণের কাছে গিয়ে চাইবে। অরুণকে সে বহু বছর ধরে চেনে। একই স্কুলে ওরা পড়েছে। অরুণ এখন একটা চাকরিও করে। পরোপকারী ছেলে অরুণ। এখনও নিশ্চয় সেই স্বভাবটাই আছে। বদলে যায়নি।

অরুণের অফিসে গিয়েও ছিল পরিতোষ। বেশ কয়েকবছর পর দেখা। প্রথম থেকেই অস্বস্তিতে ছিল পরিতোষ। এতবছর দেখা হওয়ার দিনটাতেই কী করে সে টাকা ধার চাইবে? নিজেকে বেশ স্বার্থপর মনে হয়েছিল পরিতোষের। একটা কুণ্ঠা, একটা লজ্জা ক্রমশ ওকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল।

তবে পরিতোষ একটা বিষয়ে খুশি। একই স্কুলে পড়া পুরনো দিনের বন্ধুটি যে এখনও সেই আগের মতোই আছে, ওর আচার আচরণে তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। আয়, আয়। রাস্তা ভুলে নাকি?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল অরুণ। যাক, তা হলে এতদিন পর মনে পড়ল?

পরিতোষ বলল, মনে পড়বে না কেন। না হলে এলাম কেন?

জানলি কী করে আমি এই অফিসে কাজ করি?

ভুলে যাইনি, বল।

সত্যিই খবর রাখিস?

তুই কিন্তু আগের মতোই আছিস।

কী করে বুঝলি?

চেহারাটা আগের মতোই আছে। ভগবান, যাকে যেমন রাখেন, তা'ই না? হাসতে হাসতে বলল পরিতোষ

দুই

ভগবান নেই, পৃথিবীতে নীতিকথারও কোনও দাম নেই। সুরমার অসুখ আর সারবে না, সারাজীবনই ওকে ভোগাবে, ডাক্তার এই রায় দেওয়ার পর থেকেই এই দুটি সিদ্ধান্তে এসেছে অরুণ। এখন সে ভাবে, এতদিন কেন সে বিশ্বাস করেছিল, ভাল মানুষদের ভাল হয়, কেউ তাদেব কষ্ট দিতে পারে না! কেন কথাটা বিশ্বাস করেছিল? কে বলেছিল কথাটা? এরকম একটা সহজ, সরল নীতিকথা বিশ্বাস করাই বোকামি। সেই বোকামিটাই করেছে অরুণ।

আবার এক-এক সময় ওর মনে হয়, বিশ্বাসের মূল্য কি ওকে আলাদাভাবে কিছু দিতে হয়েছে! তা তো নয়। সে শুধু কথাটা বিশ্বাস করেছে। এ ধরনেব নীতিকথায় হয়তো মনে জোরও পেয়েছে। ক্ষতি তো কিছু হয়নি। সুরমাব অসুখের জন্য ওই নীতিকথা দায়ি নয়। অসুখ হলে ভগবানই বা কী করবেন? দু'বেলা পুজো করলে কিংবা মনে মনে ভগবানকে ডাকলে যদি রোগব্যাধি সেরে যেত, তা হলে আর ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধপত্রের দরকার ছিল না।

অরুণের এর পরের প্রশ্ন, বিপদে-আপদে যদি ভগবান কোনও কাজে না লাগেন, তা হলে তাঁর কথা চিন্তা না করাই ভাল। বরং ভেবে নেওয়া ভাল, ভগবান বলে কেউ নেই। এটাই অরুণের শেষ সিদ্ধান্ত। দু'বেলা অফিস যাওয়া-আসার পথে কালীঘাটের পাশ দিয়ে ওকে যেতে হয়। বাসে, মিনিবাসে সিট পেলে তো কথাই নেই। এমনকি বাস মিনিবাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে, কিংবা প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেও কপালে হাত ঠেকিয়ে মাকালীকে প্রণাম করে। এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে আর একটা হাত কপালে ঠেকায়। মাকালীকে বলে, 'মা, ভাল বেখো।' কাকে ভাল রাখবেন মাকালী? 'বাড়ির সবাইকে।' অরুণ মাকালীর কাছে প্রার্থনা করে।

তবু সুরমা ভুগছে। সারা শরীরে ব্যথা। শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ব্যথাটা চলাফেরা করে। আজ মাথায় তো কাল হাঁটুতে, না হয় গোড়ালিতে। ব্যথার জায়গাগুলো একটু একটু করে ফুলতে থাকে। এ-কষ্ট চোখে দেখা যায় না। কিছু আছে, চলতি কথায় যাদের বলা হয় পেনকিলার। কোনও ওষুধই কাজে লাগেনি সুরমার। একের পর এক ডাক্তার বদল করা হয়েছে। যত ওষুধ সবই চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্টেরয়েড আর কুইনিন। এটাই এখন সকাল ও রাত্রে নিয়ম করে খেয়ে যায় সুরমা।

কখনও কিছুটা ভাল থাকে, কখনও খুব খারাপ।

রক্তপরীক্ষাই যে কতবার করা হল সুরমার। রক্তপরীক্ষাও যে এত রকমের হয় জানত না অরুণ। শেষ পর্যন্ত এরকম একটা রক্তপরীক্ষাতেই ধরা পড়ল সুরমার রোগ। ডাক্তার বললেন, এস এল ই।

অরুণ কেন, অনেক ডাক্তারই এ রোগের নাম শোনেননি। রোগটার কথা প্রথম জানার পর কিছুক্ষণ চুপ করেছিল অরুণ। ডাক্তাররা বেশি কথা বলেন না। রোগ যদি তেমন খারাপ হয়, তাহলে রোগীকে না বলাই ভাল। রোগী ভয় পেতে পারে। রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছেটাই সে পারে হারিয়ে ফেলতে। এদেশের ডাক্তাররা এটাই মনে করেন। আত্মীয়দেরও তাঁরা রোগের কথা বিশদভাবে বলেন না।

অরুণ জিজ্ঞেস না করে পারেনি, রোগটা আসলে কী? ওকে বাঁচাতে পারব তো?

রোগটা স্টেরয়েড দিয়ে চেপে রাখতে হবে। ইউরিন পরীক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে কিডনি ঠিক আছে কি না।

কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে?

চেষ্টা করে দেখতে হবে। এখনই কিছু বলা যায় না। আগে ইউরিনটা পরীক্ষা করে আনুন।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন।

ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়ে অবশ্য কিছুটা নিশ্চিন্ত হল অরুণ। যে ল্যাবরেটারিতে এসব পরীক্ষা হয়, সেখানে গেলে বোঝা যায়, কত মানুষ সাংঘাতিক সব রোগে ভুগছে। রিপোর্টটা সাদা খামে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। খামে টাইপ করে দেওয়া হয়েছে সুরমার নাম। খামটা ভয়ে ভয়ে খুলেছিল অরুণ। রিপোর্ট যে কী, তা ওর বোঝার কথা নয়। তবু পড়ে দেখার চেষ্টা করেছিল। বুঝতে পারেনি। অ্যাপ্রন পরা এক যুবককে ডাক্তার মনে হওয়ায় অরুণ ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, রিপোর্টটা ভাল তো?

যুবকটির হাতে খামসুদ্ধ রিপোর্টটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও পারেনি অরুণ। বুঝতে পেরেছিল, রিপোর্টটাই এখানে দেওয়া হয়। সে রিপোর্ট ভাল না খারাপ তা এঁরা বলেন না। যে ডাক্তার পাঠিয়েছেন রোগীকে, আবার তাঁর কাছেই রিপোর্টটা দেখাতে হয়। তিনিই যা বলার বলবেন।

ডাক্তার সুরমার ইউরিন রিপোর্টটা দেখে বললেন, না, চিন্তার কারণ নেই। তবে প্রতিমাসে ইউরিন টেস্ট করাবেন। রুটিন এগজামিনেশন। স্টেরয়েড ও ল্যারিয়াগো যেমন চলছে চলবে। রোগী নিজেই বুঝতে পারবে, কেমন আছে। ব্যথাটা যদি একেবারেই না থাকে, তখনই আমরা স্টেরয়েড আস্তে আস্তে কমাব। টেল অফ করব।

ব্যথা কমবে তো? অরুণ জিজ্ঞেস করল। রোগটা অদ্ভুত। মাঝে মাঝে একেবারেই থাকে না। আসলে কিন্তু ছেড়ে যায় না। আবার ফিরে আসে। শরীরের সিস্টেমগুলোকে একে একে নষ্ট করতে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়—

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। হাতঘড়ি দেখলেন। রাত প্রায় দশটা। বাইরে

এখনও রোগীর ভিড়। এই ডাক্তারের খুব নামডাক। বিকেল থেকেই তাঁর চেম্বারে রোগীর ভিড়। মাঝরাতেও ভিড় কমে না। তিনি তাড়াতাড়ি অরুণকে ছেড়ে দিলেন। তবে তাব আগে তিনি তাঁর অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করেছেন।

রোগটা একেবারে ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়েছে। চিন্তা করবেন না। ওঁকে সত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচতে হবে।

সত্তর বছর? তাও ভাল। একশো বছর নয় কেন? একটু খারাপ লাগলেও অরুণ ভাবল, সত্তর বছরই বা কম কী! মনে মনে হিসেব করে দেখল, সুরমা আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট। সুরমার যখন সত্তর, তখন আমি সাতাত্তর। ততদিন কি আমি বেঁচে থাকব? না, সুরমার জন্য বাঁচতে হবে।

এ সব কথা অবশ্য সুরমাকে বলেনি অরুণ। চার বছর ধরে ভুগছে সুরমা। ডাক্তার যদি আশ্বাস দেয়, সেই কথাটাও সে এখন বিশ্বাস করে না। রোজই অরুণ বাড়ি ফেরে ভয়ে-ভয়ে। গিয়ে হয়তো দেখবে, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আজ কিন্তু ভয়টা ওর অতটা নেই। রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেও ওর দুশ্চিন্তাটাই কেটে গেছে। ডাক্তারের কথার পুরোটা সে বলবে না। শুধু বলবে, রোগটা ধরা পড়েছে।

ধরা পড়েছে? বিছানা থেকে উঠে বসার চেষ্টা করল সুরমা। পারল না। অরুণ ওকে দু'হাত দিয়ে টেনে তুলল।

সুরমা বলল, রোগটা যখন ধরা পড়েছে, নিশ্চয় সেরে যাবে তাই না?

হ্যাঁ। কৃত্রিম খুশির হাসি মুখে ফুটিয়েই তুলতে হল অরুণকে।

এক এক সময় মনে হয় মরে যাব। বেঁচে থেকেই বা লাভ কী? দেখছ না, সারা মুখ কেমন কালো হয়ে গেছে। শরীরের নানা জায়গায় কালো কালো ছোপ পড়েছে। এমন চেহারা নিয়ে বাঁচতে ভাল লাগে! লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে? সুরমা ক্লান্ত গলায় কথাগুলো বলেই আবার বিছানায় পড়ার চেষ্টা করল। সুরমা আর ঠিক মতো ওঠা-বসা করতে পারে না। বিছানায় সহজভাবে গা এলিয়েও দিতে পারে না। ওকে সাহায্য করতে হয়।

অরুণ ওকে, সান্ত্বনা না দিয়ে, মনে সাহস জুগিয়ে বলল, মন খারাপ করো না ডাক্তার বলেছেন, চিন্তার কারণ নেই।

সারা মুখে ঘা বেরিয়েছে। জিভ পর্যন্ত নাড়াতে পারছি না।

ওষুধ এনেছি। ভাল হয়ে যাবে।

মুখের দাগগুলো মিলিয়ে যাবে?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। নিশ্চয় যাবে।

আমার কী হয়েছে বলো তো? এমন ব্যথা হয় কেন? শরীর যায় যাক, কিন্তু চেহারাটা বিশ্রী হয়ে গেল। আয়নায় আর মুখটা দেখতে পারি না। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতেও ভয় হয়। চিরুনিতে গোছা গোছা চুল উঠে আসে।

গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে সাহসের যে বাঁধটা সে মনের মধ্যে গড়ে

তুলেছিল, সেটা ভেঙে গেল আস্তে আস্তে। অস্ফুট স্বরে সে বোধহয় বলল, মেয়েদের রূপ চোখের সামনে আস্তে আস্তে নষ্ট করে দেয় এই রোগ। সতিই ভয়ঙ্কর!

সুরমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে অরুণ ভাবল, তুমি চিন্তা করো না। আমি সবসময় তোমার পাশে আছি। অফিসে কিংবা কোনও কাজে বাড়ির বাইরে থাকলেও আমি সব সময় তোমার কাছে আসতে চাই। কিন্তু কাছে আসার মুহূর্তগুলো যদি এভাবে মন খারাপ করে দেয়, তা হলে আমিই বা কতক্ষণ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। আমিও তো ভেঙে পড়তে পারি।

কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। মনটাকে শক্ত করতে হবে। জীবনের এ এক নিষ্ঠুর নিয়ম। এই নিয়মটা আছে বলেই মানুষ এখনও রোগ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে পারছে। হেরে যায়নি।

পর মুহূর্তেই অরুণ ভাবল, কোনওভাবেই মনটাকে দুর্বল করব না। দুর্বলতাই আসল রোগ।

ঠিক এই কথাটাই ঝুমা অন্যভাবে বলেছিল পরিতোষকে। সেদিন দু'জনেরই ঘুম আসছিল না। পরিতোষের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ঝুমা।

পরিতোষ ওর হাতটা সরিয়ে দিল। বলল, ঘুমোও।

ঝুমা হাতটা আবার ওর গায়ে এনে বলল, কী ভাবছ?

কিছু না।

বলোই না।

কাল সকালে কী হবে, তাই ভাবছি।

সকাল হোক, তারপর ভাববে।

এতদিন তো এভাবেই কাটালাম। আর সময় নেই।

আছে।

আছে?

বলছি তো আছে। ঝুমা বলল।

কাল সকালেই গঙ্গাধরবাবু—

গঙ্গাধরবাবু?

হ্যাঁ।

তুমি তো সারাদিন বাইরে ছিলে।

কথাটা অরুণকে বলতে পারলাম না।

দেরি হয়নি। কিছুটা সময় এখনও আছে।

সময় নেই। আর কয়েক ঘণ্টা, তারপর—

অন্ধকারের চেয়েও কালো কোনও অন্ধকার যদি থাকে, তার মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছে পরিতোষ। খড়কুটোর মতো ঝুমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

ঝুমা ওর খুব কাছে, সবচেয়ে কাছে নিজেকে নিয়ে গিয়ে বলল, সময় নষ্ট করো না। সকালের কথা ভেবে এই সুন্দর সময়টা নষ্ট করো না।

অন্যদিন সকালবেলা ঝুমা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে পরিতোষের ঘুম ভাঙায়। কিন্তু সেদিনের সকালটা অন্যরকম। একেবারে অন্যরকম। গঙ্গাধরবাবু ও ওঁর স্ত্রী সরমা চেঁচাচ্ছেন। তাতেই ঘুম ভেঙে গেল পরিতোষের।

বেরোও বলছি, এক্ষুণি বাড়ি থেকে চলে যাও।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল পরিতোষ। কাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছেন ওঁরা! চেঁচাচ্ছেন কেন?

কোনওদিন আর মুখ দেখাতে আসিস না। আমি বুঝব, আমার মেয়ে মরে গেছে।

পারুলকে বলছেন গঙ্গাধরবাবু। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ওঁরা পারুলকে ঘর থেকে টেনে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাইরে বের করে দিচ্ছেন।

কানের দুলজোড়া খুলে দিয়ে যা। সরমা গর্জে উঠলেন।

শুধু ওই দুলজোড়া? হাতের একজোড়া চুড়ি?

গঙ্গাধরবাবুকে খুনি আসামীর মতো দেখাচ্ছে।

কোনওদিন এমুখো হলে আর রক্ষে রাখব না। আর কোনওদিন কাছে আসার চেষ্টা করিস না। খুন করে ফেলব।

পাড়াপড়শিরা ভিড় করেছে। পারুল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সরমা তখনও চেঁচাচ্ছেন। কর্কশ গলায় বলছেন, সালোয়ার-কামিজটা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিস। আমাদের সব জিনিস ফেরত চাই।

কার সঙ্গে প্রেম করে পারুল? কার সঙ্গে সে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছিল? সে কোথায়? সে এখন কেন ওর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে না? সকালবেলা এসব কথা ভাবতে ভাল লাগছে না পরিতোষের। গঙ্গাধরবাবু ও সরমাকে এতক্ষণ কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল ঝুমা। না পেরে সেও এবার ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল।

ঝিমুনি

রক্ত-মাখা বঁটিটা পুকুরের জলে ধুয়ে শান-বাঁধানো ঘাটের এক পাশে শুকনো জায়গা দেখে বিশু সেটা তুলে রাখল। বঁটিটার গায়ে এখন কয়েক ফোঁটা জল। এই একটু আগেই ওখানে রক্ত লেগেছিল। কয়েক ছোপ রক্ত তার ফতুয়াতেও লেগেছে—বিশুর এখন সেটা নজরে পড়ে। বাবুদের বাড়ি থেকে যে মোরগটাকে সে চুরি করে এনে নিজের বাড়িতে এতক্ষণ রান্নার হাঁড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই মোরগটা টুকরো টুকরো হওয়ার আগে তার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। বিশু ভাবল, এতটা অসতর্ক হওয়া তার উচিত হয়নি। স্নানের আগে এখন ফতুয়াটাকে কাচতে হবে। না হলে এটা আজ আর পরা যাবে না। রক্তের ছোপ দেওয়া ফতুয়া পরে বাবুদের বাড়িতে সে দাঁড়াবে কোন সাহসে। বাবুরা রক্তের দাগ চেনে। শুকনো কাঁচা—যে রক্তই হোক-না কেন তাঁদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সুতরাং ফতুয়াটাকে এক্ষুনি কাচতে হবে। গ্রামে গঞ্জে বাবুদের বাড়িতে বিশুর মতো যে-সব লোক মাসিক বারো টাকা মাইনে ও দৈনিক এক বেলা শাক-ভাত খাওয়ার বিনিময়ে বছরের পর বছর ধরে হাজার রকমের ফাই-ফরমাশ খাটে তাদের একটা আট হাত কোরা ধুতি, একটা ফতুয়া ও একটা গামছা থাকাই যথেষ্ট। এর বেশি যা কিছুই থাক সেটাই অনেকের কাছে বিলাসিতা বলে মনে হবে। বিশু ফতুয়াটা যে শুধু এক্ষুনি কেচে নেবে তা নয়, সেটাকে পুকুরের পাড়ে রোদে মেলে দিয়ে শুকিয়েও নেবে। বিশু ফতুয়াটাকে কাচতে গিয়ে দেখল যত সহজে রক্তের ছোপ উঠে যাবে ভেবেছিল তা কিন্তু উঠল না। অগত্যা পুকুরের পাঁক-মাটি নিয়ে রগড়াতে হল। প্রাণটাই যখন পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়েছে তার অন্যতম অবলম্বন কয়েক ফোঁটা রক্তই বা কেন এরকম ব্যাগড়বাঁই করছে! আরেকবার রগড়াও, দ্যাখো ধুয়েমুখে সাফ হয়ে যাবে। তাই হল।

পুকুরের পাড়ে ফতুয়াটাকে মেলে দিয়ে বিশু ডুমুরগাছের ছায়ায় বসল। ওদিকে ওর বউ পারুল এখন কুড়িয়ে-কাড়িয়ে আনা কাঠকুটো দিয়ে মাটির হোলায় মাংস সিজিয়ে নিচ্ছে। প্রোটিনের গন্ধ পথচলতি মানুষের নাসারন্ধ্রে গিয়ে যাতে প্রবেশ না করে তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পারুল একটা এনামেলের থালায় হোলার মুখ বন্ধ করেছে। মশলা নেই। কাঠের ছোট একটা বাটির তলদেশে কিছুটা নুন পড়েছিল। বাটির গা ঝেড়েঝুড়েও সামান্য কিছু নুন পাওয়া যাবে। অসময়ে এর মূল্য অনেক। হোলার মুখের ঢাকনা একটু সরিয়ে হাত দিয়ে একখণ্ড মাংস বের করে আনল পারুল! টিপেটুপে দেখে বুঝলে, প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। নুনের বাটিটা উপুড় করে দিল মাংসের হোলায়। মাংস বলে কথা। টগবগ করে ফুটে উঠে বিনা মসলাতেই হু হু করে গন্ধ ছাড়ছে। পারুল জানে

না, বিশুর মাঝেমধ্যে চুরি করে আনা মোরগগুলোকে অভাবে পড়ে সে যেভাবে রাঁধতে বাধ্য হয় তাই শহরে বাজারে মাংসের স্ট্যু বলে পরিচিত। স্ট্যু কাকে বলে না জেনেও সে এখন স্ট্যু রাঁধছে। তাড়াতাড়ি সে আবার হাঁড়ির মুখটা বন্ধ করে দিল। মাংসের গন্ধ যদি কোনও পাড়াপড়শি বা পথচলতি লোকের নাকে যায় তারা সোজা গিয়ে কথাটা বাবুকে লাগিয়ে দেবে। বাবুর সন্দেহ হবে। কাজটা খোয়াবে বিশু। বলা যায় না মারধোরও খেতে পারে। আর যদি কিছু নাও হয়, বাবু বিদ্রূপ করে বলবে, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ ব্যাটা। ভাবো যে কিছু খবর পাই না। মাংস এল কোত্থেকে? রেতে সিঁধ কাটছ, না দুটো উপরি পয়সা রোজগার কইরছ? বিশু বলে, তাদের বাড়িতে যে ধারালো বঁটিটা আছে বাবুর কথা তার চেয়েও শানানো। কথাটা সে মিথ্যা বলে না।

মাংস রান্না হচ্ছে দেখে চার বছরের ছেলেটা পা ছড়িয়ে উনুনের কাছে বসে আছে। আর তর সইছে না। নিজের অজান্তে সে কখন যেন উনুনের বড় বেশি কাছে গিয়ে বসেছে। ধোঁয়ায়, জ্বলন্ত কাঠের আঁচে তার চোখমুখ এখন লাল হয়ে উঠেছে। হাতের নড়া ধরে তাকে উনুনের কাছ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল পারুল। এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে সে আরও উনুনের কাছে সরে গেল। তার পেটের ভিতরের উনুনটা এতক্ষণ ধিকধিক করে জ্বলছিল। এখন তার আঁচ বেড়ে গিয়েছে।

পারুল ছেলেকে ঘাটে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় বাবুবাড়ির সকালের কাজ সেরে বিশু ফিরল। রোজ এসময়েই ফেরে। গোয়ালের মা-মরা এঁড়েটাকে ডোবায় স্নান করিয়ে তার মুখে কিছু খড়কুটো ফেলে দিয়ে সে নিজে স্নান সেরে আসে। আবার বাবুদের বাড়ি যায়। সেখানে বাবুদের গিন্নিমা গোয়ালে তাকে খেতে দেন। এঁটো এনামেলের বাসন গ্লাস বিশু নিজের হাতে ধুয়ে এনে বাবুদের দাওয়ায় রেখে আসে। তারপর আবার কাজ শুরু করে। একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বাড়িতে ডুব দিতে আসার সময় সে এর আগে কয়েকবার বাবুদের বাড়ির হাঁস বা মুরগি চুরি করে এনেছে। যেদিন সে তা আনে পারুলের কাজ বেড়ে যায়। হাঁস, মোরগ বা মুরগি বিশু নিজের হাতে ছাড়িয়ে কেটে কুটে দিলেও পারুলকে আবার রান্নার জোগাড়যন্ত্র করতে হয়। সেদিন খেতে দেরি হয়ে যায়। ছেলেটার তর সয় না। মাংস নামিয়েই তাই ওকে খেতে দিতে হয়। তা করতে বিশু এসে পড়ে।

লুকিয়ে হাঁস মুরগি আনার দিন বিশু দুপুরেই বাড়িতে খায়। গিন্নিমা এতে খুশিই হন। তিন পোয়া চাল বেঁচে যায়। বাড়ির মুনিষদের খেতে দিতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, তারা বেশি খায়। পেটটা তাদের জালার মতো। চুড়চুড় ভাত নিমেষে তারা শেষ করে। যত দাও তত ফুরিয়ে যায়। পাতে দিতে না দিতেই তারা তা শেষ করে ফেলে। গিন্নিমা তখন মনে মনে বলেন, বাড়িতে কী খাও তা তো জানি। পরের ঘাড় ভাইঙ্তে উস্তাদ। বাড়িতে ভালমানুষ পরের ঘরে ডাকাত।

বিশু আজ বলে এসেছে, শরীরটা ভাল নাই মা। খিদ্যা নাই। দ্যান, চানের ত্যাল দ্যান।

গিন্নিমা আগে একটা ছোট শিশিতে তাকে চানের তেল দিতেন। সে শিশি ঘাটে

নিয়ে গিয়ে মাথার চুলে তেল দিয়ে বিশু জলে নামত। খড়ি-ওঠা গায়ে সে তেল এক ফোঁটা দেবার আগেই ফুরিয়ে যেত। গিন্নিমা খুবই হিসেবি। শিশিতে তেল দিতে গিয়ে একদিন তাঁর মনে হল, বেশি তেল দেওয়া হচ্ছে। এতটা অপচয় সইবে না। সেদিন থেকে বিশুকে দুপুরের রোদে ঘর্মাক্ত শরীরে গিন্নিমার সমানে গিয়ে ডান হাতখানি পেতে দাঁড়াতে হয়। বিশুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাওয়ার ওপর থেকে গিন্নিমা বিশুর হাতের চেটোয় পিতলের ভাঁড় থেকে এক পলা তেল ফেলে দেন। সাবধানের মার নেই। একবার ছোঁওয়া লেগে গেলে বিশু জলে নামার আগেই গিন্নিমাকে পুকুরে গিয়ে নামতে হবে। স্নান সেরে কাচা যে শাড়িটা পরে তিনি বিশুকে তেল দিচ্ছিলেন সে শাড়িটাও তিনি তখন পরতে পারবেন না। দুবার স্নান করার ঝামেলা তো আছেই, তার ওপর যদি হঠাৎ সর্দি লেগে যায়। গিন্নিমা খুব শরীরসচেতন।

বিশু আজ আর গিন্নিমার সামনে হাত পেতে দাঁড়ায়নি। গোয়ালের চালের বাতায় শিশিটা গোঁজা ছিল। সেটাই সে আবার নিয়ে এসেছে।

আবার শিশি ক্যানে? আমি দিতে পাইরব না।

বিশুর মেজাজটা চড়ে উঠল। কিন্তু বাইরে সে তা বুঝতে দিল না। ইচ্ছে হল বলবে যে, আলবাৎ পারবে। বলল না। মেজাজটা সে ঠান্ডা রাখল। অকারণে গিন্নিমার এই সন্দেহবাতিকের সে যোগ্য জবাব দেবে ঠিক সময়ে। সামান্য এক ফোঁটা তেল নিয়ে এই কৃপণতা সহ্য করা কঠিন। সুদে-আসলে বিশু এটা তুলে নেবে।

শিশিতে হাতের চেটোতে যেখানেই দ্যান ত্যাল তো দিবেন সেই এক পলা!—বিশুর কথায় গিন্নিমা তেল দিলেন ঠিকই, কিন্তু তার আগে তাঁর সন্দেহটা প্রকাশ করতে ছাড়লেন না—

তেল তো তুমরা গায়ে মাখো না, বাড়িতে লিয়ে যাও। আজ দিচ্ছি, পরে পাবা না।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিশুর বলতে ইচ্ছে হল, গায়ে মাখবে কোন্ বুদ্ধু। গায়ে-মাখা তেলে মাংস রান্না হয়! সে কিছু বলল না। শিশিটা নিয়ে তার ঝুড়িতে রাখল। ওই ঝুড়িতে সে বাড়ির জন্য কাঠকুটো কুড়োয়, এঁড়ে বাছুরের জন্য সময় পেলে ঘাস কেটে রাখে। শুকনো কাঠকুটোর আড়ালে ওই ঝুড়িতেই সে কয়েকবার হাঁস মুরগি পাচার করেছে। ঝুড়িতে ফেলবার আগে সে অবশ্য ওদের গলাটা মুচড়ে দেয়।

এক পলা তেল, জল ও সামান্য নুন দিয়ে মাংস রান্না শেষ করে পারুল ছেলেকে খেতে দিতে না দিতেই বিশু ঘাট থেকে ফিরল। ফতুয়াটা শুকিয়ে এখন ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। আজ অবশ্য সে ধুতিটাও কেচে নিয়েছে। গামছা পরে পাড়ে বসে থেকে ধুতিটা শুকিয়েছে। ঘরে ফিরেই বিশু ছেলেকে ডাকল—তুর সঙ্গে কখনও খেতে বসি নাই। কী খাস তাও জানি না। আজ তুকে নিয়ে খেতে বইসব।

পারুল ওদের খেতে দিয়ে পাশে বসল। বিশু দেখল, মাংসের হোলাটা পারুল ওর সামনে রেখে ভাতের হাঁড়িটা দুরে সরিয়ে দিল। হাঁড়ি চেঁছেপুছে সব ভাতটাই পারুল ওদের দুজনের থালায় বেড়ে দিয়েছে। ভাত দেবার সময় পারুলের হাতের লোহার বালা

হাঁড়িটার কানায় লেগে ঠুংঠুং করে একটা শব্দ হচ্ছিল।

আর ভাত নাই। ভাত চাইলে পাবা না। যত খুশি মাংস খাও।

দেখে শুনে একটা বড় মোরগই হাত সাফাই করেছে বিশু। কিন্তু ভাতের সাশ্রয় হবে না তা সে ভাবতেও পারেনি। ভাবা উচিত ছিল। তা হলে অন্তত কারও বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে কিছুটা চাল জোগাড় করত।

তুমি খাবা কী। শুধু মাংস খাওয়া যায়?

পারুল উত্তর দিল না। মুখে গ্রাস তোলার সময় ছেলেটার হাত থেকে ভাত থালার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই এক জ্বালা। ছেলে খিদে-খিদে করে, কিন্তু এখনও নিজের হাতে ঠিকমতো খেতে পারে না। পারবে কী করে? খাবার পেলে তো খেতে শিখবে। থালায় তুলে ক'দিনই বা ওকে ভাত দেওয়া হয়েছে! পারুল এখন ওকে নিজের হাতে খাওয়াতে শুরু করল। হাড় কাঁটা বেছে মাংস তুলে দিতে থাকল মুখে। ছেলেটা এখনও ভালভাবে চিবোতে পারে না। ভাত মাংস সব জিভ নাড়িয়ে নাড়িয়ে গিলে খাচ্ছে। পারুলের চোখের নীচে কালি। মুখটা শুকনো। বিশুর চোখে ওই কালি, ওই শুকনো মুখ আরও ম্লান মনে হচ্ছে।

আমার থাল থেকে কিছুটা খেইয়ো। মাংস তো থাইকবে ; সেটাই বেশি কইরে খেইয়ো।

মাংস খাব নাই।

খাবা না ক্যানে। তুমার কথা ভেইবেই আমি মোরগাটাকে আইনল্যাম।

চুরি কইরেছ। আমি খাব নাই।

আগে তো খেইয়েছো।

রোজ তো লয়। খেইয়েছি একদিন। তাও জানি নাই চুরির ধন। যাদের বাড়ির নিমক খাও তাদেরই ধন চুরি কইরছো? পাপ লাইগবে।

বিশুর গলায় এখন ভাতের একটা দলা আটকে গেল। সে হাঁসফাঁস করে উঠতেই পারুল জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিল। জিভে মাংসের একটা টুকরো থমকে আছে। এই প্রথম বিশু অনুভব করল, মাংসে নুন কম।

যার জইন্যে চুরি কইরি সেই বলে চোর। ইতো জানা কথা।

আমার জইন্যে আর আইনবে না। আমি খাব নাই।

কেন খাবে না তা পারুল স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে। অথচ বিশু ওর দুবলা শরীরের কথা ভেবেই অনেক সময় বাবুদের বাড়ির হাঁস-মুরগিটা সরিয়েছে।

বাবুদের বাড়ির গরু, হাঁস, মুরগি ছাগল সবই তার হেফাজতে।

শ-দুয়েক হাস-মুরগি মধ্যে সবার অলক্ষ্যে একটাকে হাপিশ করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে-করতে বিশুর প্রায়ই মনে পড়ে তার বউ ও ছেলের কথা। দু বেলা সামান্য কয়েক মুঠো ভাত, তাও সে তাদের মুখে তুলে দিতে পারছে না। নিজের ওপর রাগ হয় তার। ঘৃণা হয় হাড়হদ্দ খাটতে খাটতে হঠাৎই রাগটা ধাঁ

করে মাথায় চেপে বসে। তখনই গিয়ে একটা হাঁস বা মুরগির গলা সে চেপে ধরে। তারপর সেই গলাটা মোচড়াবার সময় তার মনে পড়ে, উপায় নেই। আমাকে বাঁচতে হবে। বউ ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই দুনিয়ায় যে যাকে পারে নিঙড়ে নিচ্ছে। ন্যায় অন্যায় নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে চলে না। ভাল মানুষদের পায়ের নীচে পিষে মারার জন্য খারাপ লোকের অভাব নেই।

বিশুর ছেলের বয়স চার। তারপর আরও দুটি ছেলে পেটে এসে নষ্ট হয়েছে। যে ছেলেটি এখন পারুলের পেটে এসেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পারুলকে এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। দরকারি ওষুধপত্র খাওয়ানোর সামর্থ বিশুর নেই। আজ যাও-বা একটু মাংসের জোগাড় করল, পারুল তাও বলছে খাবে না। গা-গতরে মাংস লাগবে কী করে? শরীরটাই বা জোর পাবে কোত্থেকে?

ভয় করে। ধম্মনাশের ভয়। অনেক পাপ কইরেছি তাই দু-দুবার পেটের সন্তান লষ্ট হইল। আর লয়। তুমি খাও। তুমার শরীর খারাপ। রেতের জন্যও রাইখব।

বিশু আরেকটু মাংস নেবে ভেবেছিল। নিল না। বরং পাতে এখনও যে মাংস ছিল সেগুলো ছেলের থালায় তুলে দিয়ে উঠে পড়ল।

শুনো, রাগ কইরো না। পেটে খিদে রেইখে উঠতে নাই।

রাগ করি নাই গো, রাগ করি নাই। কাজে যেইতে হবে না?

শুনো, একটা কথা বলি। তুমার বাপের কথা মনে নাই? অতবড় ধাম্মিক লোক ই তল্লাটে নাই। তার খাতির লষ্ট কোরো না। ধাম্মিকের ব্যাটা কুকাজ কইরলে আরও বেশি কইরে পাপ লাইগবে।

পেটের মাংস ভাল করে হজম হবে না বিশুর। আজ বিশু বিদায়পুরের মুখুজ্জেবাড়িতে যে কাজ করছে সেই কাজই তার বাবা করত। বিশুর বাবা প্রহ্লাদ মাল। পারুল ঠিক কথাই বলেছে। তার মতো সৎ ও ধার্মিক মানুষ এ তল্লাটে নেই, অন্য তল্লাটেও সচরাচর মিলবে কি না সন্দেহ। ব্যক্তিগত জীবনে কালীভক্ত হলেও প্রহ্লাদের ধর্মবিশ্বাস কোনও পুজোআচ্চা বা অনুষ্ঠান-নির্ভর ছিল না। লোকে বলত, প্রহ্লাদ কী আর মানুষ! ও হল মা কালীর সন্তান। প্রহ্লাদকে নিয়ে একটি গল্পও এ অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত আছে। বিদায়পুরের মুখুজ্জেরা পুরোহিতের বংশ। বাড়িতে কালী ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাশাপাশি রেখে রোজ পুজো করা হয়। মদন, মানিক ও দ্বারিকের বাবা হৃদয় মুখুজ্জে যখন বেঁচে ছিলেন তখন বাড়িতে দুবেলা নানা গাঁয়ের লোকেরা এসে ভিড় করত। কুষ্ঠিঠিকুজী বিচার, নবজাতক জাতিকার কুষ্ঠি তৈরি, গ্রহশান্তি ইত্যাদি কাজে সবাই হৃদয় মুখুজ্জের শরণাপন্ন হত। মুখুজ্জেদের বাড়িতে গেলেই তখন একটা ধর্মীয়ভাব মনকে আপ্লুত করত। হৃদয় মুখুজ্জের বাড়ির মাহিন্দার ছিল প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ গোয়ালবাড়িকেও ঠাকুরঘরের মতো সব সময় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে রেখেছিল। প্রহ্লাদ সম্পর্কে প্রচলিত গল্পের সূত্রপাত এখানে।

হৃদয় মুখুজ্জে যখন বেঁচেছিলেন সে-সময় কল্যাণেশ্বরী মায়ের থানে দুর্গাপুজোর

মহাষ্টমীর সন্ধিতে একশো আটটি মহিষ বলি হত। ওই দিন মায়ের থানে বলিদানের জন্য একটি মহিষ পাঠানোর প্রথা মুখুজ্জে বাড়িতে বংশানুক্রমিকভাবে প্রচলিত ছিল। হৃদয় প্রতিবার প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণেশ্বরী যেতেন। বিদায়পুর থেকে হাঁটা পথে অজয় পেরিয়ে কল্যাণেশ্বরী ছিল কম করে পঁচাত্তর মাইল পথ। ষষ্ঠীর দিন সকালে হৃদয় মুখুজ্জে বেরিয়ে পড়তেন। পিছনে পিছনে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ মহিষটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেত। তার আগে অবশ্য কয়েকদিন ধরেই মহিষটির ঘাড়ে-গর্দানে দুবেলা তেল ঘি সে মালিশ করত। এই কাজে তার দক্ষতা ছিল প্রবাদতুল্য। কয়েক দিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তেল ঘি মালিশ করার ব্যাপারে প্রহ্লাদের কোনও ক্লান্তি ছিল না। সে তার এই কাজকে কালীর সেবা বলে গ্রহণ করেছিল। লোকেরা বলত, মহিষটা পুণ্য করে এসেছে। প্রহ্লাদের সেবায় তার শক্ত ঘাড় মাখনের মতো নরম হয়ে যেত। ছেত্তাদার চোখ মুদে এক হাতে খাঁড়া চালালেও পার হয়ে যাবে। এক চোটেই যথেষ্ট। প্রহ্লাদের সেবায় ঘাড়ে খাঁড়া পড়ল, না ফুলবৃষ্টি হল মহিষটা বুঝতেও পারবে না।

কিন্তু একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মহিষের গর্দানসেবায় প্রহ্লাদের কোনও ত্রুটি না হলেও এক চোটে সেবার তার মহিষ বলি হল না। সেদিন লক্ষণটাই ছিল খারাপ। হাঁড়িকাঠের দিকে মহিষটাকে নিয়ে যেতে যেতে প্রহ্লাদ বলল—যাও বাবা, বড় পুণ্যি কইরে এইসেছ। আগেই মা তুমারে ডেকে লিলেন। যাও, তুমার পিছে আমিও যাব। মাকে রোজ বলি আমাকেও ডেইকে লও গো। আমারও ডাক আইসছে গো। মায়ের বাগানে তুমি আমার জায়গা রেইখো। মহিষটা কিন্তু চার পায়ের খুরে শক্ত পাথরের মন্দিরচত্বর আঁকড়ে থাকল। কিছুতেই তাকে হাঁড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। মহিষের বাছুর। এমনভাবে সে ডাকতে লাগল যেন অবোধ শিশু মায়ের কোল ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। তার আর্ত চীৎকারের মধ্যেই প্রহ্লাদ স্পষ্ট 'মা' 'মা' ধ্বনি শুনতে পেল। পাগলের মতো সে তখন মহিষটাকে পিছন থেকে ঠেলেছে আর বিড় বিড় করে বলছে, উই তো মা, দেইখতে পাও না মা হাইসছেন। মা তুমাকে চান। তুমি মায়ের ব্যাটা। ছোট্ট মহিষশিশু হাঁড়িকাঠে গলা দিয়েও যতটা পারে বাধা দিয়ে গেল। ছেত্তাদারের প্রথম চোটটা হাঁড়িকাঠে লেগে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ফিনকি-ছোটা রক্ত প্রহ্লাদের মুখ চোখ ফতুয়া ভাসিয়ে দিল। বাছুরের পা সে তখন টেনে ধরে আছে। আরও টান দেবার আগেই দ্বিতীয় চোট মুণ্ডুটাকে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। হাঁড়িকাঠের এপারে ধড়টা ঝুপ করে পড়ে রক্তের ফোয়ারায় ধড়ফড় করতে লাগল ; তার পাশে তখন লুটিয়ে পড়েছে প্রহ্লাদের সংজ্ঞাহীন দেহ। শেষবার জ্ঞান হারাবার আগে সে শুধু বলেছিল, মা আমার দুষ কুথা? বরাকরের শ্মশানে তাকে দাহ করে হৃদয় মুখুজ্জে বাড়ি ফেরেন। তিনি নিজেই প্রহ্লাদের মুখাগ্নি করেছেন। প্রহ্লাদকে নিয়ে লোকেরা এরপর গল্প তৈরি করল যে, মা ওকে ডেকে নিয়েছেন। ব্যাটার মতো ব্যাটা মায়ের। তা না হলে তিনি তাকে অত দয়া করবেন কেন?

হৃদয় মুখুজ্জেও এরপর বেশি দিন বাঁচেননি। মা তাঁকেও দয়া করেছিলেন। তাঁর দেহ শ্মশানে দাহ করে এসেই তিন ভাই পৃথক হয়ে গেল। মুখুজ্জে বাড়ি থেকে

কল্যাণেশ্বরীর থানে বলিদানের মহিষ পাঠানোর রীতিও অতঃপর বিলুপ্ত হতে সময় লাগেনি। মুখুজ্জে বাড়ির ধর্মীয়, পবিত্র সেই পরিবেশও আর নেই। তিন ভাই শাস্ত্রচর্চা, পুজোআচ্চার চেয়ে জমিজমা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাতেই বেশি মন দিয়েছেন। কালী, রাধাকৃষ্ণ ও অন্যান্য বিগ্রহের দুরবস্থাই সবচেয়ে বেশি। ভাগের দেবতা পুজো পায় না। যে ব্রাহ্মণবাড়িতে এক সময় মুরগির মাংসভক্ষণ তো দূরের কথা, 'যবনদের খাদ্য' ওই প্রাণীটির প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল সেই বাড়িতেই এখন মহা উৎসাহে বিশেষভাবে মুরগি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুরগির বংশবৃদ্ধি হলে তা থেকে কার্যত মুখুজ্জেবাড়ির আয়বৃদ্ধি ঘটে। বাড়িতে বসে বসে মুরগির ডিম, মাংস ইত্যাদি বিক্রি করে নিয়মিত একটা রোজগারের পথ তো সুগম হয়েছেই, দরকারের সময় প্রোটিন খাদ্যও তাঁরা পাচ্ছেন। বাতিল, পঙ্গু মোরগ-মুরগিগুলো জবাই করে। মা কালী এখন এভাবে তাঁদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করেছেন।

প্রহ্লাদের ব্যাটা বিশুর অবস্থাও শোচনীয়। বাপের মতো না আছে তার ধর্মের আশ্রয়, না স্বাধীনভাবে রুজিরোজগারের ক্ষমতা। মুখুজ্জেদের বাড়িতে মাথা গোঁজাই সে নিরাপদ মনে করেছে। মাঝেমধ্যে অবশ্য একটা অপরাধবোধ তাকে পীড়া দেয় যখন সে ভাবে যে বউ-ব্যাটার জন্য কিছু করতে পারছে না। পারুলের চেহারা হয়েছে ক্যাঁকলাসের মতো। ছেলেটা যেন প্যাঁকাটি। ভাবলেই কষ্ট হয় বিশুর। কষ্টটা অবশ্য সাময়িক। কারণ এদেশের জল মাটি বাতাসের এমনই গুণ যে লোকেরা হাজার দুঃখকষ্ট মুখ বুজে সহ্য করে। পারলে নানা ফন্দিফিকির ও কৌশল করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। কিন্তু রুখে দাঁড়ায় না। দুঃখকষ্ট, অন্যায় ও অবিচারকে মুখ বুজে সহ্য করার ব্যাপারটাকেই পণ্ডিতেরা এদেশের বিশিষ্ট জীবনদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিতেরা জ্ঞানী। তাঁদের মতামত দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের ইনাম দেন। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে বেসরকারি পত্রপত্রিকাগুলোতেও লেখা হয় প্রশস্তি। চাপান-উতোরের আসরে তাঁদের হেনস্তা করবেন কোন কবি?

দুপুরে ডিউটি সারতে বিশু এখন মুখুজ্জেবাড়ি চলল। রোদটা বড় চড়া। মাথা ঘুরছে। বিশুর মনটা পারুল আবার দুর্বলও করে দিয়েছে। মিথ্যা কথা বলে এসেছে শরীর খারাপ। মিথ্যা বলার শাস্তি কি এখন হাতেনাতে ফলছে? না, মনটাকে কিছুতেই দুবলা হতে দেবে না বিশু। তাকে শক্ত হতে হবে। হতে হবে চালাক। নাহলে এখন মানুষ বাঁচবে না।

মদন মুখুজ্জের ধাড়ি ছেলেটা দালানকোঠার বারান্দায় খেলতে খেলতে বিশুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ওর হাতের খেলনা পিস্তলটা বেশ বেমানান। তবু সে পিস্তলটাকে সব সময় আঁকড়ে থাকে। এমনকি বিছানায় ঘুমোতে গিয়েও সে তা হাতছাড়া করে না। ওই পিস্তলটাই এখন বিশুর দিকে তাক করে ছেলেটা নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। বিশু ভাবল, ছোঁড়াটা কিছু দেখে ফেলেনি তো? তা দেখুক। মতলবের অভাব হবে না। প্রয়োজন হলে সে ঠিক উত্তরই দেবে। সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরটা সে আগেই ভেবে রেখেছে। বিশুর ভঙ্গিটা এমন নিরীহ যে সে চালাকি করলেও লোকে তা টের পায় না।

ধাড়ি ছেলেটা এখন ওর বাবাকে ডেকে এনেছে। দুপুরের কাঁচা ঘুম নষ্ট হওয়ায় মদন মুখুজ্জের মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে।

কিরে বিশু? শরীর খারাপ বইলে গিয়েছিস। তা খারাপটা কুথায় দেইখছি বাপু? পেট পুরে খেইয়ে, জিরিইয়ে এলি মনে হচ্ছে।

বিশু জানে এসব কথার কোনও উত্তর দিতে নেই। সে পায়ে-পায়ে মুরগির খাঁচার দিকে এগোল। মুরগিগুলোর খিদের শেষ নেই। সারাদিন কত খাবে? খাবার কি ওদের তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়? খাঁচার লোহার জাল ধরে বিশু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। খাঁচার ভিতরটা একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এক কোণে দুটো মুরগি চোখের ঘোলাটে পর্দা নামিয়ে দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ঝিমোচ্ছে। বিশুর মনে হল, এটা ঝিমুনির সময়। মানুষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ন্যায়, নীতি, প্রেম-ভালবাসা, ধর্ম, জীবনের যা কিছু ভাল—সব একে একে হারিয়ে যাচ্ছে। সাংঘাতিক একটা যন্ত্রণার সময়। কিন্তু মানুষ সে যন্ত্রণাটা টেরও পাচ্ছে না। তাকে যে রোগে ধরেছে তা বোঝার ক্ষমতাও মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। এমন নিশ্চিন্ততা আগে কখনও দেখা যায়নি যন্ত্রণার থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ চোখ বুজে আছে। হাসছে, খাচ্ছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে। আসলে একটা ঝিমুনি রোগ ধরেছে তাকে। এরপরই মৃত্যু।

বিশুর এখন আর রাগ হয় না। সে জানে না, বাগদিদের মধ্যে মালজাতি একদিন ছিল যুদ্ধব্যবসায়ী। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল মল্ল উপাধি। বিশু যদি তার এই জাতিপরিচয় জানত, যদি জানত তাদের গৌরবজনক ইতিহাস তা হলে নিশ্চয় সে কখনও না কখনও ফুঁসে উঠত। ফুঁসে ওঠার জন্য উপযুক্ত প্ররোচনার অভাব হয় না জীবনে।

মদন মুখুজ্জেকে বারান্দা থেকে নেমে পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিশু এবার চিৎকার করে উঠল হেইয়ো হুঁশিয়ার। ঝিমুনি লেইগেছে। আর লিস্তার নাই। কালী, রক্ষাকালী আমাদের বাঁচাও গো।

এই প্রথম সে মা কালীর নাম করল। তাও নেহাৎ মুখ ফসকে। ধার্মিক বা অধার্মিক সে কোনওটাই নয়। ধর্ম, ঈশ্বর—এসব যে কী বস্তু তা নিয়ে এখনও সে ভেবে ওঠার সময় পায়নি।

মনোরমা নিকেতন

দু'রকমের সকাল আছে। রৌদ্রোজ্জ্বল। সাদা মেঘ ও আলোর নীচে সবুজ ঘাস আরও সবুজ। সেগুনপাতা আরও সবুজ। দুমকা রোড ঝকঝকে তকতকে। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত কিছু ধোয়ামোছা, পরিচ্ছন্ন। লালমাটির ডাঙায় জল জমে না—কাদা হয়নি। গির্জার বাগানে ফুলের পাপড়িতে ধুলো লেগে নেই। টগর গাছের সতেজ ডালপালা। ডাকবাংলোর ঢালু ছাদের খড়ও আশ্চর্য হলুদ। ডেক চেয়ার পেতে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে জজসাহেবের স্ত্রী। তাঁর সাদা চুলগুলোও এখন সুন্দর লাগছে।

এই সকালগুলোতেই আমার বাড়ির সামনে দিয়ে সাঁওতাল মেয়েরা দল বেঁধে যায়। পরিচ্ছন্ন সকাল বলেই ওরা একঝুড়ি পাকা আম চার আনাতে বিক্রি করে, একটা মুরগি দশ আনা। জ্বালানির জন্য শুকনো শালের কাঠ কুটোর দাম তো ভীষণ সস্তা। বড় সাইজের খেড়ো দুটি কুড়ি পয়সা। ঝিঙে দশ পয়সা সের। ঝিঙের সবুজ ঝুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এক একটা পরিণত ঝিঙের গঠন কী সুন্দর!

এখন দুমকার দিকে বাস যায়। হিন্দীতে লেখা 'বন্দেমাতরম বাস সার্ভিস'। অথবা 'বিজয়ভারত ট্রান্সপোর্ট'। বনের মধ্যে পথেও মাটি ফুঁড়ে লোক এসে যায় বাসের জন্যে। সাতসকালে ওরা কোথায় যায়? এত মানুষ কোথায় যায়?

অন্য আরেক রকমের সকাল আছে। রোদ দেখা যায় না। রাত্রের মেঘ তখনও আকাশ ছেয়ে থাকে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। অথবা সশব্দে, তোড়ে। একটু একটু ঠান্ডা। জানলার পাল্লা বন্ধ করে কোনওরকমে জড়োসড়ো হয়ে বন্দেমাতরম বাস সার্ভিস যায় দুমকার দিকে। আমি জানলা থেকে দেখি। চকচকে বৃষ্টির ধারা (ফোঁটা নয়) দুধের ক্ষীরের মতো নেমে আসে মাটিতে। এই ধরনের বৃষ্টি ও আষাঢ়ের সকালের যা কিছু প্রয়োজনীয়তাই থাকুক না কেন—এইসব সকাল তুলনায় অনুজ্জ্বল, আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে থাকি। মৌজ করে তিনকাপ চা খাই, কিন্তু বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়েদের দেখা যায় না। পরম্পরাহীন অব্যাকরণিক বৃষ্টিধারা সকালের চরিত্র বদলে যায়। আমার বই পড়া হয় না। ডাকের চিঠিগুলো টেবিলেই পড়ে থাকে।

তিন রকমের বিকেল আছে। একেবারে হলুদ একটি বিকেল। ভীষণ, রকমের চকচকে খানিকটা সোনার মতো। আস্তে আস্তে এই হলুদ কালোর মধ্যে ডুবে যেতে থাকে। অর্থাৎ একজন আরেকজনের কাছে অস্তিত্ব সমর্পণ করে।

দ্বিতীয় বিকেল সম্পূর্ণ—স্বতন্ত্র। অল্প অল্প হাওয়া দেয়। হাওয়া সন্ধ্যার পর বাড়ে। অশত্থ ও সেগুনের পাতাগুলোয় ঝরঝর শব্দ হয়। ভিজে ঘাসের ওপর সেগুনের ফুল পড়ে

থাকে। মালবোঝাই ভারী দূরগামী ট্রাকের শব্দ করুণ, গভীরতা সঞ্চারক। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। দু'একজন ফাঁকা ধূ ধূ শালবনের দিকে গুটি গুটি পা চালায়। যারা এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ঠোঁটে উদ্দেশ্যহীন সিগারেট, ডাকবাংলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে। সিগারেট ভাল লাগে না এখন। পিচের রাস্তা টপকে আরেকটা রাস্তা সোজা চলে গেছে ময়ূরাক্ষীর ধার ঘেঁষে সুখজোড়া অবধি। লালপথ। দু-একজন ওই পথে নেমে খানিকটা এগিয়ে প্রতিদিন অন্ধকার নামতে দেখেছে। তিলপাড়ার বিশাল জলাধার কালোয় ঢাকা পড়ে। এমনকি ওপরের বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনিচু প্রান্তর বা শালদিগন্তের পৃথক চেহারা থাকে না। ভীষণ নিস্তব্ধ, থমথমে, বিরাট অন্ধকারের পটভূমিকা যারা দ্যাখে তাদের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। ভয় পেতে হয়। অনেকেই ওই অলৌকিক রহস্যময় নিশ্চুপ অন্ধকারকে সহ্য করতে পারে না। আমি সিগারেট খাই। বুকে ব্যথা হয়। ভয়াবহ অন্তিম রোগের কথা ভাবি এই বিকেলবেলা।

আরেক ধরনের বিকেলবেলা প্রাণহীন, নিস্পন্দ, ভৌতিক। মানুষ চলে ফিরে বেড়ায়—কিন্তু মনে হয় যেন কোনও প্রাণ নেই। বিষণ্ণ এই বিকেল। সমস্ত কিছুই কেমন যেন অর্থহীন, গোলমেলে। ভূতগ্রস্ত। গ্রীষ্মের মন্থর দীর্ঘ বিকেলের কথা মনে পড়ে। ধূসর শ্লেটের মতো আকাশ। ম্যাসেঞ্জোরের দিকটা ধোঁয়াটে। দূরের গ্রামের নাম মালচন্দন। ওখানের নত টিনের চালগুলোও স্পষ্ট দেখা যায় না। কালো ছায়ার মধ্যে এই বিকেলে আমার মন খারাপ করে। দূরের আত্মীয়দের কথা মনে পড়ে। ভীষণ একা মনে হয় নিজেকে। মা বাবা স্ত্রীর কাছে থেকেও মনে হয় একা। আসলে আমি কী চাই নিজেও জানি না। ঘুষঘুষে এই জীবন নিয়েই আমার যত ঝামেলা। আমি গম্ভীর, লাজুক, অন্যমনস্ক। আমি মাছের মতো একএকবার ভুস করে ভেসে উঠি—আবার ডুবে যাই।

সুধীনের বাবা মারা গেছেন গতকাল। কীভাবে ওকে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারি না। ওর মন ফাঁকা। রৌদ্রের দরজা ওর কাছে খোলেনি। সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে সোনালি রোদ নাচছে না। গির্জার লাল দেয়ালটা লাল নয়। সাঁওতাল মেয়েরা হাঁটুর কাপড় তুলে চাবিজাল বাঁধের জলে নামায়নি। আজ কুচোচিংড়ি পাবদা খয়রার সমৃদ্ধ ডালা ওর কাছে অপ্রয়োজনীয়। পেটে ডিম সমেত যে পাকা লাল রুই মাছটা এইমাত্র ধরা পড়ল সিউড়ির বাজারে নামতে নামতে তার দর চড় চড় করে বেড়ে পাঁচটাকায় দাঁড়িয়ে গেল—কিন্তু সুধীনের মন এসবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না। সংযোগকে আমি আনন্দ বলে মনে করি, যখন আমরা একা তখন দুঃখী। ঘরের কোণে—সুধীন একটা অ্যাশট্রে হয়ে যায়—রাজ্যের ছাই উড়ে এসে পড়ে ওর ওপর। ও জানতে চায় কেন মৃত্যু, কেন বিনাশ ও ক্ষয়। মৃত্যু সম্বন্ধে আমার ধারণা নিম্নরূপ : —

১. আমার একটা যাদুঘর আছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের সুধীর ফৌজদার অবলুপ্ত দশাবতার তাসের চমৎকার একটি সেট আমাকে দান করেছেন। বীরভূমের পানুড়ে ও ইটাগুড়িয়া গ্রামের বৃদ্ধ ভক্তি চিত্রকর ও সুকুরুদ্দিন মিস্ত্রী আমাকে দিয়েছে পট। আমার সংগ্রহে আছে বহরমপুর কাঁঠালিয়ার পুতুল সাঁওতালী মুখোশ, পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির

ঘোড়া বাঘ হাতি ইত্যাদি। কাচের আলমারির সামনে থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু। এই পৃথিবীটা কি একটা কাচের আলমারি নয়? (ঘষা কাচের বদলে স্বচ্ছ কাচ)।

(সুধীন অবসন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আমার কথাবার্তা ওর কানে যায় না। আমি মেঝের ওপর অমৃতবাজার পত্রিকার সর্বশেষ মফঃস্বল সংস্করণ—দু পাতা বিছিয়ে দিয়ে ওকে শুইয়ে দিই)।

২. বিকেলেই প্রকৃষ্টভাবে মৃত্যুচেতনার উপলব্ধি হতে পারে।

৩. আমাদের যৌনবোধ যেদিন শেষ হয় সেদিনই আমরা মৃত্যুকে জানতে পারি। মৃত্যু সদর দরজায় ট্যাক্সি হাঁকিয়ে আসে না। বুকে সামান্য একটু ব্যথা হলেও জানতে হবে সে আছে। সে অপ্রতিরোধ্য।

বাবা মারা যাবার পর সুধীন কয়েকদিন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করল না। এর আগে প্রতিদিন তিনবার সহবাস করেও তার তৃপ্তি হত না—ভীষণভাবে দেহ আঁকড়ে থাকতে চাইত। এখন কেমন যেন উদাসীন—কয়েকবার হাই তুলে আবার সে পাশ ফিরে শোয়।

আমি জানি এ আরেক ধরনের মৃত্যু। শোক মানুষকে মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করে। শোক পবিত্র। বিশাল বটবৃক্ষের ছায়া অপসারিত হয়েছে সুধীনের চোখের সামনে থেকে—কিন্তু বিষাদ তাকে ভ্রষ্ট করেছে। স্ত্রীর ঘিলুর কাছাকাছি যাবার যোগ্যতা এখন তার নেই। বিষাদ বা বেদনার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সুধীন কোনও অর্থেই মৃত্যুর ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না।

সে জীবনে কোনও দায়িত্বই পালন করেনি। কর্তব্যজ্ঞানের যে অভাব ছিল তা নয়, বাবা সমস্ত কিছু আড়াল করে রেখেছিলেন। তাঁর তৈরি অট্টালিকার একটি ইঁটও তার পক্ষে গাঁথা সম্ভব হয়নি। দায়িত্ব পালন ও কর্তব্যজ্ঞানের মধ্যে যে আনন্দ থাকে তা সে মুহূর্তের জন্যেও টের পায়নি। স্বপ্নে দেখল সে তার অপরাধের শাস্তি পাচ্ছে : সে মারা যাবার পর মৃত্যু একটা মহিষের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে পুরুষ ও প্রকৃতির রহস্যোন্মচন কর। 'পুরুষের' অর্থ যে সচেতনতা ও 'প্রকৃতি' শক্তি তা সে ভুলে গেল। তার পিঠের উপর চাবুক পড়ছে—প্রকৃতি তার ওপর নগ্ন ভয়ঙ্করী হয়ে শুয়ে আছে, হাতে থেঁতলে যাওয়া ফুলের মালা। প্রদীপের শিখার মতো সোনালি উন্মুক্ত একটা দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে। তার শরীর থরথর করে কাঁপছে, ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে—বাধা দেওয়ার শক্তি তার নেই, এবং প্রকৃতি তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিচ্ছে। রক্তক্ষরণ না হওয়া পর্যন্ত সে ক্লান্ত হল না। তারপর প্রকৃতির সে কী শান্ত মোহময়ী চেহারা। পুজো করতে চলেছে সে।

আমি দেখেছি গ্রামের পদ্মকে। আশ্চর্য শ্যামল একটা শরীর। পুরুষের হাত পৌঁছয়নি শরীরে। কিন্তু দেখলেই শিরা জ্বলে উঠে। কামনা জাগে। পটল দুর্গাপুরে স্টেটবাস চালায়। ওর দাদা অফিসার। ঢুকিয়ে দিয়েছে। পুজোর সময় দাদা বৌদি ছেলেপুলে গ্রামে এসেছে। বাসাবাড়ি দেখবে পটল। পরের দিন সকালে সেও চলে এল। পদ্মকে বলল—

তোমার জন্যে এলাম

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছিল কখন তাকে একা পাওয়া যাবে!

পদ্ম হেসে ওঠে। ফুলে ফুলে উথলে উঠছে শরীর। ছটফটে মেয়ে। এক মিনিটও স্থির থাকে না—পটলের আরও ভাল লাগে।

নতুন মোজা কিনেছি দেখবে?

মোজার কী রং! মোটা মোজা! বিশ্রী!

ভেঙচি কাটার মতো এক ধরনের শব্দ করে ওঠে পদ্ম। পটল চেপে যায়। সুযোগ খোঁজে কখন এর পাল্টা দেওয়া যাবে।

দুধ ছানা কেটে গেছে, জোগাড় করে চা আনতে দেরি হল।

চায়ের কী রং, এত দেরি হয় বুঝি চা করতে!

পাল্টা নেওয়া হচ্ছে বুঝি!

পদ্ম হাসে। বুক কোমর দুলে ওঠে। টিয়ারঙের শাড়ির আঁচল লুটোয়।

আমি বেশিদূর পড়তে পারিনি। কেউ যদি পড়ায়, পড়ি।

পদ্ম পড়াশুনোয় ভাল। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে পটল।

ধরো যদি জমি চাষ করি, চাষবাস কি খারাপ কাজ?

শেষ পর্যন্ত পটলের বিয়ে হল। পদ্ম তখনও হাসছে

ওই লোকটার বিয়ে?

এবং একজনের জীবন থেকে আরেকজনের মৃত্যু এইভাবে সংঘটিত হয়। পদ্মর স্বামী আমি, শরীরটাকে ভেড়ার মাংস চিবানোর মতো খাই। চমৎকার ইন্দ্রিয়সুখে আমার দুপুর, রাত্রি কাটে! প্রায়ই ব্লাউজের ব্রেসিয়ারের বোতাম ছিঁড়ে ফেলি। ক্লান্ত হই না।

কিন্তু অকারণে একেকদিন বিষণ্ণ হয়ে যাই। কোনও কিছু ভাল লাগে না। মনোরমা নিকেতনের বাইরে আম ও সেগুন গাছ, গির্জা, দুমকা রোড্, জানলা বা জানলার ফ্রেম সবই যেন কেমন অর্থহীন। সুনীল জানলার অনেক অনেক দূরে ভেসে যায়। ফ্রেম আটকে থাকে। এই ফ্রেম আমার ফাঁসিকাঠ!

ফলের সবুজ কঠিন অবস্থা থেকে পেকে ওঠার মতো পরিণতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে জীবন। উদয়অস্তহীন নক্ষত্রসূর্য গ্রহচন্দ্রতারকার মহাস্তম্ভের সঙ্গে মিলিত হবার দরজাকে মৃত্যু বলে জেনেছি। কিন্তু ঈশ্বরের দেখা পাই না। ঘরে থেকেও ঘরের মালিকের খোঁজ নেই। তিনি কোথায়? তাঁর আঙুলের স্পর্শ পাবার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষায় আমি ভিতু দরিদ্র মানুষ ভয় পাই। তিনি বিরাট, তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে?

হয়তো তিনি বৃষ্টি, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছেন পৃথিবীতে। কী আনন্দ, কী পরিপূর্ণতা! জলসেচন হয়েছে আমার অন্তরে। আমার শরীরের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছে। শরীরের ফুলগাছ মঞ্জরিত। পড়ে-থাকা বৃষ্টিজল, পৃথিবী ও গোবরের ঘ্রাণের সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গেছি। সৃষ্টি ক্ষীরসমুদ্রে ভাসছে, সেই সঙ্গে আমারও।

আমি ও পদ্ম গভীর রাত্রে পথে বের হই। আমার খোকনকে নিয়ে পরীরা উড়ে

যায় স্বর্গের বাগানে। আমরা দুজন ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াই। কিন্তু সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয় ; কখনও বিষণ্ণ হয় না—খায় দায়, কাজ করে, গান গায়। আমার কাজও নেই, শান্তিও নেই। সব সময় ব্যর্থ কাজের তাড়া মনের মধ্যে—দুর্বিষহ অস্থিরতা। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আমি সকলের তীব্র নাক ডাকার শব্দ শুনি।

কাজানতাজাকিসের মতো পদ্ম আমাকে জানায়, যারা সংসারধর্ম প্রতিপালন করছে, সদানন্দময়—যারা মা বাবা স্ত্রীপুত্র ভাইবোন নিয়ে সম্পূর্ণ, তারা ভগবানকে যেমনটি চেয়েছিল পেয়েছে ; ওরা এখন রাত্রে খাবার খেয়ে দুশ্চিন্তাহীন ঘুমোচ্ছে।..

সেই রাত্রে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় আমি লক্ষ করি, আমার ঈশ্বর বিছানার পাশে বসে থেকে কপালে হাত বুলিয়ে ওদের ঘুম পাড়াচ্ছেন।

বটগাছের ছায়ার একটু অংশ

কাছারির পাশে বুড়ো বটগাছের ছায়ায় পুলিনই প্রথম টাইপরাইটার নিয়ে বসে পড়েছিল। দেখতে দেখতে তা প্রায় দশ বছর হতে চলল। পুলিনের দেখাদেখি তারপর আরও দশ বারোটা টাইপরাইটার চলে এসেছে কোর্টের আশপাশের গাছতলায়। তবে বুড়ো বটগাছ ওই একটাই। ভাল টাইপ জানা লোকও একজন, তা ওই পুলিন। দলিল দস্তাবেজ, হলফনামা, সার্টিফিকেট, স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের মার্কশিট, চাকরির দরখাস্ত ঝড়ের গতিতে নির্ভুলভাবে সে টাইপ করে দেয়। তাই মফস্বল এই শহরের কাছারিপাড়ায় পুলিনের টাইপের চাহিদাই বেশি।

হাকিমরা এজলাসে এসে পৌঁছনোর আগেই গাঁ-গঞ্জের মানুষ মামলা-মোকদ্দমার কাজে সকাল সকাল শহরে চলে আসেন। উকিলবাবু এজলাসে উঠবেন। সকাল সকাল তাঁর বাড়ি গিয়ে কিছু টাকা পকেটে গুঁজে দিতে হয়। উকিলবাবুর মুহুরিকেও কিছু টাকা দেবার নিয়ম। নানা বয়ান, নানা নথি টাইপ করারও ঝক্কি ঝামেলা থাকে। তবে পুলিনের হাতে নথিপত্র জমা দিয়ে এলে আর চিন্তা নেই। সময়মতো সে কাজ বুঝিয়ে দেবে। ততক্ষণ হালুইকরের চালাঘরে গিয়ে চা সিঙাড়া লেডিকেনি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে নাও। মৌজ করে ধরাও সিগারেট। বসে বসে সুখটান দাও। চাই কী, গল্পগুজবও করতে পারো। ওদিকে পুলিন ওর কাজ করে যাচ্ছে। চিন্তা নেই। হাকিম এজলাসে ওঠার আগেই ঝরঝরে টাইপ-করা কাগজপত্র মক্কেলের হাতে এসে যাবে। এই শহরে উকিলবাবুদের মক্কেলরা পুলিনেরও মক্কেল।

পুলিন সবাইকে চেনে। দশ বছর তো কম সময় নয়। এক একটা মামলা শেষ হতেও পাঁচ-ছ'বছর লেগে যায়। আবার দশ বছরেও মামলার শুনানি শেষ হয়নি এমন কেসও সে কম দেখেনি। যত মামলা, তত লোকজন। সবাইকে চেনে পুলিন। যাবা তার কাছে টাইপ করাতে আসে তাদের তো চেনেই, এমনকি যারা অন্য টাইপিস্টদের কাছে যায় তাদেরও তাকে চিনে রাখতে হয়। কারণ লোকগুলো দু'চার হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আসে। মাথা নিচু করে ঘাড় গুঁজে টাইপ করতে করতেই পুলিন জেনে যায়, কোন লোকটির বিষয়বুদ্ধি বেশি, কোন লোকটি মামলাবাজ, অন্যের মামলা কিনে নেয় কে, আর কেই বা স্রেফ বিষয়বুদ্ধির অভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

কানাইকাকা, নদী পেরনোর সময় একেবারে হুঁশ ছিল না দেখছি।

কী করে বুঝলে পুলিন?

তা হলে দলিলটা ভিজল কী করে। মুন্সেফেব সই তো জলে একেবারে লেপে গেছে।

দলিল বলে কথা। জলে ভিজবে কী করে। কাঁধের এই ঝোলাটা দেখছ তো? দশ বিশটা মামলা পার করে দিল আমার এই কাঁধের ঝোলা। সব কাগজপত্র তো এর ভেতরেই থাকে।

ঝোলাটা তা হলে নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল। না হয় তুমি যখন পাটাতনে বসেছিলে তখন ঝোলাটা নিচু হয়ে জলে গিয়ে পড়েছিল।

তা হবে। ঘাটে যা কাদা। তক্তা দিয়ে নৌকোয় ওঠার সময় নৌকোটা টালমাটাল হয়ে গিয়েছিল। আমিও জলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তা, কোনওরকমে সামাল দিলেও কাঁধের ঝোলাটা কিন্তু ঝুপ করে পড়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীকান্ত অবশ্য তক্ষুনি ওটা তুলে নেয়। দলিল ভেজার তো কথা নয়।

কথা নয়। কিন্তু ভিজেছে। এই দ্যাখো। জলে-ভেজা দলিল ও মালঞ্চনগরের কানাই মণ্ডলের অন্যান্য কাগজপত্র ওর হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় পুলিন দেখাল।

আমার অবশ্য টাইপে কোনও অসুবিধা হয়নি। হাজার হলেও টাইপের কালি তো। জলে ধ্যাবড়া হয়ে যায় না।

কানাই মণ্ডল দেখল, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পুলিন মিথ্যে বলেনি। এপারের পারঘাটায় পৌঁছে সে দেখেছিল দলিলেব শেয পাতা, যেখানে হাকিমরা সই সাবুদ করেন, জলে ভিজে গেছে। না, এরপর আর সে কখনও এরকম অসতর্ক হবে না। নামে বেনামে প্রায় দেড়শো বিঘের মালিক হয়ে তার বোঝা উচিত ছিল, যতক্ষণ কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকবে ততক্ষণই এই জমির দাম। কাগজের ওপরেই এই দেশটা চলছে। কাগজ যার ঝকঝকে তকতকে থাকবে দেশটা তারই।

দলিল টাইপের রেট বেশি। সেই সঙ্গে কানাই মণ্ডল আরও কিছু দরখাস্তও টাইপ করিয়েছে। লং ক্লথের পাঞ্জাবির বুকের দু'টো বোতাম খুলে ভিতর পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে আনল কানাই।

নাও, দু'টো টাকা ফেরত দাও।

দু'টাকা? তোমার দলিলটাই তো চোদ্দ পাতার। তিনটে দরখাস্তও টাইপ করিয়েছ। ওই দশটাকাই লাগবে।

মাসের পর মাস এত টাইপ করাচ্ছি। আমার কাছে তো তোমার কম টাকাই নেওয়া উচিত।

কমই তো নিচ্ছি।

কোথায় কম? মাত্র দু'টাকা কম করলে কি মরে যাবে?

দু'টাকা যদি 'মাত্র' হয় তা হলে ওই সামান্য টাকাটাই বা কেন তুমি ছাড়তে পারছো না কানাইকাকা?

পুলিন কথাটা বলতে গিয়েও পারল না। দরদাম করতে তার ভাল লাগে না। এইভাবে কত টাকাই তার চোট গিয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে কখনও কিছু বলতে পারেনি।

সবে কাছারিতে এলাম। ভাঙানি নেই। তুমি ভাঙিয়ে দিয়ে যেও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটাই ভাল। আমি এসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

কানাই হন হন করে এজলাসের দিকে এগিয়ে গেল। একবার চোখ তুলে তাকাল পুলিন। কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই আবার টাইপরাইটারে নতুন কাগজ পরাতে শুরু করল। থেমে থাকলে তার চলবে না। সে থেমে থাকলে এজলাসের কাজকর্মও থমকে দাঁড়িয়ে যাবে। ঝড় উঠল টাইপরাইটারে। এবার মামলার ডিক্রির 'ট্রু কপি'।

এবার তুমি বাদী না বিবাদী? ফরিয়াদিই বা কে? চেনা লোকগুলোকে এক একবার প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয় পুলিনের। পড়শির বাড়িতে আগুন লাগিয়ে এসে আদালতে দাঁড়িয়ে বলছ না তো হুজুর ধর্মাবতার, আমি নির্দোষ? কিন্তু ইচ্ছেটা আর মুখের ভাষার রূপ নেয় না। সে টাইপিস্ট। টাইপ করে যাওয়াই তার কাজ। লোকগুলো তাদের গোপন দলিলপত্র নিশ্চিন্ত মনে তোমার হাতে সমর্পণ করছে। টাইপ তুমি বিনি পয়সায় করছ না। ওরা তোমাকে মজুরি দিচ্ছে। নিজেকে শাসন করে পুলিন। কিন্তু আমার ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে ওরা যে আমার পারিশ্রমিক ঠিকমতো দিচ্ছে না, পরিশ্রম করে ন্যায্য রাস্তায় আমি যে আয় করি তাতেও ভাগ বসাচ্ছে। নিজেকে সে আবার প্রশ্ন করে। ভদ্রতার একটা মাশুল আছে। আমাদের সমাজে নানাভাবে তা মেটাতে হয়। ধরে নাও এটাও তোমার ভদ্রতার মাশুল। টাইপরাইটারের অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে রোগা লিকলিকে আঙুলগুলো চালাতে চালাতে পুলিন এরপর ওর মক্কেলদের মুখের দিকে তাকানোই ছেড়ে দেয়। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যা তার স্বভাবে নেই তা পারবে কেন?

দু'টো মার্কশিট টাইপ করতে কত লাগবে? এবার আর চেনা গলা নয়, চেনা মুখও নয়। পুলিনের নড়বড়ে টুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মোটা তাঁতের শাড়ি। সাদা জমির ওপর ছোট ছোট সবুজ বুটি। ম্যাচ করা সবুজ ব্লাউজ। যতটা পারা যায়, ততটাই প্রসাধন মুখে। অর্থাৎ সবুজ টিপ আর হালকা পাউডার। বয়স বেশি নয় সবে কলেজে ঢুকেছে মনে হয়।

দেখি মার্কশিট।

মার্কশিট আর দেখার কী আছে। কত লাগবে বলুন না।

দেড় টাকা।

দেড় টাকা?

সবাই তো তাই দেয়। বেশি চাইব কেন?

না, না। আপনি বেশি চাইছেন না। আমি ভেবেছিলাম টাকাখানেক লাগবে। ঠিক আছে আমি বরং ঘুরে আসি।

মার্কশিট দুটো দিয়ে যাও। আমি টাইপ করে রাখব।

একটু পরেই ঘুরে আসছি।

টাইপ করতেও তো সময় লাগবে।

শুনেছি আপনার বেশি সময় লাগে না।

কিছু সময় তো লাগেই। তাছাড়া মার্কশিট, একটু ভুল হয়ে গেলেই—

মেয়েটি কী যেন বলতে গিয়ে থেমে যায়। পুলিন হেসে ফেলে। এক টাকার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই মেয়েটির। মানে তার অভিভাবকের। সে তো রোজগার করে না।

তুমি এক টাকাই দিও।

মেয়েটিও হেসে ফেলে। তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে যায়।

দেড় টাকার কাজ, আপনি এক টাকায় করবেন কেন? করা উচিত নয়।

তোমার তো মার্কশিট দুটো টাইপ করানো দরকার। তাই না? দাও, হাতে কাজ জমে ওঠার আগেই আমি চটপট তোমার কাজটা সেরে নিই।

ভাঁজ-করা মার্কশিট দুটো হাতের ব্যাগ থেকে বের করল মেয়েটি।

জানেন, চোখ বন্ধ করে টাইপ করতে পারলে খুব ভাল হ'ত। যা নম্বর পেয়েছি, তা আর কাউকে দেখানো যায় না।

ভাঁজ-করা দু'টুকরো কাগজ—দুটো মার্কশিট। মেয়েটির বা এরকম আরও সবার ভবিষ্যৎ শুধু শুকনো কয়েক টুকরো কাগজের ওপর নির্ভর করছে এটা ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায় পুলিনের। দশ বছরে আর কিছু না হোক, অন্তত হাজারখানেক মার্কশিট সে টাইপ করেছে। মার্কশিট যারা টাইপ করাতে আসে, তারা কোথায় যায়? বড়জোর বছরখানেক। তারপরই আর কারও সঙ্গে তার দেখা হয় না। তারা কি সবাই উঁচু কলেজে ভর্তি হয়, চাকরি পায়? নাকি ঘুরতে ঘুরতে একদিন হতাশ হয়ে তারই মতো কোনও একটা জীবিকা বেছে নেয়? ছিটকে সরে যায় এই শহর থেকে দূরে, অন্য কোথাও? অন্য কোনও শহরে?

ম্যাট্রিকে ইংরেজিতে পঞ্চাশের ঘরে নম্বর পেয়েছিল পুলিন। কিন্তু আই এ ক্লাসে ইংরেজিতেই ফেল করল। ফেলের দায়িত্বটা তার নিজের। এ দায়িত্ব সে অন্য কারও ঘাড়ে চাপাতেও চায়নি। আসলে ইংরেজির পাঠ্য বইগুলোই সে কখনও মেনে নিতে পারেনি। পড়ে আনন্দ পেত না। তবে ফেল করবে এটা সে কখনও ভাবেনি। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় সে তার শোধ তুলেছিল। কিন্তু সে পরীক্ষার তো দাম নেই। যত নম্বরই পাও লোকে বলবে 'কম্পার্টমেন্টালে পাস'। বাবা হঠাৎ অন্ধ হয়ে গিয়ে তাকে এই পড়াশোনার যন্ত্রণা থেকে অবশ্য মুক্তি দিয়েছেন। ছানি অপারেশনের পর সবাই চোখে দেখতে পায়। কিন্তু পুলিনের বাবা একটি চোখ নয়, দু'দুটি চোখই হারালেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে নাকি এর ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যা থাকলেও মৃত্যুঞ্জয়বাবু তো আর চোখ ফিরে পাবেন না। ডাক্তাররা নির্বিকার। তবে পুলিন কানাঘুষোয় শুনেছে, হাসপাতালের নোংরা ব্যান্ডেজ-তুলো-ভেজাল ওষুধপত্র বাবাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

এখান-সেখান থেকে টাকাটা বাবাই পুলিনকে জোগাড় করে দিয়েছেন। সেই টাকাতেই পুরনো একটা টাইপরাইটার কিনে কোর্ট প্রাঙ্গণে বসে বড়ল পুলিন। চাকরি নয় যে আছে প্রোমোশন, কিংবা বছর শেষে বাঁধাধরা ইনক্রিমেন্টের হাতছানি। মা তবু পুলিনের এই জীবিকার মধ্যেই রঙিন কোনও ভবিষ্যতের হাতছানি দেখেছিলেন। প্রথম যেদিন সে এই জীবিকা শুরু করল, মা সেদিন কালীবাড়িতে পুজো দিয়েছিলেন। প্রসাদী মিষ্টি পুলিনের মুখে গুঁজে দিয়েছিলেন মা। বাবা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। রিক্সা ডেকে টাইপ-রাইটারটা তুলে দিল পুলিন। তারপর বাবাকে গিয়ে প্রণাম করল। বাবার চোখে সেই প্রথম এক ফোঁটা জল সে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। পুরুষকে গুমরে কাঁদতে হয়। নীরব কান্নার চেয়েও আরও মর্মান্তিক সেই যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ।

টাইপরাইটারে হাত গুটিয়ে ভীষণ মন খারাপের মধ্যে সেদিন বসেছিল পুলিন। এই কোর্টের পাশ দিয়ে কতবার সে কলেজে গিয়েছে। উকিল, দাবোগা, সিপাইদের চলাফেরা করতে দেখেছে কতবার। কিন্তু নিজেকেই যে একটা চরিত্র হয়ে এখানে বসে পড়তে হবে একদিন, তা সে কখনও ভাবেনি। এভাবে ভাবতেও পারে না মানুষ। না পারাটাই ভাল। জীবনে ছক মিলিয়ে চলতে শেখা ঠিক নয়।

দেখতে দেখতে দলিল দস্তাবেজেব সব ভাষাই একদিন পুলিনের মুখস্থ হয়ে গেল। চাকরির দরখাস্তও সে কম টাইপ করেনি এই ক'বছর। এসব দরখাস্তেরও একটা বাঁধাধরা গত আছে—আই স্যাল বি অবলাইজড ইফ ইউ কাইন্ডলি ..। চাকরি যারা দেয় তারা যেন তোমাকে কৃতজ্ঞ করার জন্য বসে আছে।.. .তবু টাইপ কবতেও হয় এসব দরখাস্ত। দরখাস্ত ছাড়া চাকরি কি পাওয়া যায়, নাকি কেউ দেয়? সুতরাং ওরা দরখাস্ত লেখে, পুলিনও টাইপ করে—। মার্কশিটের সময় শুধু এক একজনের নম্বরটাই বদলে যায়। বাকি সব এক।

মার্কশিট নিয়ে প্রথমে মেয়েটির নাম দেখল পুলিন। কৃষ্ণা ঘোষ।

তুমি তো দেখছি আমাদের এখানের ছাত্রী নও।

স্কুলে পড়েছি।

ও হ্যাঁ, তা তুমি প্রীতি, সুলতা, রুনুদের ব্যাচ?

ওদের আপনি চেনেন?

চিনব না কেন? এই শহরটা বুঝি খুব বড়?

তা হলে আমাকেও আপনার চেনার কথা।

তুমি বর্ধমানে বি এ পড়তে চলে গিয়েছিলে।

কিন্তু এখানের স্কুলে তো পড়েছিলাম। প্রীতি ও রুনু আমার বন্ধু।

তুমিও যেমন। আমি কাউকে চিনি না। আমি ওদের মার্কশিট টাইপ করেছিলাম। রুনু অঙ্কে পেয়েছিল তেষট্টি, প্রীতি ইংরেজিতে বিয়াল্লিশ, বাংলায় একান্ন, সংস্কৃতে--

সংস্কৃতে কত পেয়েছিল বলুন তো?

কত পাযনি বলতে পারি। দু'নম্বরের জন্য লেটার পায়নি।

সব আপনার মনে থাকে? তাই না?

ভুলি না। হঠাৎ আজ মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে হুবহু মার্কশিটগুলো দেখতে পাচ্ছি।

আর ওদের চেহারা? বলুন দেখি রুনু কেমন দেখতে?

রোগা ফর্সা চেহারা। চোখে চশমা। বাঁ-চোখের নীচে কাটা দাগ।

খুব কৌতূহল আপনার।

কেন?

নাহলে এত খুঁটিয়ে কারও চেহারা মনে থাকে?

হ্যাঁ, কৌতূহল ছাড়া কী! আসলে আমি যেভাবে দেখি, অন্যরা তো সেভাবে দেখে না। পরিচয়ের পথটাও আমার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চওড়া। নানা ধরনের মানুষ সেখানে আসা যাওয়া করে।

আপনার কি দেখার আলাদা চোখ আছে ? আসলে এটা আপনার স্মৃতি।

না, না। দেখার চোখ। স্মৃতি তো পরের কথা। টাইপিস্টের জীবনের বদভ্যাসও বলতে পারো। প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দের উপর চোখ রাখতে হয। না হলে ভুল হতে পারে।

কৌতূহল এবার কৃষ্ণারই হচ্ছে। ঘাড় গুঁজে পুলিন টাইপ করতে শুরু করেছে। ঝড় উঠেছে টাইপরাইটারে, বটের ছায়ায় সেই ঝড়ের শব্দ আশেপাশের অনেকখানি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিন আর তার এই টাইপরাইটার না থাকলে সমস্ত এলাকাটি ম্লান হয়ে যাবে। শূন্যতার সৃষ্টি হবে।

এত শব্দ কেন আপনার টাইপরাইটারে?

একটু আগেই বলছিলে না আমার খুব কৌতূহল? তোমারও কিছু কম নয় দেখছি।

টাইপ করা মার্কশিটগুলো কৃষ্ণাকে এগিয়ে দিল পুলিন।

কয়েকটা কার্বন কপিও করে দিলাম। পরে কাজে লাগতে পারে।

কী দরকার ছিল এতগুলো কার্বন কপির? দু'কপি করে পেলেই আপাতত আমার কাজ হয়ে যেত।

পুলিন হাসছে। কৃষ্ণা ব্যাগ খুলল।

এক টাকার বেশি দেওয়া উচিত আমার। কিন্তু—

আগের মতো আর আড়ষ্টতা নেই কৃষ্ণার। অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিন তার বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে।

চাকরি পাও। তারপর ঋণ শোধ করবে। পরে অনেক সময় পাবে।

কৃষ্ণা বাড়ি যাবার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় বসে থাকা শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মানুষটির কাছে তাকে আবার একবার ফিরে যেতে হবে। সে আমার

নামটাই শুধু মনে রাখবে, পরীক্ষার অঙ্কের খাতার আঁকিবুকি দাগগুলোও ভুলবে না। কিন্তু ঠিকানা? কৃষ্ণা ভাবল। আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল এই মুহূর্তে। আশ্বস্ত হল ভেবে যে, আমাদের এই শহরটা বড় নয়। ছোট্ট, একেবারে ছোট্ট। ঘুরতে ফিরতে চেনা লোকদের সঙ্গেই শুধু দেখা হয়। দেখা না হয়ে উপায় নেই। তাছাড়া বটতলা তো থাকলই। সে আমার বাড়ি না চিনুক, কিন্তু আমি তো সেই গাছের ছায়াটুকুকে মনে রেখেছি। গিয়ে পড়লেই হবে। ও কি অবাক হবে আমাকে দেখে? নাকি আমার অপেক্ষায় থাকবে? আমার তো আরও অনেক কিছু টাইপ করার থাকতে পারে? তা হলে অবাক হবে কেন? টাইপ করার ছুতোয় একদিন গিয়ে কথাটা জেনে আসব।

মার্কশিটের এতগুলো কপি করে দিলেন, তার মানে কি আপনি চান না আমি মাঝেমধ্যেই আপনার কাছে আসি? আমার যদি রোজ কিছু না কিছু টাইপ করার দরকার হয়?

পুলিনও জানে কথাটা। কৃষ্ণাকেই শুধু সে এতগুলো কপি করে দেয়নি। যারা চাকরিপ্রার্থী তাদের সবাইকেই দেয়। ওরা না চাইলেও দেয়। কৃষ্ণা যদি এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা করে পুলিন নিরুপায়। অসহায় ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েই সে এটা করে। ওদের উৎসাহ উদ্যমকে এছাড়া আর কীভাবেই বা সে সাহায্য করবে। এই আনন্দ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। কে জানে সার্টিফিকেট বা মার্কশিটের চতুর্থ কার্বন কপিটাই কারও জীবনে হয়তো আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে। কার্বনের শেষ কপির ঝাপসা অক্ষরগুলোই হয়তো তখন সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণা বাড়ি ফিরে গেল। যাবার সময় সেদিনই প্রথম আবিষ্কার করল, তার ঘরের পথ টাইপরাইটারের রিবনের মতো সরু। মন আরও খারাপ হয়ে গেল। না, যেতেই হবে একদিন। তার আগে অন্য কোথাও দেখা হলে ভাল। নাহলে কয়েক দিন অপেক্ষা করবে। তারপর নিজেই যাবে।

দুই ভাইয়ের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সেদিন আদালতের রায়ের একটি কপি টাইপ করছিল পুলিন। কৃষ্ণা পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ তুলে তাকাল।

কী খবর? চাকরি হয়েছে?

এত তাড়াতাড়ি চাকরি হয়?

তাড়াতাড়ি কোথায়? তারপর আমি অন্তত একশোটা নতুন মামলার পিটিশন টাইপ করলাম। একশোটা নতুন মামলা হতেও সময় লাগে। তা তোমার তাড়া আছে নাকি? একটু বসো। দেব, টাইপ করে দেব।

কৃষ্ণা ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সেই গাছের ছায়া, সেই রোগা লিকলিকে আঙুল আর টাইপরাইটারের ধাতব শব্দ। পরিবর্তন একটাই। পুলিন যে টুলে বসে টাইপ করে তার পাশে আরও একটা টুল এনে রেখেছে।

এটা কার জন্য?

মুখ তুলল না পুলিন। টাইপরাইটারের শব্দ আরও বাড়ল।

যারা টাইপ করাতে আসে, তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এই বসার জায়গা—

তোমার কাজ কি আগের চেয়ে বেড়েছে আরও, অনেকে টাইপ করতে আসছে?

টাইপরাইটারের ঝড় থেমে গেল। পাশে টুলে বসা কৃষ্ণার দিকে তাকাল পুলিন। কথা বলল অনেকক্ষণ পর।

আমাদের এই শহর ও আশেপাশের অঞ্চল যে আরও আধুনিক হয়ে উঠছে, লোকের কাজ কারবার বাড়ছে, নানা ধরনের ব্যবসায়িক চিঠিপত্র আদান-প্রদান হচ্ছে, তা আমি এই টুলে বসেই বুঝতে পারি।

তা হলে কাজ বাড়ছে বলো?

বাড়ছে। তবে আগের মতো আর সার্টিফিকেট মার্কশিট এসব আসে না। কমে গেছে। নতুন মেশিন এসেছে শহরে। জেরক্স না কী যেন বলছে। ছেলেমেয়েরা ওদিকেই যাচ্ছে। তা তুমিও জেরক্স করিয়ে নিলে পারো। আমার টাইপরাইটারেরও অনেক বয়স হল। অক্ষরগুলো ভেঙেচুরে গেছে।

নতুন টাইপরাইটার কিনছ না কেন? নাকি ভাবছ তুমিও জেরক্স মেশিন বসাবে।

নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা ভালই। আগে ছিল হাতেলেখা দলিল। তারপর এলো টাইপ। তারপব জেরক্স। এরপর আবার নতুন কিছু আসবে। কিন্তু আমরা কোথায় গিয়ে থামব তাই তো জানি না।

তা হলে তুমি জেরক্স মেশিন আনবে না?

না। আমার এই টাইপরাইটারই ভাল করে রিপেয়ার করিয়ে নিলেই আরও কয়েক বছর কেটে যাবে। তাছাড়া বটগাছের এই ছায়া, আমকাঠের নড়বড়ে টুল, মাথার ওপর খোলা আকাশ—এসব আমার ভালই লাগে। এদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। ওদের ভাগ্যও আমার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তা কি টাইপ কবার আছে দাও। তোমার কাজটা আগে করে দিই।

টাইপ করাতে আসিনি। কেন এসেছি শুনবে?

আনকোরা নতুন রিবনে টাইপ-করা প্রথম অক্ষরের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কৃষ্ণার মুখ।

আচ্ছা, প্রথম দিন তোমার এখানে কতক্ষণ ছিলাম, মনে আছে?

কী করে মনে থাকবে?

রুনুর বাঁ চোখের নীচে ক'টা দাগ তোমার মনে আছে। বলো তো, আমার মুখে কোনও কাটা দাগ আছে কি না?

নেই কে বললে? একটা নয়, দু'দুটো কাটা দাগ। থুতনির নীচে আর বাঁ চোখের ভুরুর কোনায়। শুধু এটা জানার জন্যই তুমি এসেছ?

না। কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে বলল। আমি এসেছি তোমার এই বটগাছের ছায়ার ভাগ

নিতে। আমিও একটা পুরনো টাইপরাইটার ভাড়া নিয়েছি। তুমি এই টুলটা আমাকে দেবে? এখন একটা টেবিল পেলেই হল। সবে টাইপিং শুরু করেছি। তুমি সবটা শিখিয়ে দিও।

দুঃখে যেমন, তেমনি আনন্দেও পুলিন নিজেকে সামলে রাখে। বাইরে থেকে ওকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। ওর ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো টাইপরাইটারে এখন আবার ঝড় উঠেছে।

মরীচীকার অধিকার

গ্রাম থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে রামধনিয়া যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ক্রোশ চারেক পথ হেঁটে আসতে এতটা সময় লাগার কথা নয়। আরও দূরের পথ এর থেকেও কম সময়ে পাড়ি দিয়েছে রামধনিয়া। সে-পথে ছোট-খাটো পাহাড় পড়েছে, পড়েছে জঙ্গল। তবু ওর এতটা সময় লাগেনি। ওর গ্রাম শিরিডি থেকে ফি রবিবার রানীশ্বরে হাটে যেতেও ক্রোশ চারেক পথ পেরোতে হয়। সে-পথও কখনও দীর্ঘ মনে হয় না। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। অথচ আজ এতটা সময় লাগল।

আসলে রামধনিয়া আজ একা নয়। একা হলে হন হন করে পথ হাঁটে। কোনও দিকে তাকায় না। তাকানোর সেই চোখটাই ওর নেই। চৈত্রে জঙ্গলে যখন শালিফুল ফোটে তখনও সে দেখতে পায় না। মৃদু একটা গন্ধ অবশ্য পায়। কিন্তু গন্ধের উৎস জানাব জন্য ওর মন ব্যাকুল হয় না। বর্ষার একটা কাঁদরও এভাবে সে পেরিয়ে এসেছিল। এপারে এসে বুঝতে পেরেছিল পুরো ফতুয়াটাই ভিজে গিয়েছে। অর্থাৎ শুকনো কাঁদর বর্ষার জলে ভরে জল যে বেড়েছে এটাই সে খেয়াল করেনি। রামধনিয়া আজ একা নয়। সঙ্গে আছে দু'টো মোষ আর তিনটে গরু। একটা গরু আবার কিছুদিন আগে বিইয়েছে। দুধেল বাঁট নিয়ে গরুটা তেমন জোরে পথ হাঁটতে পারে না। বাচ্চাটা আবার মায়ের গা ঘোঁযাঘেঁষি করে পথ হাঁটে। তারও পায়ের বিশেষ জোর নেই। জোর থাকবেই বা কী করে। চারটে পায়ের ওপর শরীরটা তো দিন দুয়েক আগেও টলমল করে উঠত। এখন আর সেই টালমাটাল ভাবটা অবশ্য নেই। কিন্তু কে জানে সাদা কালো রঙের বাছুরটার শরীর এখনও মাঝেমধ্যে দুলে ওঠে কি না! না হলে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করে কেন? কিছুটা দৌড়েই কেন বা হাঁপিয়ে যায়? চলতে চলতে হঠাৎ কেন ঘাড় বেঁকিয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে বসে পড়ে? এরকম একজন সঙ্গীকে নিয়ে কত জোরেই বা পথ হাঁটা যায়। সঙ্গে আর যারা আছে, তারাও ধীরে চলার পক্ষপাতী। এদের নিয়ে রামধনিয়াকে তাই বড় মন্থর গতিতেই পথ হাঁটতে হয়েছে। সে অবশ্য তাড়াহুড়ো করেনি। কারণ জানত, মাল গাড়িটাও আসছে ওদের মতো মন্থর গতিতে। দু'টো মোষ, তিনটে গরু আর একটা বাছুরের চেয়েও হয়তো আস্তে আস্তে। খড়বেড়িয়া স্টেশনে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়তো রাত কাবার হয়ে যাবে।

আর ঠিক তাই। স্টেশনে এসে পৌঁছনোর পর বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। কিন্তু এখনও মাল গাড়ির দেখা নেই। পাহাড়ের বাঁকে সিগন্যালের চোখ সেই যে লাল হয়ে আছে, এখনও তা বদলানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে স্টেশন মাস্টারের

টেবিলের সেজ বাতিটারও তেল ফুরিয়ে আসছে। বড় পলতে ঘিরে যে হলুদ আলো জমে উঠেছিল তার রঙও এখন অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপর অনেক তারা ফুটে আছে। দু' একটা তারা আবার যেন নেমে এসেছে পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়টা এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই খড়বেড়িয়া স্টেশনে যারা দিনদুপুরে অন্তত একবার এসেছে, তারাই জানে ওখানে একটা পাহাড় আছে। বেশির ভাগ পাহাড়ই বড় হয় না। এই পাহাড়টাও ছোট। আর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রেল লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। রামধনিয়া এটা নিজের চোখে দেখেছে। দেখেছে বলেই অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের অস্তিত্বটা অনুভব করতে পারছে। কিংবা অনুভব নয়। নিজে থেকেই পাহাড়টা ওর মনে জেগে উঠেছে।

স্টেশনে পৌঁছেই রামধনিয়া গাঁট থেকে সাতাশ টাকা গুনে দিয়ে টিকিট কেটেছে কলকাতার। মোষ ও গরুগুলোরও বুকিং করেছে। ওদের নিয়ে তাকে যেতে হবে কলকাতায়। এতদিন ওর বাবা সীতারাম এভাবে মাঝেমধ্যে গাই-গরু পৌঁছে দিত কলকাতায়। সীতারামের সে-বয়স নেই। হাঁটুজোড়াও দুবলা। এবার তাই দায়িত্বটা নিতে হয়েছে রামধনিয়াকে। কলকাতা কত দূর সে জানে না। তবে খাটিয়ায় শুয়ে সীতারাম ওকে বলে দিয়েছে, ওই শহরে পৌঁছতে দু' দুটো দিন আর তিন তিনটে রাতও কেটে যেতে পাবে। মালগাড়ি তো। একবার থামলে আর নড়তে চায় না। কাদায় বসলে মোষ যেমন আর বিশেষ নড়তে চড়তে চায় না, বসে থাকাটাকেই উপভোগ করে, সে রকম মালগাড়িও সিগন্যালেব হাতা খাড়া দেখলে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে। গরুব গাড়িও তখন তাকে টপকে পেরিয়ে যায়। খোলা আকাশের তলায় মোরাম-ছড়ানো নিচু প্ল্যাটফর্মে বসে রামধনিয়া অন্ধকারে মশার কামড় খেতে লাগল। নাছোড়বান্দা মশার ঝাঁকটাকে মাঝেমধ্যে গামছা নেড়ে দূরে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করল। পায়চারি করল কিছুক্ষণ। প্ল্যাটফর্মটা খুব একটা বড় নয়। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। বেশিক্ষণ হাঁটাচলাও করা যায় না। রামধনিয়া কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অগত্যা গরু মোষগুলোর পাশেই, ঝুপ করে বসে পড়ল। এরই মধ্যে বাছুরটা আবার ওর মায়ের বাঁটে মুখ লাগিয়েছে। এতটা হেঁটে এসে বোধহয় ক্ষিধে পেয়েছে ওর। অন্ধকারেও দুধের বাঁটটা ঠিক খুঁজে পেয়েছে।

ক্ষিধে পেয়েছে রামধনিয়ারও। নাকি বাছুরের ক্ষিধে দেখে ওরও ক্ষিধে পেয়ে গেল। স্টেশনের বাইরেই কয়েকটা কোয়ার্টার্স। সেখানে রান্নাবান্নার পাট আগেই চুকে গিয়েছে। কাঠকুটোব উনুন আবার বেশিক্ষণ আঁচও দিতে চায় না। রামধনিয়া পুঁটলিতে বেশ কিছুটা ছাতু সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এনেছে পেঁয়াজ ও লঙ্কা। এনামেলের থালা, ঘটি ও বালতিও ওর সঙ্গে আছে। সে জানে, কোয়ার্টার্সের বাইরেই আছে একটা পাতকুয়ো। দড়ি বালতি লাগানোই থাকে। ছাতুব পুঁটলি, থালা ও ঘটি নিয়ে সে ওই কুয়োটার কাছে গেল। জল তুলল। প্রথমে ধুয়ে নিল মুখ হাত-পা, কিছুটা আরাম পেল। তারপর তৈরি করল ছাতুর মণ্ড। অন্ধকারেই করল এত কিছু। যখন আলো থাকে না, তখনই বোধহয় মানুষের প্রবৃত্তি ও অনুভূতিগুলো এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একটা কুপি যে রামধনিয়া সঙ্গে আনেনি, তা নয়। চকমকিও আছে। তবে কুপি জ্বালানোর আর দবকার হয়নি। অন্ধকারে চোখ সয়ে

গেছে রামধনিয়ার। বাকি পথও তো সন্ধে থেকে সারা রাত ওকে এভাবে আঁধারে থাকতে হবে। তাছাড়া গ্রামেই বা আলো কই। সন্ধে হলেই মানুষজন সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকার ও আলোর সঙ্গে এভাবে একটা সমঝোতা করে নিয়েছে শিরিডি গ্রামের লোকেরা। সন্ধের পরও কারও কারও চালাঘরে যে কেরোসিনের কুপি জ্বলে না, তা নয়। তবে সে-আলোয় উজ্জ্বলতার চেয়ে ধোঁয়া ও কালিই বেশি। অর্ধেক আলো, অর্ধেক অন্ধকার। বলা যেতে পারে আলোর মরীচিকা। তাকে বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখার সামর্থ্যও নেই গ্রামের লোকেদের। মরীচিকার অধিকার ওরা অর্জন করতে পারেনি।

আর আশ্চর্য! মাঝরাতে যে মালগাড়িটা এসে দাঁড়াল, তার হেড লাইটও কাঁপছে কেরোসিন-কুপির শিখার মতো! এই খড়বেড়িয়া স্টেশন থেকে গরু-মোষ মাঝেমধ্যে চালান যায় কলকাতায়। মালগাড়িটা তাই এখানে থামে। এ ছাড়া কলকাতা শহরকে দেবার মতো আর কোনও পণ্য নেই এই অঞ্চলের । রামধনিয়ার বাবা সীতারাম এভাবে কয়েক বার গরু-মোষ নিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত একটা খাটাল খুলে বসেছিল সেখানে। চটের ছাউনির নীচে গোচরে কাদায় কাটিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা বছর। ভন্ ভন্ করে সেখানে মাছি উড়ত। উড়ে আসত ঝাঁক ঝাঁক মশা। তারই মধ্যে বালতির সফেন দুধ ঘিরে হুমড়ি খেয়ে পড়ত কয়েক ঝাঁক মানুষ। ওদের যেন তর সইত না। ঘটি, বাটি, প্যান, টিনের কৌটো—যার যা হাতে আছে, সেটাই গরুর বাঁটের নিচে মেলে ধরত। এক ফোঁটা দুধও উপছে পড়ার উপায় ছিল না। মাটিতে পড়লে জিভ দিয়ে যেন দুধের সেই ফোঁটাটুকুও চেটে নেবে ওরা। সে ছিল পরম নিশ্চিন্ততার কয়েকটা বছর সীতারামের। সকালে-বিকেলে দুধ দোওয়া আর দিনের বেলা কয়েকবার গরু-মোষগুলোর মুখে খড়-বিচুলি গুঁজে দেওয়া—কাজ বলতে ছিল এটাই। খড় কাটতে অবশ্য অনেকটা সময় লাগত। তবে বিরাট বঁটির সামনে একবার গিয়ে বসলে, কী করে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত বোঝার উপায় ছিল না। রাস্তার দিকে পিছন করে বসত সীতারাম। সকাল থেকে রাস্তা দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটত বাস, গাড়ি, লোকজন। কান ঝালাপালা হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু সে—শব্দকে ছাপিয়েও সীতারাম আর একটা শব্দ শুনতে পেত। খড়কাটার শব্দ—ঘ্যাস, ঘ্যাস—ঘ্যাস—ঘ্যাস। সময়ের বিরাট একটা বঁটিতে ওর হাতের অখণ্ড সময়ও এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

সেই সীতারাম এখন খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে জীবনের দ্রুত ফুরিয়ে আসা সময়ের সঙ্গে সারাদিন ধরে জুড়তে থাকে পিছনে ফেলে-আসা সময়ের টুকরোগুলো। কলকাতার জল হাওয়ায় তবিয়ত ঠিক থাকেনি বলে শূন্য বালতি নিয়ে তাকে আবার গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছে। আসার আগে গরু-মোষগুলো ওখানে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই দিনটা ছিল দুঃখের। বালতি বালতি দুধ বিক্রি করে টাকা-পয়সার আমদানি ওর ভালই হচ্ছিল। কিন্তু সেই টাকায় সে কখনও ভাবেনি পাশের খাটালের মতো বিদেশ থেকে আমদানি করবে হলস্টিন কিংবা জার্সির মতো গরু। যারা নাকি অনেক অনেক বেশি দুধ দেয়।

শিরিডি-খড়বেড়িয়া অঞ্চলের গরু-মোষগুলোই বা কম কী! সে ওদের পিঠ চাপড়ে দিত মাঝমধ্যে। আরও যত্ন করত। স্নান করাত। খাওয়াত পেট ভরে। এদিকে নিজের শরীর যে বিহ্বল হয়ে আসছে ভেতরে ভেতরে, এটা সে বুঝল আরও অনেক পরে। এমন দিনও এল যে খাটিয়া থেকে উঠে গরু-মোষগুলোর মুখে খড় বিচুলি গুঁজে দেওয়াও ওর পক্ষে সম্ভব হল না। রাস্তা দিয়ে যত লোক যায়, যত লোক আসে তারা একদিন টেরই পেল না যে, সীতারাম নামে আধবুড়ো যে লোকটা ছিল সে একদিন কলকাতার বোঁটা থেকে খসে পড়েছে, আর ফিরে আসবে না।

রামধনিয়া আর পৈতৃক ব্যবসাটা নেয়নি। তবে এবার তার ওপর দায়িত্ব পড়েছে গরু-মোষগুলো পৌঁছে দেবার। ঝামেলার কাজ। মাঝ রাতে ওদের রেলের ওয়াগানে তুলতে কম কষ্ট পেতে হয়নি। রেলের ওয়াগন তো নয়, যেন চলমান একটা গোয়াল। তাও আবার দু' দিকে সামনাসামনি দুটো খোলা দরজা। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। দু' পাশে গরু-মোষ রাখার জায়গা বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘেরা। দুটো দরজার মাঝামাঝি যে জায়গা সেখানেই রামধনিয়াকে শুয়ে-বসে কাটাতে হবে। অন্ধকারে ওয়াগনে উঠে এপাশে নিজের গরু-মোষগুলো রেখে সে তাকিয়ে আছে। দেখল অন্য পাশটা ফাঁকা। পরে কোনও স্টেশনে হয়তো আরও কিছু চতুষ্পদ প্রাণী ওখানে উঠবে। সঙ্গে থাকবে লোকজন।

ফাঁকা জায়গায় খড় বিছিয়ে রাত্রে শোয়ার ব্যবস্থা করে নিল রামধনিয়া। চকমকি ঠুকে ঠুকে বিড়ি ধরাল। বিড়িটা শেষ করেই শুয়ে পড়বে। এদিকে মালগাড়িও তখন নড়ে উঠেছে। আর নড়ে উঠেছে চতুষ্পদের জন্য রাখা জায়গাটার খড় বিচালি। রামধনিয়া প্রথমে বুঝতে পারেনি। শুধু একটু শব্দ পেয়েছিল। পরে সেই শব্দটাই জলজ্যান্ত মূর্তি হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। একটি মেয়ে। অন্ধকারে কাচের চুড়ি ও মিহি গলায় শব্দে অনুরণন উঠল।

ক্যায়া, চিহুঁক গয়ে?

হ্যাঁ চমকেই উঠেছে রামধনিয়া। চমকে উঠেছে না অবাক হয়েছে? এরকম পরিবেশে একজন মেয়েকে দেখে কে না অবাক হয়। মেয়েটি এর পর যা বলল, তা আরও চমকপ্রদ। অন্তত রামধনিয়ার কাছে।

ম্যাঁয় ঘর ছোড় কর ভাগ রহি হুঁ।

কহাঁ?

মেরে লিয়ে পাশকে টিশান পর এক লড়কা ইন্তেজার কর রহা হ্যায়।

লড়কা? ক্যাযা নাম হ্যায় উসকা?

সরযূ।

রামধনিয়া ভাবল, ওকে এবার জিজ্ঞেস করবে, তোমার নাম কী? কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। এর চেয়েও আর একটা প্রশ্ন জরুরি বলে মনে হচ্ছে।

ঘর ছোড় কর ভাগ কেওঁ রহি হো?

খুব ভুখ লগি হ্যায়। কুছ খিলাও গে?

প্রশ্নের উত্তর মেয়েটি সরাসরি এড়িয়ে গেল।

সত্তু, পিঁয়াজ, মিরচা—ইসকে আলাওয়া কুছ নহি হামারে পাস।

এহি তো ঠিক হ্যায়। আউর ক্যায়া?

কিন্তু ছাতু মাখার জল এখন কোথায় পাবে রামধনিয়া? যেন সমস্যার সমাধান করে দিতেই মাল গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। এবং সেটা একটা স্টেশন। বালতি নিয়ে দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল রামধনিয়া। ঘুমন্ত স্টেশনে জলও পাওয়া গেল অল্প একটু খোজাখুঁজি করতেই।

কচ করে এক টুকরো পেঁয়াজ চিবিয়ে ছাতুর দলা মুখে পুরে মেয়েটি বলল—আশ্চর্য হ্যায়? তুমনে মেরা নাম পুছা নহিঁ? এ ভি নহিঁ পুছা কি ম্যায়ঁ কাঁহাসে আ রহি হুঁ?

ইসকি ক্যায়া জরুরত?

তব লড়কেকা নাম কিউঁ পুছা?

ব্যস, অ্যাইসে হি।

এবার মেয়েটির অবাক হওয়ার পালা। এ কেমন মানুষ যার কোনও কৌতূহলই নেই? ছাতুর থালা থেকে মুখ তুলে, ঘাড় ঘুরিয়ে সে রামধনিয়ার দিকে তাকাল। অন্ধকারে দু'টি মানুষ, কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কাউকে চেনে না। শুধু দু'জন দুজনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে।

রামধনিয়ার মনে অবশ্য একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। তুমনে মেরা নাম পুছা নহিঁ? কী নাম মেয়েটির? এরপরই আবার মনে হল কী দবকার এই কৌতূহলের? যা বলার মেয়েটিই বলবে। একটু আগে ছিল গরু-মোষগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার চিন্তা। এখন চিন্তার সেই জায়গাটা দখল করে নিয়েছে মেয়েটি। এই অন্ধকারে ও একা একা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এটা আরও ভাল করে জানা পুরুষ হিসেবে তার কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন করার মতো মানসিকতাও তার নেই। অথচ প্রশ্ন না করে অস্বস্তিও হচ্ছে। মেয়েটিকে সে অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, ওর কোনও কৌতূহল নেই। কিন্তু সেটাই তো সব নয়। মেয়েটি যে বলল পরের স্টেশনে একটি ছেলে তার জন্য অপেক্ষা করবে। সেই স্টেশনটাই বা কখন আসবে? কলকাতা পৌঁছনো পর্যন্ত সব স্টেশনই তো পরের স্টেশন।

সেই পরের স্টেশন না-আসা পর্যন্ত রামধনিয়া এখন বরং কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারে। ঘুমোবার মতো পরিস্থিতি অবশ্য নেই। হঠাৎ ছোট মোষটা গাঁ গাঁ করে চিৎকার জুড়ে দিল। বিশাল কয়েকটা চোয়াল এতক্ষণ শুধু নড়ছিল আর নড়ছিল। পৃথিবীর শেষ কিছু খাবার যেন এই কয়েকটা প্রাণী চিবিয়ে দাঁতের সুখ করে নিচ্ছে। এমন সময় ওই চিৎকার। একবার, দু'বার নয়। বারবার যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে মোষটা। এরকম হওয়ার কথা নয়। মাইলের পর মাইল এই প্রাণীগুলো নিঃশব্দে পেরিয়ে যায়। কিন্তু এখন কোনও কিছুই যেন ঠিকঠাক চলছে না। প্রথমে অন্ধকার মাল গাড়িতে একটি মেয়ে, তারপর এই চিৎকার।

তুমহারি ভোঁস কেওঁ রঁভা রহি হ্যায়? বাচ্চে জনেগি কেয়া?

মেয়েটি হেসে উঠল।

এইসে কেয়া নহি রঁভা সকতি?

বেকার ভুষা কিলায়া কেয়া? পেটমে দরদ তো নহি? ঠারো, যা কর ম্যায় দেখতি হুঁ।

রামধনিয়ার গা মাড়িয়ে মেয়েটি বাঁশের রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর এক লাফে ওপারে গিয়ে মোষটার পেটে হাত বোলাতে শুরু করল। একটু আগেই যে-মোষটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছিল, সেই মোষটাই এখন শান্ত হয়ে গেল।

তুমে ভি কহি দরদ হো তো বাতাও।

মেয়েটি রামধনিয়ার কাছে এসে বলল। না, ব্যথাবেদনার কোনও অনুভূতিই রামধনিয়ার নেই। বলার প্রশ্নও ওঠে না। ওর প্রশ্ন ছিল একটাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? মানুষ তো ঘর ছেড়ে থাকতে পারে না। ঘর ছাড়লেও নতুন একটা ঘর তাকে গড়ে নিতে হয়। পরের স্টেশনটাই বা কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর পেতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। অন্ধকারে ট্রেন থামতেই মেয়েটি 'সরযূ' বলে ডাকতে লাগল। রামধনিয়া দেখল, একটি লণ্ঠন এগিয়ে আসছে।

মেরা বেটা।

এখানে যে ট্রেন থামবে তা ওরা আগে থেকে জানত। সরযূ ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। রামধনিয়ার কিছু বলার নেই। অন্ধকারে সে শুধু শুনল হাতে লণ্ঠন নিয়ে ছেলেটি ডাকছে—চামারি মা! চামারি মা!

ট্রেন আবার নড়ে উঠেছে। কলকাতা অনেক দূর। দু'দিন, তিন রাত।

কাচপোকা

আমাকে একটা কাচপোকা এনে দেবে? টিপ পরব।

পাঁচ খিলান দেওয়া ঠাকুরদালানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে ছোট বৌ বলল।

তুমি তো এত পোকামাকড় ধরে বেড়াও বলরাম। পারবে না। একটা কাচাপোকা আনতে? কালচে রঙয়ের টিপ ভারী সুন্দর মানায়?

হ্যাঁ গো বৌদি, তুমি যখন বলছ, নিশ্চয় এনে দেব।

বলরাম ছোট বৌয়ের মুখের দিকে তাকাল। ঝাউবাগানের ঘোষবাড়ির ছোট বৌ। ঘোষবাড়ির বৌরা দেখতে সবাই সুন্দর। ছোট বৌ আবার সবাইকে টেক্কা দেয়। রূপ আছে, কিন্তু রূপের গর্ব নেই। যেমন, সুন্দর মুখ, তেমনি সুন্দর ব্যবহার। বয়স আর কত হবে। কুড়ি বাইশ বড় জোর। বয়স কম বলে মুখের হাসিখুশি তরতাজা ভাবটা এখনও পোড়খেয়ে যায়নি।

কিন্তু তোমার ওই কপালে সিঁদুর টিপ ছাড়া আর কোনও টিপই যে মানাবে না ছোট বৌ।

কথাটা বলতে গিয়েও শেষপর্যন্ত থেমে গেল বলরাম। ছোট বৌ যদি কিছু মনে করে? তাছাড়া হাসিঠাট্টার সম্পর্কও তো নয় যে, বলরাম রসিকতা করবে। চক মেলানো এত বড় বাড়িতে তার অধিকারই বা কী আছে। অধিকার কি আদৌ জন্মায়?

বনেদি শৌখিন বাড়িগুলোতে নিয়মিত পোকামাকড় জোগায় বলরাম। সব পাখি ছোলা খায় না, রাধাকৃষ্ণের নামও বলে না। সব পাখিই দাঁড়ের ময়না, টিয়া কিংবা কাকাতুয়া নয়। বরং অধিকাংশ পাখিই আমিষাশী। এতে সুবিধাই হয়েছে বলরামের। পাখিগুলোর জন্যে পোকামাকড় জোগায়। পয়সা যা পায় তাও নেহাত মন্দ নয়। বনেবাদাড়ে ঘাসের জঙ্গলে খুঁজে পেতে পোকামাকড ধরতে পয়সাও খরচ হয় না। গায়ে গতরে একটু খাটলেই হল। মাতলা নদীর ধারে তাদের গাঁয়ের আশেপাশে বনবাদাড়ও কম নেই। নেই প্রাণের ঝুঁকি। সোঁদরবনের ছুটকো বাঘও ঘুরতে ঘুরতে এতদূর আসে না। শুধু নজর রাখতে হয় সাপে না কাটে। দুচোখ খোলা রেখে এদিক ওদিক ঘুরলেই অনেক পোকা চোখে পড়বে। নানা রঙয়ের নানা মাপের পোকা। মিল একটাই ওরা খাদ্য। বড় কথা, সহজেই ধরা দেয়।

কিছু পোকা আছে অবশ্য গাছের পাতা বা ডালের মতো তাদের রঙ। পাতা বা ডালের সঙ্গে মিশে থাকে। চট করে নজরে আসে না। বলরাম প্রথমে ওদের চিনতে পারত

না। কিন্তু বনেবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে সব পোকামাকড়ের হালচাল ওর জানা হয়ে গেছে। কেউ ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। বলরামের কোমরে বাঁধা থাকে একটা মেটে হাঁড়ি। হাঁড়ির মুখ ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা। ন্যাকড়ার আচ্ছাদন সরিয়ে টপাটপ সে পোকা-মাকড় হাঁড়ির ভিতরে চালান করে দেয়, সারা বন জুড়ে বসবাস করছিল যেসব পোকামাকড় তারাই তখন নির্বিবাদে ছোট্ট হাঁড়ির ভিতর মিলে মিশে থাকে। মেটে হাঁড়ির শুকনো ঝনঝনে গা বেয়ে লম্বা লম্বা দাঁড়া নিয়ে কোনও কোনও পোকা চলাফেরা করে। তাদের অস্থিরতা টের পায় বলরাম। কিন্তু ভোলে না। দয়ামায়ার প্রশ্ন নেই। পোকাগুলো ঠিকঠাক পৌঁছে দিলে তবেই বাবুদের বাড়ির পাখিগুলোর পেটে আহার পড়বে। তারাই আবার আহার জোগাবে বলরামের। ফি রবিবার সকালে ক্যানিংযের ট্রেনে চেপে সে কলকাতা আসে। বাবুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পোকামাকড় জোগান দিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরে যায়।

বাবুরা সত্যিই শৌখিন। যেমন বড় বড় সুন্দর সব বাড়ি, তেমনি সুন্দর বাগান। চক মিলানো বাড়ি থাকলে বাগান থাকবে, সেই সঙ্গে থাকবে চিড়িয়াখানাও। এটাই নিয়ম।

বলরামের ধারণা, পৃথিবীতে নিয়মরহিত কিছু নেই। পাখি আছে বলে পোকামাকড়ও আছে। পোকামাকড় আছে বলে বনবাদাড় ও ঘাসের জঙ্গলও কিছু কম নেই। পৃথিবীতে। বাবুরা যতদিন থাকবেন, ততদিন তাঁদের পাখির শখ থাকবে। ততদিন বলরামের জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ ঘটবে না।

বলরাম, ও বলরাম।

সুতানুটির মল্লিকবাড়ির মেজো বৌ ডাকছে। বলরাম তখন এক নাম-না-জানা পাখির খাঁচায় খাবার দিচ্ছে। বাবুরাও এই পাখির নাম জানেন না। কিনেই খালাস। নাম জানার দরকার নেই। পাখি তো। নামগোত্র বা বাড়ির ঠিকানা জানার প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। পাখিগুলো দেখতে অনেকটা দেশি শালিখের মতো। তবে গায়ে গতরে বড়সড়ো। মেজাজটাও রুক্ষ। গলার আওয়াজটাও কিছুটা খনখনে। খিদের সময় গলাটা হয়তো এরকমই কর্কশ হয়ে ওঠে। বলরাম অন্য সময় ওদের দেখেনি। তাই বলতে পারবে না গলার স্বর তখন কেমন মোলায়েম হয় ওদের।

বলরাম এই পাখির খাঁচায় ছেড়ে দিয়েছে কয়েকটা উচ্চিংড়ে ও ঘাসফড়িং। বিদেশি পাখির ধারালো ঠোঁটের নাগাল এড়িয়ে ঘাসফড়িংগুলো এদিক ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশিক্ষণ পারবে না। চুমু খাবার ভঙ্গিতে ওই তো একটা পাখি তার ঠোঁট দুটো এগিয়ে নিয়ে গেল ঘাসফড়িংয়ের দিকে। ঠোঁটের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ফালাফালা হয়ে চিরে গেল ফড়িংয়ের সবুজ পেট। খণ্ডবিখণ্ড শরীর তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারপর আর হদিশই পাওয়া গেল না।

বাড়িতে শুধু ওই পোকা এনে দিলেই চলবে? শোন না বাপু এদিকে।

মেজ বৌ একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল বলরামের।

পোকা ছাড়া আর মাথায় কিছু ঢোকে না নাকি তোমার? তোমার মাথাতেও তো

পোকা কিলবিল করছে। বলি, খবর রাখো?

বলরাম হাসতে থাকল মেজ বৌয়ের কথায়।

খুব তো পোকা চেনো। বলো দেখি, কচি লাউপাতায় যে ছোট ছোট লাল পোকা বসে থাকে ওদের নাম কী?

সব পোকার নাম কি কেউ জানতে পারে? মানুষই তো ওদের নাম রাখে। আপনি একটা নাম বলুন দেখি ওই পোকাগুলোর।

জলের লতাপাতায় ঝাঁক বেঁধে নীল কালো রঙয়ের যে সব পোকা বসে থাকে, ভেলভেটের মতো রঙ, জানো কী নাম ওই পোকাগুলোর। বলতে পারলে বুঝব তুমি পোকা চেনো।

বলরাম চুপ করে থাকে। সত্যিই সব পোকার ও নাম জানে না। বেশিরভাগ পোকারই নাম জানে না। অথচ পোকা বিক্রি করে খায়! না, মেজ বৌ বিপদে ফেলল দেখছি। পোকাগুলোব নাম জানা ওর উচিত ছিল।

বুঝতে পেরেছি তোমার বিদ্যেবুদ্ধি।

মেজ বৌ এমন করছে যেন সব পোকার নাম তার জানা আছে।

সব পোকা উড়তে পারে না এটাও নিশ্চয় জানো না।

এবার বলরাম ঘাবড়ে গেল। প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হবে, মেজ বৌয়ের কাছে পোকার বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে, এটা সে কখনও ভাবেনি।

হেই বৌদি, রক্ষে করো। দাদাবাবুর কাছে বললে আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবে না। বড় দাদাবাবুর কানেও যাবে কথাটা। দাদাবাবুরা ভাববেন হাবিজাবি সব পোকা এনে আমি পাখিদের খাঁচায় ছেড়ে দিচ্ছি।

দাদাবাবুরা কী ভাববেন তাতে তোমার কী এসে যায়? এসে যাবেই বা কেন?

মেজ বৌ হেসে উঠল।

সত্যিই তোমার মাথায় পোকা আছে বলতে হবে। তোমার দাদাবাবুরাই কি জানে কোন পাখির কী নাম, তারা কী পছন্দ করে, কোথায় তাদের বাড়ি, খাঁচাতেই বা তাদের দিন কেমন কাটছে?

আমারও মনে হয়, বাবুরা জানেন না।

আমি যা বলব তাতেই কি তোমাকে সায় দিতে হবে?

না, এক এক সময় ভেবেছি বাবুদের কাছে গিয়ে কয়েকটা পাখির নাম জেনে নেব। খাঁচার সব পাখির নাম জানি না। জানতে ইচ্ছে হয়।

দাদাবাবুদেরও ইচ্ছে হতে পারে।

ইচ্ছে?

হ্যাঁ, তাঁরা পোকামাকড়ের নাম জিজ্ঞেস করতে পারেন তোমাকে। তোমার উত্তরের তখন মাথামুন্ডু থাকবে না। তুমি ফড়িং না হয় উচ্চিংড়ে, না হয় জলমাকড়সা কিছু একটা মনগড়া উত্তর দেবে। তাই তো? বলি ফড়িং কত রকমের আছে জানো? দেখার

চোখ আছে তোমার? কখনও আলাদা করে দেখেছ এক একটা ফড়িংকে। দেখলে বুঝতে পারতে সবার রং একরকম নয়।

সবুজ ছাড়া ফড়িঙের আর রং নেই।

এই নাকি তুমি সব পোকা চেনো? বোকার হদ্দ কোথাকার। সবুজেরও তো পাঁচটা রং। যাক গে, তোমার সঙ্গে বকে বকে দুপুর গড়িয়ে গেল। পোকাদের সঙ্গে থেকে তুমিও আর মানুষ হবে না।

কিছু বলবে বৌদি?

দিলে তো আমার মুখে ব্যথা করিয়ে। এত বকবক করলে কার না মুখে ব্যথা হয়। ছাদে যাবার সিঁড়িটা চেনো? না তাও চেনো না?

ছোট দাদাবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে।

হ্যাঁ। আমি আর ওদিক দিয়ে এখন যেতে চাইছি না। কাসুন্দি রোদে দিয়েছি। যাও ছাদ থেকে গিয়ে পেড়ে আনো।

সবে দু এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙেছে বলরাম এমন সময় ভারী গম্ভীর গলার ডাক ভেসে এল—

কে রে বলরাম নাকি? ভরদুপুরে ছাদে কী কাজ পড়ল?

থমকে দাঁড়ায় বলরাম। কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কী রে উত্তর দিচ্ছিস না কেন? এদিকে আয়। কাউকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই। ভরদুপুরে পা টিপে টিপে উনি ছাদে চললেন। আয়, এদিকে।

মেজবাবুর ঘরে ঢুকল বলরাম। গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বিশাল এক আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছেন মেজবাবু। চোখদুটি বন্ধ। বলরাম যে সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে তাঁর হুঁশ নেই। গড়গড়ার আগুনও নিভে গেছে অনেকক্ষণ।

এই ফাঁকে বলরাম সমস্ত ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মেহগিনি কাঠের কারুকার্য করা বিশাল পালঙ্ক। দু'জোড়া পরী যেন চারপাশ থেকে পালঙ্কটিকে ধরে রেখে তাকে আকাশে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পালঙ্কে যারা শোয় তারা বোধহয় রোজ মেঘের রাজ্যেই ভেসে যায়। ঘরের ছাদ থেকে প্রায় মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে ঝাড়লণ্ঠন। ত্রিশিরা কাচে দুপুরের রোদ রামধনুর মতো রঙিন হয়ে উঠছে। টানাপাখাটা অবশ্য স্তব্ধ। বড় বড় জানলা দিয়ে চমৎকার হাওয়া আসছে। চমৎকার একটা গন্ধ সারা ঘরে। তা বোধহয় দামি তামাকের। গন্ধের আমেজ আছে। সেই আমেজ বলরামকেও আবিষ্ট করছে। আবিষ্ট চোখে সে দেখল মেজবাবু যেখানে বসে আছেন তার পিছনের দেয়ালে এক মেম সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে বসন নেই। পালকের মতো নরম হাল্কা বসন স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে বড় জীবন্ত এই ছবি। পুরো মানুষটাকেই যেন ছবিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী দেখছিস বলরাম?

মেজবাবু সেই মেঘের রাজ্য থেকেই যেন কথা বলছেন।

চোখ ড্যাবা ড্যাবা করে কী দেখছিস। বললি না তো ছাদে কী কাজ আছে তোর? ছাদে তো আর আমি পাখির খাঁচা রাখিনি।

আজ্ঞে আমি কাসুন্দি আনতে যাচ্ছিলাম। কাসুন্দি? ছাদে কাসুন্দি থাকে?

মেজ বৌদিদি বললেন।

মেজ বৌদিদি? কোথায় তোর মেজবৌদিদি? আমি এদিকে বসে আছি, এক খিলি পান পর্যন্ত জোটেনি। গড়গড়ার শুকনো ধোঁয়ায় জিভ একেবারে শুকিয়ে গেল। তা, তোর একটা নতুন কাজ হয়েছে বল।

না, আজই তো প্রথম বললেন বৌদিদি।

বুঝতে পেরেছি। পাছে এই ঘরে ঢুকতে হয় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠার সময় পাছে আমার নজরে পড়ে যায় তাই তোর বৌদিদি এদিকেই আসেনি। তোকে পাঠিয়েছে ছাদের কাসুন্দি আনতে। যা তুই তোর কাজ করগে যা। আমি কাসুন্দি পেড়ে আনব।

আমার কাজ হয়ে গেছে বাবু।

তা হলে বাড়ি যা।

বলরাম হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই কর্কশ গলায় ডেকে উঠলেন মেজবাবু। বিদেশি শালিকের মতো গলার স্বর। ক্ষিধের সময় যাদের কণ্ঠস্বর খনখনে হয়ে ওঠে।

তুই তো পোকার ব্যবসা করিস তাই না?

আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।

পুরনো এই বাড়িটায় ঘরে ঘরে কত আরশোলা আছে জানিস? বলি আরশোলা ধরিস না কেন? আরশোলাও তো পাখির খাবার।

বলরাম মনে মনে কল্পনা করে নিল সে পালঙ্কের নীচে ঢুকে পড়েছে। স্যাঁত সেঁতে অন্ধকারের মধ্যে আরশোলাদের বাসায় হানা দিয়েছে। আরশোলা খুঁজে বেড়াচ্ছে, অনেক অনেক আরশোলা তোরঙ্গ, সিন্দুক ড্রেসিংটেবিল আলমারির খাঁজে খাঁজে। পালঙ্ক, আলমারি ও ড্রেসিংটেবিলের কাঠগুলো আবার বনের গাছ হয়ে গিয়েছে। সবুজ বড় বড় গাছ। সাদা ও কালো পাথরের নকশাদার মেঝে যেন ঘাসের জঙ্গল। সেখানে শুধু আরশোলা ছাড়া আর কোনও পোকা নেই। কিন্তু এই আরশোলা ধরা যায় না। ধরতে গেলেই ফড় ফড় করে উড়ে যায়। যদিও বা এক আধটা কোনও রকমে ধরা পড়ে সেগুলো জন্মান্ধ। তাদের মাংসের স্বাদও তেতো। পাখিরা থু থু করে উগলে ফেলে দেয়। খায় না।

না বাবু, আমার বনবাদাড়ই ভাল। এই আরশোলা পাখিরা ঠোঁটে ছোঁবে না।

তুই জানিস।

জানি বলেই তো আরশোলা ধরে আনি না। কেঁচো খায় জানিস পাখিরা? তুই বা এখানে কেঁচো হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

জানি। ময়ূরে খায়।

তা হলে কেঁচো আনিস না কেন?

আনি, তবে রানীকেঁচোই ময়ূর পছন্দ করে। রানীকেঁচো তো আর বেশি পাওয়া যায় না।

কেঁচোদের আবার বাজারানী আছে নাকি?

এমন মজার কথা মেজবাবু যেন আর আগে কখনও শোনেনি। খ্যাক খ্যাক করে উনি হাসছেন। আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘর তোলপাড় করে হাসতে থাকলেন। হাসি থামল সেই সময় যখন দেখলেন দরজায় মেজবৌ দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ঘর মুহূর্তে থমথমে হয়ে গেল। মেজবাবু ও বৌদির মাঝখানে দাঁডিয়ে বলরাম। পালঙ্কের দুজোড়া পরী, ছবির নগ্ন মহিলা, ওরা সবাই শরীর নিয়ে ঘরের মাঝখানে সারি সাবি দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় তোমার কাসুন্দি?

মেজবাবু খনখনে গলায় বললেন।

কিন্তু মেজবৌদির গলায় নেই কাসুন্দির ঝাঁঝ। শান্তভাবে বললেন, পাগল হয়ে গেলে নাকি?

না, পাগল হব কেন? বেশ তো আছি। তা, বলরাম এত যে পোকামাকড ধরে আনো জোনাক পোকা আনতে পারো না কেন বলো তো? জোনাকি, বাতের জোনাকি।

বলবাম কী বলবে! চুপ করে আছে। মেজবাবুব কথা হেঁয়ালির মতো মনে হয়।

দিনের আলোয় জোনাকিরা লুকিয়ে থাকে। দৈবাৎ সন্ধ্যাব আগে বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের পথে অন্ধকারে বাবলা গাছে আমি ঝাঁক ঝাঁক জোনাক পোকা দেখেছিলাম। কবে সেই-ই ছোটবেলায়।

বলরাম এবার কিছুটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

মেজবাবুকে সে বিশ্বাস করতে পারছে। মেজোবাবুর কথাগুলো ওব আর এলোমেলো মনে হচ্ছে না।

বাঘের গায়ে জোনাক বসে থাকে জানেন বাবু।

তুই দেখেছিস?

শুনেছি। অন্ধকারে বাঘের গায়ে জোনাকগুলো মিট মিট করে জ্বলে। তখনই জন্তুরা টের পেয়ে যায়।

তুই জানিস বাবুই পাখিরা জোনাক ধরে নিয়ে যায়? বাবুইয়ের বাসায় দেয়ালে গোবর দিয়ে ওরা জোনাক পোকা বসিয়ে দেয়। অন্ধকারে জোনাক জ্বলতে থাকে। বাবুইয়ের বাসা আলো হয়ে যায়।

বলরাম এবকম একটা গল্প আগেও শুনেছে। তবে এ সম্পর্কে বিশদ কিছু সে জানে না।

শোন বলরাম, শেষবার কবে জোনাক দেখেছি তোকে বলছি। অন্ধকারে এই ঘরে সেদিন শুয়েছিলাম। একা, চারপাশে আর কেউ কোথাও ছিল না। আমি ওই পালঙ্কে চিৎ

হয়ে শুয়েছিলাম। সেই সময় দেখলাম ঘরে এক কণা আলো উড়ছে। উড়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। হাওয়ায় আঁকিবুকি কাটছে সেই একবিন্দু আলো। বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা কী?

হ্যাঁ, বাবু। জোনাক।

মেজ বৌ কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন ওরা দুজনেই তা টের পায়নি।

বাবু আমি যাই। ট্রেন ধরতে হবে।

একটা কথা মনে রাখিস। এতে পোকা ধরে বেড়াচ্ছিস ক্ষতি নেই। কিন্তু খুব সাবধান, গুটি পোকা নষ্ট করিস না। কখনও যদি শুনি গুটি পোকা ধরে এনেছিস তা হলে তোকে আর আস্ত রাখব না।

গলাটা অনেক মোলায়েম হয়ে গেছে মেজবাবুর। তাই হয়তো কিছুটা সাহস পেল বলরাম। বলল—

বাবু, পোকা নিয়ে তো এত কথা বললেন, আমাকে। কুমরে পোকা চেনেন?

কেন বল তো?

চেনেন না বলেই মনে হচ্ছে। কিংবা আপনার নজরে পড়েছে। এই ঘরে একটা কুমরে পোকা আছে। দেখান দেখি।

মেজবাবু এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন। তুই কি আমাকে পোকা বলছিস নাকি?

না, সত্যিই আপনি কুমরে পোকা চেনেন না। ওই দেখুন আপনার সামনেই বাসা বেঁধেছে।

পুরু সেগুন কাঠের দরজার ওপারের দিকে এক কোণে আঙুল তুলে দেখাল বলরাম। সেখানে ছোট্ট একটা মাটির ঢিপি, কে যেন আঠা দিয়ে বসিয়েছে।

কুমরে পোকার বাসা। তাও ভাল উই ধরেনি।

উই ধরেছে আমার শরীরে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মেজ বৌ। হাতে কাসুন্দির বয়াম। মেজ বৌয়ের দিকে তাকিয়েই কথাটা বললেন মেজবাবু। আবার বিপদভঞ্জন হল বলরাম। এ সব কথার মধ্যে জড়ানো ঠিক নয়। সে বাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। একবার শুধু পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ঘরের ভিতর থেকে পুরু সেগুন কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন মেজ বৌ। মনে হল ঘরের ভিতর একটা ভ্রমর ঢুকেছে। ঘরটা যেন বন্ধ একটা কৌটো। প্রাণভোমরা ছটফট করছে সেখানে।

আকাশে ছটফট করছে দুরন্ত রোদ। দু-এক টুকরো মেঘও আছে। বলরামকে এখন আরও অনেক বাড়ি যেতে হবে। না হলে পাখিগুলো অভুক্ত থাকবে। মেজবাবু সব কাজই আজ ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।

কই, তুমি তো কাচপোকা এনে দিলে না। মিথ্যে ছাড়া কী আর বলার আছে এখন।

আনব গো আনব। আমার ছেলেকেও কাজে নামিয়ে দিয়েছি। বলেছি যেখান থেকে পারো কাচপোকা ধরে আনো। কাচপোকার শক্ত খোলা ঘষে ঘষে টিপ তৈরি করে মেয়েরা। গাঁয়ের মেয়েরা কাচপোকার টিপ ভালোবাসে। গাঁয়ের লোকেরা এখন তোমার

জন্যে কাচপোকা খুঁজছে।

তুমি বললে না গাঁয়ের মেয়েরাও কাচপোকা ভালবাসে?

সব মেয়েরই ভাল-লাগার জিনিসগুলো এক। ভাল-লাগার জিনিসগুলোর মধ্যে সব সময় মিল থাকে। তাই চাইলে পাওয়া যায় না। সবাই তো খুঁজছে। পায় আর কতজন।

না, একটা পেলেও তোমাকে এনে দেব। আচ্ছা, বোলতার চাক এনে দিতে পারো। তোতাই বলছিল।

বলতে বলতে তোতাই এসে হাজির।

এই এক খেলা হয়েছে ছেলের। দুপুর হলেই ছিপ হাতে পুকুরর পাড়ে বসে থাকে।

পিঁপড়ের ডিম দিয়ে পুঁটিমাছ ধরতে আর ভাল লাগে না বলরামদাদা। আমাকে বোলতার চাক এনে দিও। বড় মাছ ধরব।

বোলতা, ভীমরুল এরা সবাই খুব রাগী জাত খোকাবাবু। তক্কে তক্কে না থাকলে চাক ভাঙা যাবে না। ওদের সামনে চাক ভাঙলে ওরা ছেড়ে কথা বলবে না। হুল ফুটিয়ে দেবে। আর সে কী হুল। আমাদের গাঁয়ে নীল মৌমাছি আর বোলতা আছে। এক-একটা হুল যেন গোলাপের কাঁটা। হাতে ফুটিয়ে দিলে সমস্ত হাত একেবারে লাউয়ের মতো ফুলে উঠবে।

তাহলে ভাল টোপ পাব কোথায়?

ভাল টোপ বলেই তো অপেক্ষা করতে হবে। ভেবে দেখো খোকাবাবু, বোলতার চাক ভাঙলে ওরা যাবে কোথায়? ওরাও তো উদ্বাস্তু হয়ে যাবে।

যাবে আর কোথায়? আবার চাক গড়ে নেবে। এই তো আমরাও বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। নতুন বাসা ঠিক হয়ে গেছে।

তোমাকে তো বলাই হয়নি। জানো এই বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে। দেনার দায়ে এত বড় বাড়িটাই পাওনাদারকে তুলে দিতে হচ্ছে।

খাঁচার পাখিগুলো ছটফট করছে ক্ষিধেয়। চিৎকার চেঁচামেচি জুড়েছে। কিন্তু বলরামের আর সেদিকে মন নেই। ছোট-বৌ কী কথা শোনাল।

তা হলে তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

হবে, তবে নতুন ঠিকানায়। অবশ্য তোমার ছোটবাবুরা পাচ ভাই আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। আমরা যাচ্ছি লেবুতলায়। বড় তরফ গোবিন্দপুরে। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছেন। তুমি লেবুতলায় গেলেই আমাদের দেখা পাবে।

নতুন বাড়ি তৈরি করলেন ছোটবাবু? বাড়ি তৈরির টাকা কোথায় তোমার বাবুর?

বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছি।

আর এই পাখিগুলো! পাখিগুলোও ভাইদের এক এক ভাগে পড়বে?

তা কেন? তখন কি আর এরকম চিড়িয়াখানার জায়গা পাওয়া যাবে? আসছে রবিবার হাতিবাগানে চলে যাবে পাখিগুলো। পাইকাররা এসে নিয়ে যাবে।

বিক্রি করে দিচ্ছ পাখিগুলো?

তুমি নেবে?

এই এত পাখি আমি নিয়ে কোথায় রাখব?

যে পাখিগুলো তোমার ভাল লাগে সেগুলো নিয়ে যাও।

সব পাখিই আমার ভাল লাগে। আলাদাভাবে ওদের কখনও দেখিনি।

তাহলে তো আর কিছুই করার নেই। বাড়িতে ওদের ঠাঁই দেবার জায়গা নেই তোমাব, আবার বলছ সব পাখিই তোমার আদরের।

তাছাড়া কী!

তা হলে কষ্ট পাবে।

না, আরও পাখির সংসার তো রয়ে গেল।

সেগুলোও ভাঙবে। ভাঙতে শুরু করেছে। আজ না হয়ে কাল। যাই হাতের কাজ পড়ে আছে। তুমি বরং লেবুতলায় এসো। ঠিকানাটা নিয়ে যেও।

বড় বড় খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল বলরাম। একবার ভাবল, খাঁচা খুলে পাখিগুলোকে আকাশে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু না। দেখল খাঁচায় তালা ঝুলছে। চাবি তার কাছে নেই। থাকলেও হয়তো খাঁচা খুলে দিতে পারত না। সে যা পারে সেটাই করতে থাকল।

পাখিগুলোর খাঁচায় পোকা-মাকড়দের এগিয়ে দিল।

কিছু পাওয়ার দিন

নগেনের ফিরতে দেরি হচ্ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসার কথা। দেখতে দেখতে দু' আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল।

সকালের রোদের তাপ বেড়েছে। উনুনেও গনগনে আঁচ। তবু অচলা আরও কয়েকটা কাঠের টুকরো গুঁজে দিল উনুনের গর্তে। ভাত ফুটছে। বাষ্প জমেছে এনামেলের ডেকচিতে। বুক-চাপা কষ্টে ডেকচির ঢাকনাটা ছিটকে পড়ে যেতে চাইছে হেঁশেলঘরের মাটির মেঝেতে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়া, ফুটন্ত ভাতের ধোঁয়া গলা টিপে ধরতে চাইছে অচলার। ভাত কেন যে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় না! আর নগেনকেই বা সে কী বলবে। হাট থেকে বেছে বেছে এমন চাল এনেছে, হাড় সেদ্ধ হয়ে যাবে, তবু চাল সেদ্ধ হবে না। সস্তায় আকাড়া চাল কিনে কিছু পয়সা বাঁচানো যায়, কিন্তু সে-চাল সেদ্ধ হতে দেরি হলে জ্বালানি খরচও তো বাড়ে। সংসারের সাদামাটা হিসেবটাও বোঝে না নগেন।

হেঁশেলঘর থেকে বেরিয়ে এল অচলা। ঝাঁই ঝাঁই করে উঠল, "হরি, ও হরি। দেখেছিস তোর বাবার কাণ্ড!"

বেলা যতই বাড়ুক হরির এখনও ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়নি। ওর ঘরটা হেঁশেলঘরের ঠিক সামনে। মাঝখানে অনেকটা উঠোন। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে। উঠোনের কাদা এখনও শুকোয়নি। এখান ওখান থেকে কয়েকটা ইট এনে উঠোনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাও, যত ইট দরকার ছিল পাওয়া যায়নি। হরির ঘরের সামনেই কাদা জমে আছে। হাঁটা-চলা করতে করতে সে-কাদা অবশ্য কিছুটা শুকিয়ে এসেছে, তবু তো কাদা। হরির ঘরেই অচলা দু'বেলা ভাত পৌঁছে দেয়। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে, দরকার না হলে নিজের ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না হরি।

অচলা আবার হাঁক পাড়ল। অচলার গলা এমনই যে, মড়ার কানেও পৌঁছে যায়। ঘুমন্ত হরির কানেও যে পৌঁছয়নি, তা নয়। সে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। পাশ ফিরে শোওয়ার আগে হরি খ্যানখেনে গলায় মান্তিকে বলল, "জানলা খুলেছ কেন? বন্ধ করে দাও।"

"তুমি বন্ধ করে নাও না।"

মান্তি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হরি ওকে সাঁড়াশির মতো হাত দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে চেষ্টা করেও সে উঠতে পারল না।

"তোমার না হয় লজ্জার বালাই নেই। কিন্তু লোকে কী বলবে আমাকে! কত বেলা হয়েছে, জানো!" মান্তি সাঁড়াশির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা

করছে। ভোর হতে না হতেই ওর ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় শুয়েই টের পায় কুয়ো থেকে জল তুলে অচলা বাসন মাজছেন। খুব খারাপ লাগে মান্তির। শাশুড়ি ভোরবেলা উঠে বাসন মাজবে, কাঠকুটো জ্বেলে চা করবে, হরিকে ডেকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে সেই চা পৌঁছে দেবে, অথচ বাড়ির বউ হয়েও সে শাশুড়ির কোনও কাজে লাগবে না। এটা ভাবা যায় না। মান্তি এর আগেও বহুদিন চেষ্টা করেছে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে আসার। কিন্তু পারেনি। প্রতিবারই হরি ওকে আটকে রেখেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হরি কি সব টের পায়? মান্তি ভাবে। না হলে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠে আসার মুহূর্তে সে কেন এভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে। কিংবা এক ঝটকায় আবার পাশে শুইয়ে দেয়!

"শোনো, মা ডাকছেন।"

"কবে আর ডাকেন না? বলে দাও, আমি আর চা খাব না।"

"আচ্ছা, আমি বরং চা'টা নিয়ে আসি।" মান্তি ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল। আসলে, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি করে নিতে চাইল।

"বললাম তো, চা খাব না। চা তো নয়, যেন পাঁচন। সেই সকালে কয়েক ঢোক গেলার পর থেকেই মুখটা তেতো হয়ে আছে।"

হরির মুখ সব সময়ই তেতো। মেজাজ সবসময়ই ওর খিঁচড়ে থাকে। নগেন, অচলা, মান্তি কেউই ওকে ঘাঁটায় না। বলা যায় না, কিছু যদি করে বসে।

মতিগঞ্জের একটা গ্যারেজে মেকানিকের কাজ করে হরি। বাড়ির লোক অন্তত এটাই জানে। মতিগঞ্জের 'বাঁশরী' সিনেমাহলের লোকেরা অবশ্য জানে, হেনাজুড়ি থেকে একটা ছোকরা এসে বাপির চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে। চায়ের দোকানটা সিনেমা হলের সামনে। আর ওই ছোকরা আসে দুপুরবেলা। ম্যাটিনি শো শুরু হওয়ার ঠিক আগে। সাড়ে দশটা নাগাদ রাতের শো ভাঙার পব বাড়ি ফেরে। রোদ, জল, ঝড়—কোনওদিনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

হরির আসলে কোনও কাজই করতে ভাল লাগে না। নগেনই মতিগঞ্জের বীরেনবাবুকে বলে কয়ে একটা গ্যারেজে ওর চাকরি করে দিয়েছিল। বীরেনবাবু তখন বলেছিলেন, "তোমার ছেলে কি গায়ে-গতরে খাটতে পারবে? দেখে তো মনে হয় না।"

ময়লা জামা আর ঢোলা ফুলপ্যান্ট পরে হরি সেদিন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বাবার সঙ্গে তখন বীরেনবাবু কথা বলছিলেন তার ফাঁকে ফাঁকে চোখ তুলে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। বীরেনবাবুর জমিজমা অনেক। তবে গাঁয়ের বাড়ি ছেড়ে এসে মতিগঞ্জেই বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবসাপত্র আছে। মিউনিসিপ্যালিটির ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেওছেন বছর কয়েক আগে। শহরে ওঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু কম নেই। তিনিই একটা গ্যারেজে বেকার হরির চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে রোজ দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে রওনা হয় হরি। বাড়ির লোকেরা সেই থেকে জানে, হরি গ্যারেজে কাজ করছে।

যেমন চাকরিই হোক, তার তো কিছু মাইনেপত্র আছে। না হলে আর চাকরি কী!

কিন্তু নগেন বা অচলা দু'জনেই হরির কাছে হাত পাততে ভয় পায়। গ্রামের মুদির দোকানে কাজ করে মাসের শেষে নগেন যা পায়, তা বাড়ি আনতে না আনতেই ফুরিয়ে যায়। ধার-দেনা লেগেই আছে। কিন্তু হরির সে সব দিকে নজর নেই। দু'বেলা থালায় সাজানো ভাত পাওয়াটাই ওর অধিকার বলে সে মনে করে। সে ভাত কোথা থেকে আসছে, কীভাবে আসছে তা জানার প্রয়োজন নেই ওর।

নগেন ও অচলা যা পারেনি, তা অবশ্য পেরেছে মান্তি। মুখ ফুটে কথাটা হরিকে বলেছে।

"মা চকোবত্তিদের বাড়ি থেকে চাল ধার করে এনেছেন। এক আঁচল চাল। ফুরলো বলে।"

"আমি কী করব।"

"তুমি যে চাকরি করো, মাইনে পাও না?"

"মাইনেয় কী হয়?"

"চাল, ডাল আনাজপত্র তুমিও তো এক আধবার কিনে আনতে পারো।"

"পারি না।"

"তোমার কর্তব্য বলেও কি কিছু নেই!"

"সাত-সকালে বেশ জ্বালালে দেখছি। কে গা তুমি আমাকে আমার কর্তব্যের কথা মনে পড়াতে এসেছ!" বিছানায় এক ঝটকায় উঠে বসেছিল হরি। বিয়ের রাতের শুভদৃষ্টির পর সেই প্রথম ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল মান্তি। মনে হয়েছিল, মাঠের ধুলো মাখা একটা গোসাপের চোখ যেমন হয়, হরির চোখদুটো যেন ঠিক সেইরকম। তার ওপর আবার চোখদুটো লাল টকটকে। এমনও চোখ হয় মানুষের! মান্তি ভয় পেয়ে ঘব থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর ওকে বিছানায় আটকে রাখেনি হরি। ঘর থেকে বেরনোর আগে মান্তিকে ধমক দিয়ে বলে উঠেছিল, "খবরদার বলছি। আর যদি এসব কথা আমাকে বলো মুখ ভেঙে দেব।"

সেদিনও উঠোনে ছিল কাদা। সেই কাদার মধ্যে দুড়দাড় করে নেমে গিয়ে মান্তি হেঁশেলঘরে উঠেছিল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে মান্তির। অচলা দেখেও দেখেনি। হরির কোনও কিছুরই সে বিরোধিতা করে না। মান্তি চোখের জল মুছে হেঁশেলঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসেছিল।

হরির বিয়ে অচলারই দেওয়া। নগেনের মত ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সংসারে নগেনের কোনও ভূমিকা নেই। রোজগার করে যে সংসার চালাতে পাবে না, যার বউকে মাঝেমধ্যেই অন্যের বাড়ি গিয়ে চেয়ে-চিন্তে চাল নিয়ে আসতে হয়, না হলে বাড়ির লোকদের মুখে অন্ন জোটে না, তার সত্যিই কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। পৃথিবীটা এই নিয়মেই চলে।

"শোনো, হরির বিয়ে দেব ভাবছি।" রাত্রে শোওয়াব আগে লণ্ঠনের পলতে কমাতে কমাতে বলেছিল অচলা।

"সংসারে তো তিনটে মানুষ। তাদের মুখেই অন্ন জোগাতে পারছি না। আর একজনকে নিয়ে আসবে?"

প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই নগেনের আপত্তি ফুটে উঠেছিল। সে কখনও জোর গলায় কিছু বলে না। বলতে শেখেনি।

"তোমার সবেতেই আপত্তি।" মুখ ঝামরে উঠেছিল অচলা।

"আমার আপত্তির ওপর কি কিছু নির্ভর করছে? তাছাড়া, আপত্তিই বা জানালাম কোথায়!" অজানা ঠাকুরের উদ্দেশে রাত্রে প্রণাম জানিয়ে শোয় নগেন। বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে দু'হাত জোড় করে সে প্রণাম শুরু করল। অন্ধকারে অচলা তা টের পায়নি।

"স্পষ্ট করে বলছ না কেন, তুমি রাজি। মেয়ে দেখবে?" নগেনের কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না দেখে অচলা এবার অস্থির হয়ে উঠল।

"ঠিক আছে, তুমি যখন চুপ করেই থাকতে চাও, আমিই না হয় মেয়ে দেখব।"

"সেটা কি ভাল দেখাবে? তুমি একা মেয়ে দেখতে যাবে?" নগেন বলল।

"লোকের বাড়ি চাল ধার করতে তো আমিই যাই। তুমি জানতে চাও, না আমার সঙ্গে যাও?"

"চাল আনা আর মেয়ে দেখতে যাওয়া তো এক কথা নয়।"

"তোমাকে যেতে হবে না। আমি একাই পারব। তুমি ওই মুদির দোকানে গিয়ে বাটখাবা দিয়ে চাল-ডাল ওজন করো, তা হলেই চলবে।"

"ভাবছি কাজটা ছেড়ে দেব।"

"ছেড়ে দেবে? কী আমার লেখা-পড়া জানা লোক রে। বলি, চাকরিটা তোমাকে দিচ্ছে কে?"

"চেষ্টা করব, নতুন করে বাঁচব।"

"আর বয়স পেলে না, নতুন করে বাঁচার! যার বরং ভাল করে বাঁচা দরকার তার জন্যেই কিছু করো।"

"হরির জন্যে তো?"

"তাছাড়া আর কে আছে আমাদের। ওর বিয়ে-থা দাও, সংসারে মন বসবে।"

'বউকে খাওয়াবে কী? গ্যারেজে চাকবিটা করে দুটো পয়সাও তো সংসারে ছোঁয়ায়নি।"

"বিয়ে থা দাও, দেখবে কেমন বদলে গেছে। নতুন বউ এলে, সংসারে শ্রী-শান্তি আসবে।"

নতুন বউ হয়ে এল মান্তি। ঠাকুরনগরের মেয়ে। মান্তির দাদা বীরু সম্বন্ধটা এনেছিল। মান্তিরা পাঁচ ভাই-বোন। ওর বয়স যখন পাঁচ, সেইসময় ওর বাবা মারা যান। বীরুই ওকে মানুষ করেছে। দু'বেলা সংসারের হাড়ি ঠেলে, গোয়ালের গাই-গরুদের খাইয়ে এবং তারই ফাঁকে বছরে একবার নিয়ম করে চাঁপা-চন্দন ব্রতে গাঁয়ের বুড়োশিবের মাথায় জল দিয়ে হয়তো মান্তি নিজেই বড় হয়ে উঠত। ফ্রক ছেড়ে শাড়িও একটা জুটত

ওর গায়ে। তবু দাদা ওর জন্য যা করেছে, তা সে কখনও ভুলবে না। মান্তিকে সে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর যে সে আর পড়াশোনা করেনি, তার জন্য বীরুকে দোষ দেওয়া যায় না। বীরু ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে ঠাকুরনগর থেকে দমদম। একটা কড়াইয়ের কারখানায় প্রথমে লোহা গালাত। গলন্ত লোহা পাত্র থেকে নিয়ে ছাঁচে ঢালত। একদিন সেই লোহা ছাঁচে ঢালতে গিয়ে নিজের পায়েই কিছুটা উছলে পড়ল। তিন মাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল। কারখানার মালিক হাবুলবাবু সেই তিন মাস ওর বাড়িতে মাইনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার তিন মাস পর বীরু সুস্থ হলেও তার ডান পায়ের তিনটে আঙুল কুষ্ঠরোগীর মতো গলে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে থাকার সেই সময়টায় বীরু সেই প্রথম মান্তিকে খুঁটিয়ে দেখেছিল। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে গিয়ে এই সুযোগটা সে পায়নি। বিছানায় শুয়ে বীরু বিড় বিড় করে বলেছিল, "গলন্ত গরম লোহার পায়েস পায়ে পড়েছিল বলেই না মান্তি যে বড় হয়েছে বুঝতে পারলাম। ছোট বোন সবচেয়ে আদরের হয়। কিন্তু ও তো কিছুই পায়নি আমার কাছে। নিজে থেকেই মান্তি কত কিছু শিখেছে। পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে রোজ কী সুন্দর ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়।

"মান্তি, শোন।" বীরু একদিন ডাকল ওকে।

মান্তি তখন ঘরের কোণ থেকে নড়বড়ে টুলটা এনে দাদার বিছানার কাছে রাখছিল। টুলটা রেখে খাবার নিয়ে আসবে। বীরু দেখল মান্তির শাড়ি ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। কয়েক জায়গায় বেপরোয়া সেলাই দিলেও, যে কোনও মুহূর্তেই আরও ছিঁড়ে যাবে। হঠাৎ কী মনে করে পায়ের ব্যান্ডেজের দিকে তাকাল বীরু। যা বোঝার বুঝতে সময় লাগল না।

"বাড়িতে পুরনো শাড়িও নেই তাই না রে।" বীরু জিজ্ঞেস করল।

মান্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"তা বলে নিজের পরনের শাড়ি ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ করে দিবি?" লোহার কারখানায় কাজ করতে করতে যে বীরু লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে সেও আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না।

"এই সংসারে তোকে কষ্ট ছাড়া আমরা আর কিছুই দিতে পারলাম না।"

বাবা মারা যাওযার পর বছরও ঘোরেনি, ওদের মা'ও চোখ বুজলেন। সামান্য জ্বরজ্বালা, সেটাই যে তাঁকে চিরদিনের মতো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে ওরা ভাবেনি। আট ভাইবোনের মধ্যে কেউ কেউ এখানে-ওখানে ছিটকে গেছে, কেউ বিয়ে থা করে সংসার পেতেছে আলাদা জায়গায়, থেকে গেছে শুধু বীরু আর মান্তি।

"আমি তোকে খুব কষ্ট দিলাম মান্তি। দেখি, যদি তোর বিয়ে-থা দিতে পারি।"

"আমি কী দোষ করলাম যে আমাকে পর করে দেবে?" কান্নায় মান্তির গলা বুজে এসেছিল।

"উপায় কী বল। সারাদিন আমি থাকি না। ফিরতে রাত হয়। তারপর খেয়ে-দেয়ে

মড়ার মতো ঘুম! আবার সকাল হতে না হতেই ট্রেনের তাড়া। তোকে আর কতটুকু সময় দিতে পারছি?"

তারপর একদিন বীরুই মান্তির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল নগেনের বাড়ি। হরির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব। হরি সুপাত্র নয়। তবে বাবা-মায়ের এক ছেলে, গ্যারেজে মেকানিকের চাকরি করে। চাই কী দেখতে দেখতে নিজেও হয়তো একদিন একটা গ্যারেজ খুলে বসবে। বাস, সরকারি জিপ আর বাবুদের গাড়ি সারাতে নিজেই দু'দশটা মেকানিক রাখবে—এরকম একটা ছবি বীরুকে দিয়েছিল কড়াই-কারখানারই এক কর্মী। বলেছিল, "দ্যাখো বাপু, সুপাত্র চাইলেই বা পাবে কোথায়। নিজের অবস্থাটাও তো তোমাকে দেখতে হবে।"

বীরু আর আপত্তি করেনি। ছুটির দিন দেখে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন বীরুর প্রস্তাব শুনে নগেনের চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিল অচলা। দুপুরে নগেনের পাশে বীরুকে আসন পেতে খেতে বসিয়ে বলেছিল, "হরি আমার খুব পয়া ছেলে। ওর বিয়ে দেব—কথাটা ভাবতে না ভাবতেই সম্বন্ধ এসে পড়ল।"

বীরু বলল, "আমার বোন মান্তিকে দেখবেন, খুব ভাল মেয়ে। আপনাকে হেঁশেলে ঢুকতেই দেবে না, সংসারের কাজ করতে পেলে ও আর কিছু চায় না।"

মান্তির সঙ্গেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল হরির। তার আগে যা যা করা দরকার, সবই করেছিল নগেন। বীরু যেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল সেদিন জেলেপাড়ায় গিয়ে ধারে কিছু চারাপোনা এনেছিল। হরির বিয়ের আগেও ধারদেনা করে ছেলের বউয়ের জন্য শাড়ি, রোল্ডগোল্ডের হার, চুড়ি কিনে এনেছিল। এমনকি, অচলাকেও চেয়েছিল একদিন মেয়ে দেখাতে নিয়ে যেতে। অচলা যায়নি। তবে, বহু বছর পর সেদিনই প্রথম অচলার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখেছিল নগেন। রোল্ডগোল্ডের হার ও চুড়ির চেয়েও চকচকে হয়ে উঠেছিল অচলার এবড়োখেবড়ো মুখ।

"তুমি যাচ্ছ। আবার আমাকে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার!" অচলা বলেছিল।

"আমি ঠিক পছন্দ করতে পারব তো?"

"তোমার সঙ্গে হরিও তো যাচ্ছে। বিয়েটা তো ওরই। ও যা বলবে, তাই হবে।"

হরি যে অসম্মতি জানায়নি, তার প্রমাণ মান্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বীরুর কথাটা সত্যি হয়নি। বীরু সেই যে অচলাকে বলেছিল, "আমার বোন মান্তিকে দেখবেন, খুব ভাল মেয়ে, আপনাকে হেঁশেলে ঢুকতেই দেবে না"—এই কথাটাকেই বানচাল করে দিয়েছে হরি। ভোরবেলা উঠেও কোনওভাবেই হরির হাত থেকে ছাড়া পায় না মান্তি। বিছানাতেই ছটফট করতে থাকে। হরি ঘুমোচ্ছে ভেবে যেই উঠতে যাবে, অমনি ওর গলা কিংবা কোমর জড়িয়ে দুটো হাত ওকে অবশ করে দিয়েছে। মান্তি প্রথম প্রথম এটাকে আদর বলে ভুল করত, পরে বুঝতে পেরেছে এটা অত্যাচার। লজ্জায়, দুঃখে সে কুঁকড়ে যেত। দুঃখ হত অচলার জন্য। ওঁকে কেন বাসন মাজতে হবে, রান্না করতে হবে! আমি তো আছি। নতুন বউ হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এ বাড়িতে তো আমার

অনেকদিন হয়ে গেল। মান্তি শুয়ে শুয়ে এ সব কথা ভাবে, আর বিছানায় তার পাশে নেতিয়ে থাকা লোকটার ওপরে ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়।

"শোনো, মা কী বলছেন।" মান্তি সেদিন হরিকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করল।

"মা আর নতুন কী বলবেন?"

ওদিকে অচলা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। "ও হরি, শোন বাবা। তোর বাবা এখনও ফেরেনি। কয়েকদিন ধরে ওর শরীরটা ভাল নেই। মাথা ঘুরছে। গিয়ে দ্যাখ না বাবা, কোথাও পড়ে-টড়ে থাকল নাকি।"

"শোনো, মা বলছেন বাবা এখনও ফেরেননি। বাবার শরীর খারাপ।" মান্তি সেদিন হরিকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করল।

"মা আর নতুন কী বলবেন?"

ওদিকে অচলা তখনও আকুতি-মিনতি করছে, "ও হরি, শোন বাবা। তোর বাবা এখনও ফেরেনি।"

"শোনো, বাবা এখনও ফেরেননি। মা বলছেন।"

"এমন তো নয় যে, বাবা বেপাত্তা হয়ে গেছে।" হাই তুলে বলল হরি। "বেরিয়েছে তো সকালে। ঘণ্টা-দুই বাবাকে না দেখেই কি মায়ের মন ছটফট করে উঠল? এদিকে তো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া।"

"ওঠো, তুমি গিয়ে দেখে এসো, কোথায় গেলেন।"

"যাবে আর কোথায়? যাওয়ার কি আর জায়গা আছে?" হরি আবার হাই তুলল। এত হাই ওঠে মানুষের! মান্তি ভাবল। হরির হলুদ দাঁত, চড়া-পড়া জিভ, মুখের ভেতর পুঁজ-টসটসে ফুস্কুরি দেখেই গা ঘিনঘিন করে। মাথার চুলে ময়লা জমেছে। এত ময়লা যে, মোটা দাঁড়ার চিরুনিও হোঁচট খাবে। চ্যাটচেটে চুল কপালে ঝুলে থেকে চোখের খানিকটা ঢেকে দিয়েছে। চালাঘরের রোদে-পোড়া, জলে ভেজা কালো কালো খড়ের নুড়োগুলোও এর চেয়ে সুন্দর। মান্তির গা গুলিয়ে উঠল।

"তোমাকে দেখলেই গা বমি বমি করে—" মান্তি এক ঝটকায় হরিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হরির গা থেকে সব সময় একটা বোঁটকা গন্ধ বেরোয়। সেই গন্ধটা এখন আরও তীব্রভাবে মান্তির নাকে এল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে দরজা খুলে বাইরের উঠোনে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু তখনই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে হরি। ওর চোখ দুটো জ্বলছে।

"ছেড়ে দাও বলছি। আমি গিয়ে দেখি বাবার কী হল।"

"আমার বউ কখন কী করবে, কোথায় যাবে তা আমি ঠিক করব, বুঝেছ? আমার কথার অবাধ্য হলে আমি ছেড়ে দেব না, জেনে রাখো।"

"কী করবে তুমি? মারবে? তোমার কাছে থাকতেও আমার ঘেন্না করে।"

মান্তিও আজ ছেড়ে কথা বলবে না। উত্তেজনায় সে কাঁপছে উঠোনের বাতাসী

লাউ-লতাটার মতো।

সে যে এভাবে রুখে দাঁড়াবে হরি ভাবতেও পারেনি। হরি ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তাছাড়া একবার মেজাজ দেখিয়ে দুম করে গুটিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। হরি ফুঁসে উঠল, "ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

"আর ভালটা হওয়ার আছেই বা কী!" মান্তি আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

"খুন করে ফেলব। তুমি আমাকে চেনো না।"

দরজায় দুম দুম করে শব্দ উঠল। কাদা পেরিয়ে অচলা প্রায় ছুটে এসেছে। "হরি, দরজা খোল বাবা। সকালবেলা এমন করতে নেই।"

হরি একবার মান্তির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর দরজার হুড়কোটা খুলতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "এসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না। তুমি যাও, দরজা খোলো গিয়ে।"

মান্তি দরজা খুলল। দেখল অচলার পাশে নগেনও দাঁড়িয়ে আছে। নগেনের হাতে ছোট একটা থলি।

"হরি, কী হয়েছে, বাবা? সকালে এমন তিরিক্ষে মেজাজ।" নগেন আরও কিছু বলত। কিন্তু অচলা ওকে থামিয়ে দিল।

"দ্যাখ হরি, তোর বাবার কাণ্ডটা দেখ। রেশনে চাল দিচ্ছিল। শস্তায় ভাল চাল। রেশন আনতে গিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে।"

"না, মানে জামার বুক পকেটেই তো দশ টাকার নোটটা রেখেছিলাম। রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক পড়ল, আমার কার্ডের চাল ওজন হল তখন টাকা মেটাতে গিয়ে দেখি নোটটা নেই। এদিক ওদিক কত খুঁজলাম। ভাবলাম যদি কোথাও পড়ে থাকে। পেলাম না। কোথায় যে হারালাম—"

"তোমার এই কাঁদুনি শুনতে ভাল লাগে না। দশ টাকার নোটটা সত্যিই ছিল কি না বলো তো?" অচলা জানতে চাইল। উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি সে নামিয়ে রেখে এসেছে। কাঠকুটোর আগুনে ঝলসে-যাওয়া চেহারাটার জ্বালা এখনও জুড়োয়নি। "সত্যিই ছিল। আমি মিথ্যে বলব কেন?"

"হরি, শুনলি তো। আগে তো তুমি কখনও মিথ্যে বলতে না।"

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল হরি। এবার এগিয়ে এসে বাবার সামনে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ। মিথ্যে কথা বলতে পুরুষ মানুষের লজ্জা করা উচিত।"

"মা, আপনি এ কী করছেন! ছেলেকে দিয়ে বাবার অপমান করাচ্ছেন?" মান্তি দু'হাত জড়িয়ে ধরল শাশুড়ির।

"আমি কেন ওর অপমান করাতে যাব? ও তো নিজেই চায় লোকে ওকে অপমান করুক।" অচলা বলল।

"আমি তো আপনার ছেলেকে জানি। ওর সবসময় মাথা গরম কখন কী করে

বসে—"

"তোমার একটু শিক্ষা হওয়া উচিত। কুঁড়েমি করে করে আমাদেব সবার জীবনটা নষ্ট করে দিলে। লোক-দেখানো একটা চাকরি করেই ভাবছ পার পেয়ে যাবে। সাবাজীবনই আমাদের ঠকিয়ে গেলে—" অচলা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হরি ওর বালিশের নীচ থেকে দশ টাকার একটা নোট বের কবে এনে অচলার হাতে দিয়ে বলল, "মা, এই নাও। নোটটা বাবা হারায়নি। মিথ্যে কথা বলছে।"

"তা হলে কোথায় ছিল নোটটা?"

"কোথায় আবার! আমার বালিশের নীচে। নিজের চোখেই তো দেখলে। ইচ্ছে করে আমিই ওটা সরিয়ে এনে বালিশের নীচে রেখেছিলাম।"

"ইচ্ছে করে? মানে? কী বলছ তুমি?" মান্তি ছটফট করে উঠল। কান্না ওর চোখে শুকিয়ে গেছে। মাথাটাও কাজ কবছে না। উঠোনের কাদার মতো তলতল করছে সমস্ত শরীব।

কিন্তু উত্তর যার কাছে চাওয়া হয়েছে, তা'র মধ্যে অস্থিরতার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কেনই বা সে অস্থির হবে! উঠোনের কাদা আর লাউ-লতা তো সে নয়।

"হরি, এটা কি তুই ভাল করেছিস বলতে চাস?" অচলার গলাতেও কী যেন আটকে গেছে। ফুটন্ত ভাতের ডেকচিব ঢাকনাটাব মতো সে থব থর কবে কাঁপছে। সে-রকমই বুক-চাপা একটা কষ্ট।

অচলা আবও কী যেন বলতে চাইছিল। কিন্তু নগেন ওর হাতে হাত রেখে বলল, "ডেকচিটা বসাবে চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রোদে একটু একটু করে শুকিয়ে আসছে উঠোনের কাদা। অল্প হাওয়ায লাউ-লতাটা দুলছে। হেঁশেলঘরের দাওযায় এখন ছেঁড়া একটা চট বিছিযে বসে আছে নগেন। এনামেলের তোবড়ানো বাটিতে কিছুটা মুড়ি ঢেলে দিয়ে গেছে অচলা। দিয়ে গেছে কাঁচা একটা লঙ্কা। মুড়ি চিবোচ্ছে নগেন।

"হ্যাঁ গো, একটু চা হবে নাকি?" এক সময় সে বলল। কিন্তু তাব আগেই উনুনে চায়ের জল চাপিয়েছিল অচলা। কিছু পরে গ্লাসে চা নিয়ে এসে সে নগেনের পাশে বসল।

"তুমি কখনও ওকে কিছু বলোনি। সেইজন্যেই ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেল।" অচলার কষ্টটা আরও বেশি করে আজ ফুটে উঠেছে।

"কার কথা বলছ?"

"কার কথা আবার! বাড়িতে ছেলে আব কে আছে?"

"ও হো! হরি, তুমি হরির কথা বলছ?"

"আজ কাব মুখ দেখে উঠেছিলাম! সাতসকালেই তুমি আমাকে যে কষ্ট দিলে। তোমার না হয় কিছু গায়ে লাগে না—"

"কষ্ট কেন! আজ তো কিছু পাওয়ার দিন। হরি তো স্বীকার করল।"

"কী স্বীকার করল? ছেলেটা একেবারে শয়তান।"

“ও কথা বলো না। মুখ ফুটে ক'জনই বা স্বীকার করে! হরির সাহস আছে। সৎ সাহস।

“তুমি বলেই ওকে ক্ষমা করতে পারলে। বালিশের নীচ থেকে যখন নোটটা বের করল তখনই তো তোমার কিছু বলা উচিত ছিল।”

“আঃ ওসব কথা ছাড়ো। বললাম না, আজ কিছু পাওয়ার দিন। কেউ তো আমাকে কখনও কিছু দেয়নি। হরি তো দিল।”

“কী দিল? তোমার টাকাটাই তো বালিশের নীচ থেকে বের করল---”

“সেটাও তো দেওয়া। যদি বেমালুম চেপে যেত, আমি কি কিছু বলতে পারতাম। তুমিও কি বিশ্বাস করতে, আস্ত দশ টাকার একটা নোটও আমার পকেটে থাকতে পারে! গরিব হওয়ার এটাই তো অসুবিধে। হরি আমার সম্মান বাঁচিয়েছে। ওরও অসম্মান হয়নি। বাবার কাছে ছেলের আবার লজ্জা কী!”

দাওয়ায় রোদ এসে পড়েছে। সেই রোদে সম্পূর্ণ অচেনা একটা লোক যেন অচলার কাছে বসে আছে। তাকে কেন এতদিন সে বুঝতে পারেনি, এটা ভেবেই আরও বেশি কষ্ট হল অচলার। হেঁশেলে ফিরে যেতে যেতে সে শুধু বলল, “যাই, ভাতটা নামাই।”

পেড়াইদার

জিতু আর এঁড়ে বাছুরটা একই সঙ্গে মানুষ হচ্ছে। বাছুরটার যখন জন্ম হয় তখন জিতু বলেছিল, এটা আমার বাছুর। বাড়িতে গোয়াল-ভরা গাই-বাছুর। ছাগল হাঁসও কিছু কম নেই। তবু ওর ওপরেই জিতুর মমতা বেশি। বাবা বলেছিলেন, তোর যখন এত পছন্দ, ঠিক আছে, এটা তোকেই দিয়ে দিলাম। জিতুর তখন বয়স বেশি নয়, আট, কি ন'বছর।

বাছুরটার ওপর ওর এই মমতার একটা কারণও আছে। সংসারে যারা কোনও নিয়মে বাঁধা পড়ে না, তাদের জন্যে কারও না কারও চোখের জল জমা থাকে। নিয়ম না মানলে হঠাৎ হয়তো হোঁচট খেতে হয় ব্যথা লাগে। তখনই দরকার পড়ে নিভৃত কোনও মমতার। কেউ কেউ তা পায় না। পেয়েও অগ্রাহ্য করে। এই বাছুরটাও তেমনি। জিতুর সব ভালবাসা সত্ত্বেও সে অন্যদের জ্বালাতন করে। অন্যদের দড়িতে বাঁধা যায়, তাকে যায় না। এমন দৌড়ঝাঁপ শুরু করে যে, অন্যরা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয়। সে ওলট পালট করে খড়ের গাদা, ঝটকা দিয়ে ফেলে দেয় দুধের বালতি। জিতু তাতেই মজা পায়। সে আর ওই দামাল বাছুর একই সঙ্গে মানুষ হচ্ছে।

বাছুরটা যতই উৎপাত করুক, ওর পিঠে লাঠিগাছা ভাঙতে কেউ সাহস পায় না। তাহলে জিতু কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। না হয় বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করবে। একমাত্র ছেলের আবদারে বাবাও মুখ বুজে থাকতে পারবেন না। সুতরাং বাছুরটা যেভাবে মানুষ হচ্ছিল, সেভাবেই হতে থাকল।

উঠোনে অড়হরের ডাল শুকোতে দেওয়া হয়েছিল। সে এসে খচমচ করে খেতে শুরু করে দিল। লোভী হাঁসের বাচ্চাগুলো ওর ভয়ে আর সেদিকে ভিড়তেও পারল না। হয়তো সুযোগ পেলে ওরাও দু'মুঠো ডাল খেয়ে যেত। খুঁটিতে বাঁধা খাসিটা যদি একটু ছাড়া পেত, তাহলে সেও বাদ যেত না। উঠোনে মেলে দেওয়া ডাল আগলাচ্ছিল কার্তিক। সে এই বাড়ির মাহিন্দর। সে পর্যন্ত বাছুরটাকে সমীহ করে। শুধু আলতোভাবে ওর লেজটা একটু মুচড়ে দিয়ে সে ওকে গোয়ালে ফেরত পাঠাল। এ ভাবেই চলছে।

গ্রামের হাইস্কুলে পড়ে জিতু। পড়াশোনায় ওর যে খুব একটা মন আছে তা বলা যায় না। ক্লাস এইটে উঠতে উঠতেই দু-দু' বার আটকা পড়ে গিয়েছিল। বাবা এটা মেনে নিয়েছিলেন। সবাই তো পড়াশোনায় ভাল হয় না। তা বলে কী জীবনটা তাদের বরবাদ হয়ে যাবে। তিনি চাইছিলেন, জিতু এখন থেকেই জমিজমার কাজে মন দিক। যা জমিজামা আছে তা নেড়ে চেড়ে খেলেই ওর চলে যাবে। আছে দু-দুটো পুকুর। মাছ-ভাতেরও সংস্থান হয়ে যাবে। মরশুমে ঠিকমতো পোনা ফেলতে পারলে বাড়তি কিছু রোজগারেরও

উপায় ওর জন্যে থাকবে। এটা জিতুও জানে। সে জানে কোনও জমিতে ভাল বালাম চাষ হয়, কোন জমিতে তাইচুং কিংবা আই আর এইটের ফলন হয় লাভজনক। কিন্তু জানলে কী হবে. জমির আল সে মাড়ালে তো! ওর এসব ভাল লাগে না।

আলাদা করে ওর যে কিছু ভাল লাগে তাও নয়। জীবনের নিজস্ব যে গতি আছে, তার সঙ্গেই নিজেকে সে জড়িয়ে নিয়েছে। গরুর গাড়ি মন্থর চাকা ভোঁতা একটা যন্ত্রণার ক্ষত সৃষ্টি করে গ্রামের পথে গড়িয়ে যায়। এরকমই জীবন জিতুর। আর লাঙল যেমন শুকনো জমির বুকে ক্ষতসৃষ্টি করে, সেরকমই একটা যন্ত্রণার দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন তার বুকে গেঁথে বসল, যেদিন বাব মারা গেলেন। জিতুর তখন গ্রীষ্মের ছুটি। সেই ছুটিটাই দীর্ঘতম ছুটি হয়ে গেল। তার বাড়ির বাগানে ফুটেছে সাদা করবী। গাছে জল না দিলেও ফোটে। জিতু দেখল, মায়ের পোশাকটাও ওই করবী ফুলের মতো ধবধবে সাদা হয়ে গেল।

তারপর একসময় চাল-ধোওয়া জলের মতো হয়ে গেল মায়ের ধুতির রং। শেষ বিকেলের সূর্য যখন আকাশটাকে প্রসাধনে সাজায়, মা তখন, এই কিছুদিন আগেও পুকুরের ঘাটে মুখ ধুয়ে এসে ঘরের ময়লা আয়নায় চুল আঁচড়াতেন, ধোওয়া কাপড় পরতেন, সিঁথিতে চওড়া করে দিতেন সিঁদুর। কপালে দিতেন টিপ। এই ক'দিনে পৃথিবীর কোনও কিছু হারাল না। শুধু হারিয়ে গেল এই ছবিটাই। জিতুও রাতাবাতি বড় হয়ে গেল অনেক।

বড় হয়েছে বাছুরটাও। ওর তো কোনও চিন্তা নেই। খোল ছড়ানো খড় পায়, সময়মতো পায় জল। গোয়ালের বলদগুলো মাঠে চাষ করতে যায়। দুধের গরুগুলো যায় মাঠে। সেখানে তাদের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায় কার্তিক। বুড়ো দুটো বলদই শুধু গোয়ালে থাকে। আর থাকে এঁড়ে বাছুর। খেয়েদেয়ে ওর গায়ের রং হয়েছে চিকচিকে। হরিণের চামড়ার মতো চকচকে বাদামি ওর রং। হরিণের সাদা ছিটেগুলোই শুধু নেই।

মা একদিন বললেন, পেড়াইদার ডেকে নিয়ে আয়। বাছুরটা তো এখন বড় হয়েছে। এভাবে আর ওকে ফেলে রাখা যায় না। চাষের কাজে লাগানো দরকার। বলদগুলোরও তো বয়স হচ্ছে।

পেড়াইদার নামে আলাদা কোনও জীবিকার মানুষ নেই এই গ্রামে। চাষের কাজ করে একজন। এঁড়ে বাছুর বলদ করার জন্যে দরকার হলে তারই ডাক পড়ে। জিতু বুঝতে পারল, সেদিন আর খুব একটা দূরে নেই, যেদিন ওর এঁড়ে বাছুরটা বলদ হয়ে ঘাড়ে জোয়াল নেবে।

বাবার মৃত্যুর পর জিতুও তো বদলে গেল অনেক। রোদ-জল-ঝড়ে চাষের জমিতে ঘুরে ঘুরে ওর শ্যামলা রং আরও পুড়ে গেছে। বিডিও অফিস, সারের দোকান, পঞ্চায়েত দপ্তর—যেখানে যখন যা কাজ পড়ে জিতু নিজে সেখানে যায়। বাবাও তাই করতেন। সংসারের জোয়াল এভাবে আস্তে আস্তে ওর ঘাড়ে চেপে বসছে। একটা ভারী কাঠের ওজন ক্রমশই আরও বেশি করে টের পাচ্ছে জিতু।

'পীড়ন' থেকেই কি এসেছে পেড়াইদার কথাটি? সেদিন পেড়াইদার এল সঙ্গে একটি লোক নিয়ে। এঁড়ে বাছুরটাকে গোয়াল থেকে উঠোনে আনল কার্তিক। গোয়াল

ছেড়ে সে কিছুতেই আসবে না। বোধহয় কিছু টের পেয়েছে। কার্তিক ওকে জোর করেই নিয়ে এল। এই প্রথম লাঠির কয়েকটা ঘা পড়ল ওর পিঠে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে পুরোপুরি বয়স্ক হয়ে গেল। পেড়াইদারের সঙ্গী অদ্ভুত একটা কায়দা করে ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলল। ছোট একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল পেছনের দুটো পা। সামনের দুটো পায়ে আর একটা দড়ি বেঁধে শক্ত করে ধরে থাকল কার্তিক। ওর আর বাধা দেওয়ার কোনও ক্ষমতাই থাকল না। সামান্য একটা ছুরি দিয়ে কী বিরাট পরিবর্তনই না ঘটিয়ে দেওয়া যায়! পাকাপাকি ব্যবস্থা, যাতে সে বলদ হয়ে বাদবাকি জীবন জোয়াল নিয়ে হাঁটাচলা করতে পারে। শরীর ছিঁড়ে বের করে আনা মাংসখণ্ডটা পড়ে থাকল মাটিতে। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্রোপচারের জায়গাটিতে ঘুঁটের ছাই ঘষে দিল পেড়াইদার। মাত্র কয়েক মিনিট। তারপরেই সে উঠে দাঁড়াল। ওর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। চোখের কোণ ফেটে বেরিয়ে আসছে, জল। গোঁয়ারের মতো আর সে চলাফেরা করতে পারবে না যেখানে খুশি। ভারী কাঠ কখন ঘাড়ে নেমে আসবে এখন শুধু তারই অপেক্ষা। ওর অভিমানী চোখের দিকে তাকাতে পারল না জিতু। কেউ যদি অন্যভাবে বাঁচতে চায় পারবে না? তাকে বোঝা বইতেই হবে?

মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না। শাড়ি আর কত ময়লা হবে, কিন্তু মায়ের চেহারা আরও কালো হয়ে গেল। সাদা করবী এখনও ফোটে। গাছটাও গায়ে-গতরে বেড়েছে। তা হলে মা কেন দিনে দিনে এমন ম্লান হয়ে যাবেন? জিতু ভাবে। কিন্তু এরকম ভাবনাচিন্তার সত্যিই কি কোনও মানে আছে? মানে নেই। তবু জিতু এই ভাবনাতেই কাতর হয়ে পড়ে। দিন চলে যায়।

বড়রা এই অবস্থায় যা করেন, মাও তাই করলেন।

'জিতু তুই এবার বিয়ে কর। আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

আর পাঁচটা ছেলে যা করত, জিতুও তাই করল। যেদিন ওর বিয়ে, সেদিনই নামল আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি। বেশ কয়েকদিন ধরেই আকাশে মেঘ ঘোরাফেরা করছিল। বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে আসার জন্যে মেঘেরও একটা বয়স দরকার। দিন আর মাস কাটতে কাটতে আকাশের মেঘেরও সেই বয়স হয়েছে। সেই বয়স যা বাড়ির নবীন বলদটিকে নিয়ে গেল মাঠে। ভিজে জমিতে পড়ল লাঙলের দাগ। শরীরে ছিটকে লাগল কাদা। বাড়ি ফিরে বাদামি, মসৃণ চামড়া ধুয়ে ফেলার পরেও লোমকূপে মাটি লেগে থাকল। রোজই কোথাও না কোথাও চাষ থাকে। আজ ন'পাড়ার জমি, কাল চাঁপাবেড়িয়ার ধার, পরশু বিজপুরের মাঠ। জিতুর গোয়ালের নবতম সংযোজনটির আর বিশ্রাম নেই। এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়ম। বয়স হয়েছে বলে জিতু এখন এটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে। আমরা চাই বা না চাই জোয়ালের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে। কেমনভাবে বেঁচে আছি এই প্রশ্নটাই জিতু আর নিজেকে করে না। এই প্রশ্ন করার জন্য যে বোধ ও সংবেদন-শীলতার প্রয়োজন তা অনেক আগেই ভোঁতা হয়ে গেছে। একসময় সে নিজেকে বলত, তুমি কি পারো মনকে নতুন করে বাঁচাতে? সেই তখন যখন সে অনেক সময় পেত পুকুরপাড়ে

গাছতলায় বসে পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরার কিংবা একা একা অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার। চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে। আরও কুড়িটা বছর কি পারব না, নতুন করে বাঁচতে? এই প্রশ্নটা আর কাকে করবে? দরকার আছে কী! জিতু এটা অন্তত বুঝতে পেরেছে,যারা বলে মানুষের জীবন একশো বছর, তারা ঠিক বলেনি। ষাটের পর যে ক'টা বছর পাওয়া যায়, সেটাই লাভ। গ্রামে-গঞ্জে আগে যাত্রা হত সারারাত। এখন তা কমতে কমতে আড়াই তিন ঘণ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে।

জিতু ওর ছেলেকে বলেছে, "জানো বাবা, নিজের জীবনের চেয়ে বড় কাহিনী আর কিছুই নেই।"

অরুণের বয়স এখন আট। গরু-ছাগল, হাঁস, পুকুরের মাছ ও জমিজমা নিয়ে বাবাকে যে কী পরিশ্রম করতে হয় তা সে দেখেছে। আজকালকার ছেলেরা বোধহয় অল্প বয়সেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। তাই বাবার কথা হেঁয়ালি বলে মনে হয় না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিতু নিজেকে ভুলে হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি কি আমাকে আবার বাঁচাতে পারবে বাবা? ওই যে টগর গাছটা দেখছ, ওর গন্ধ, লাবণ্য থাকবে আরও অনেক দিন। কিন্তু আমি থাকব না।"

গ্রামের কয়েকটি লোককে দেখিয়ে জিতুই একদিন অরুণকে বলেছিল, "এদের কোনও ধর্ম নেই। ওরা হিন্দু নয়, খ্রিস্টান নয়, ওরা ধনী। ভালভাবে বাঁচতে হলে তোমাকেও ওদের মতো হতে হবে। আদর্শবাদের কথা যে যাই বলুক, যাদের তেমন টাকাপয়সা নেই তাদের জন্যে এই দেশটা নয়।"

অরুণের পক্ষে কথাগুলো ভারী। আর জিতু ভাবল, ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে ওর সহজ স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পথ এখন থেকেই হয়তো রুদ্ধ করে দিচ্ছে। তবু যদি সে মানুষ হয়। বাবা অনেক কষ্ট করেছেন। জমির আলে আলে ঘুরেছেন। বৃষ্টিতে ভিজেছেন। একবার তো আলকেউটের কামড় থেকেই বেঁচে গিয়েছিলেন। পরপর তিন বছর খরায় জমির ধান জ্বলে পুড়ে গিয়েছিল। গম্ভীরা নদীর ধারে যে সব জমি আছে, সেগুলোর ধান তো প্রায়ই বানের জলে ভেসে যায়। দু-দুটো পুকুরের মাছ ফলিডল দিয়ে মেরে ফেলেছিল কারা। পচা মাছের গন্ধে বাড়িতে তিষ্ঠানোই ছিল দায়! মাছের সেই আবর্জনা পরিষ্কার করারও লোক পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত কার্তিক আর ওর ভাই ঝুড়ি ঝুড়ি পচা মাছ তুলে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল। জিতু ভাবল, আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি লুকনো আলকেউটের ভয়, ফলিডল দিয়ে মেরে ফেলা মাছের আতঙ্ক, খরা কিংবা বানের উত্তরাধিকার। পুকুরের পাড়ে আমগাছের ছায়ায় বসার শান্তিটুকু যে নেই, তা নয়। তবে এত রুক্ষতার মধ্যে এই ছায়ার বিস্তার বড়ই কম। ছায়ার যেটুকু বা আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা, তা চড়া রোদে ক্ষণস্থায়ী হয়ে ওঠে।

বিকেলে গাই-গরুগুলো ফিরে আসে গোয়ালে। তার আগেই খড় কেটে, খোল ছড়িয়ে পাতনা সাজিয়ে রাখতে হয়। ওদের তর সয় না। জাবর কাটার শব্দে সন্ধে নেমে আসে। ততক্ষণ পর্যন্ত তদারকি করতে হয় জিতুকে। সবচেয়ে ছোট সেই বলদটির গায়ে

হাত বুলিয়ে দেয়। মসৃণ চামড়ায় শিহরন খেলে যায়। অভিমানী চোখে সে এখনও তাকিয়ে আছে কিনা অন্ধকারে বোঝা যায় না।

জিতুর স্ত্রী কমলা লণ্ঠন জ্বালিযে রাখে।

কুয়োতলায় হাত-পা ধুয়ে জিতু দাওয়ায় এসে বসে। তার আগেই অরুণ পড়তে বসে যায়। পড়াশোনা নিয়ে ওকে কোনও কথাই বলতে হয না। আশ্চর্য একটা দায়িত্ববোধ ওর মনের মধ্যে এখনই জন্মে গেছে। জিতু ভাবে, আমার এই গুণটা ছিল না। থাকলে জীবনটা হয়তো অন্য রকম হত। অন্যরকম মানে ঠিক কী রকম তা অবশ্য সে বলতে পারবে না।

জিতুর মা বলল, শোন অরুণকে তুই ভাল একটা স্কুলে দে। ওর যা পড়াশোনার ঝোঁক, তাতে ও নিশ্চয় ভাল ফল করবে। আমি যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয় দেখে যেতে পারব। তুই বরং ওকে কোনও হোস্টেলে রেখে পড়া। আমরা কষ্ট করে ওর পড়াটা চালিয়ে দিতে পারব।"

"কিন্তু মা, এই বয়সেই কি ওকে হোস্টেলে পাঠানো ঠিক হবে! বাড়িব স্নেহ মমতারও তো দরকার আছে।"

"না, যা বলছি শোন। ও দেখিস আমাদেব সবাব মুখ উজ্জ্বল কববে।"

খেতে বসে অরুণকে কথাটা জিজ্ঞেস করল জিতু।

"তুই কি হোস্টেলে থেকে পডবি? আমাদেব ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না?"

"তোমাদের কষ্ট হবে না?"

কথাটা তো ভেবে দেখেনি জিতু। সত্যিই তো, অরুণ যদি চলে যায়, তা হলে কাকে নিয়ে ওরা থাকবে। জীবিকার টানে সে না হয় চরকিব মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বস্তি পাচ্ছে না। কিন্তু বাড়িতে ফিবে অরুণকে দেখেও তো সে শান্তি পায়। সেই শান্তিটুকু নিজেই নষ্ট করবে? অরুণের মনটা খুব নরম। বাবা মাযেব মুখের দিকে তাকিয়ে সে কখনও বিদ্রোহ করবে না। ওরা যা করতে বললে, করবে। কিন্তু সেটাই কি সব?

"না বাবা, হোস্টেলে থেকে পডলেই তুমি ভাল করবে।"

কথাটা বলার আগেই জিতু জানে, সে আর একটা জোয়াল ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। ওর নিজেব ব্যর্থতার দায়ভাগ এখন থেকেই অরুণকে বহন করতে হবে।

বর্ষা পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে গেল শরৎ। হেমন্তে সোনার ধানের আভায় আকাশটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শীতের মাঠ থেকে যতটুকু যা পাওয়া যায়, সবাই এসে খামারে ভবে ফেলল। ডাকঘর থেকে এল চিঠি। একটা ভাল স্কুলে অরুণ পরীক্ষা দিয়েছিল। সেখান থেকে ওর আমন্ত্রণ এসেছে। এবার যেতে হবে।

স্কুলে আসা যাওয়ার পথে অরুণ দেখত দূরের পথে ধুলো উড়ছে। মনে হত গরুর গাড়ির চাকার ধুলো। কিন্তু শুকনো পাতা উড়িয়ে সেই ধুলোর বৃত্ত যখন সাঁই সাঁই করে ছুটে যেত মাঠের দিকে তখন সে বুঝত ওটা ঘূর্ণিঝড়। ওই ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়লে নাকি বেরিয়ে আসা যায় না। মানুষ কিন্তু কখনও না কখনও ওরকম ঘূর্ণির মধ্যেই পড়ে যায়।

বেরিয়েও আসে। অরুণ ওরকম ঘূর্ণিঝড় অনেক দেখেছে। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে আরও দেখেছে পুকুরে শাপলা ফুটেছে। ফুটেছে চুংড়ি ফুল। স্কুলের পাশেই রেললাইন। আজিমগঞ্জ-নলহাটি ব্রাঞ্চ লাইন। সকাল থেকে রাত কয়েকটা ট্রেন আসা-যাওয়া করে। ট্রেনের বাঁশি মন খারাপ করে দেয়। কিন্তু ওই ঘূর্ণিঝড়, ওই শাপলা, ওই ট্রেনের বাঁশি ছেড়ে দূরে অন্য কোথাও একদিনের জন্যেও চলে যেতে ইচ্ছে করে না। অরুণ সেই কথাটাই এবার বাবাকে জানিয়ে দিল।

"আমি যাব না।"

"তা হলে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গেছিলি কেন? আগেই বলতে পারতিস।"

"তখন ভেবেছিলাম যেতে পারব। কিন্তু এখন আর আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

"একবার বলছিস যাব, তার পরেই আবার মত পরিবর্তন করবি—এ কেমন কথা! তোর ভাল হবে বলেই তো পাঠাচ্ছি।"

"এখানেই বা খারাপ কী হবে। যেতে ভাল লাগছে না।"

"এখন না হয় স্কুলের কয়েকটা বছর আমাদের কাছেই থাকলি। কিন্তু তার পরে কলেজে যখন ভর্তি হবি, তখন তো বাইরে যেতেই হবে। আমার চাকরিবাকবি জোটেনি। কিন্তু তা বলে তুই চাকরি কববি না তা কী হয!"

"পরের কথা পরে ভাবব।"

"না, তোকে যেতেই হবে। আমার কথার অবাধ্য হলে খারাপ হবে অরুণ। বলে দিলাম ফলটা ভাল হবে না। তোব সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুই তো আগে এমন ছিলি না।"

জিতুর সঙ্গে কমলাও চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

"দ্যাখো ছেলের কাণ্ড। এতদিন মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিল। যেই যাওয়ার সময় এল অমনি বলে কিনা যাব না। নিজের ভালটা বুঝবি কবে? হেলায় সুযোগ হারাস না অরুণ। যে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিস, তা ক'জন পায়?"

ছেলেকে কোনও মতেই রাজি করানো যাচ্ছে না দেখে কমলা শেষ পর্যন্ত কান্না জুড়ে দিল। যেন বাড়িতে কেউ মারা গেছে। কমলার বাবা যখন মারা যান, তখন সে এই কান্না কেঁদেছিল। রাজি না হয়ে অরুণ পারল না। কার্তিকও বলল "দাদাবাবু যাও, আবার তো কয়েকদিন পর ফিরে আসবে। ছুটি হলে আমিও বাবুর সঙ্গে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব।"

মোরগ্রাম স্টেশন থেকে ট্রেনে নলহাটি সেখান থেকে বড় লাইনে কলকাতার ট্রেন নিতে হবে। পুকুরপাড়ে কার্তিক গরুর গাড়ির ছই বাঁধছে। ছই বাঁধার পর খড় বিছিয়ে তার ওপর সতরঞ্জি পেতে দিল। আজ সে কয়েক আঁটি খড় বেশি দিয়েছে। গ্রাম থেকে স্টেশন বেশি দূর না হলেও পথ এবড়ো-খেবড়ো। ওইটুকু পথেও যেন খোকাবাবুর কষ্ট না হয়। খড়ের গদিতে আরাম করে সে যেতে পারবে।

পুকুরপাড়ে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কমলা। মা-বাবাকে প্রণাম করে অরুণ

গাড়িতে উঠেছে। কিন্তু গোয়াল থেকে কার্তিক বলদজোড়া আনতে এত দেরি করছে কেন? ট্রেন যে চলে যাবে। জিতু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কমলাও।

না, এখনও দেরি হচ্ছে কেন? ট্রেন যে চলে যাবে। জিতু গোয়ালে গিয়ে দেখল, একটা বলদ আসার জন্যে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার জুড়িটাকে টানাহেঁচড়া করেও বাইরে বের করা যাচ্ছে না। গোয়ালের সবচেয়ে ছোট বলদটা। এক সময় যে ছিল তেজী ও দামাল। যা খুশি করে বেড়াত। কারও কথা শুনত না। গায়ের চামড়া ছিল তেল চুকচুকে। বড়লোকের বাড়ির বখাটে ছেলের মতো তখন হাবভাব। এখন চেহারায় সেই ঝিলিক নেই। পাঁজরার হাড়ও বেরিয়ে পড়েছে। তেল চুকচুকে চামড়ার রং হয়ে গেছে ফ্যাঁসফেঁসে। তবু এই চেহারা নিয়েই সে রুখে দাঁড়িয়েছে। কার্তিক ওকে কিছুতেই গোয়ালের বাইরে বের করতে পারছে না। লেজ খুঁটি থেকে দড়ি খুলে টানাহ্যাঁচড়া করেও লাভ হচ্ছে না। ধরে 'হেট হেট' করে ডাকতে গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে, শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে।

জিতু আব সহ্য করতে পারল না। কার্তিকের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে সজোরে ওর পিঠে বসিয়ে দিল। একবার নয়, পরপব কয়েকবার। বলদটা শুধু একবার চোখ তুলে জিতুর দিকে তাকাল। সেই অভিমানী চোখ। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই চারটে পা এমন শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকল যে ওকে নড়ানো গেল না। পা নয়, যেন চারটে খুঁটি মাটিতে পোঁতা আছে।

জিতু লাটিটা ক্রমাগত ওর পিঠে পেটাতে লাগল। বলদটা উপায় না দেখে মাটিতে মুখ থুবড়ে বসে পড়ল। যেন পণ করেছে, ওকে ওঠানো যাবে না।

নলহাটির ট্রেন এতক্ষণ মোরগ্রাম স্টেশনে পৌঁছে গেছে।

রাজফড়িং

সেদিন খুব বৃষ্টি—শ্রাবণ মাসের মেঘভর্তি আকাশ ভেঙে পড়েছে দালানে, মাঠঘাটে সকাল থেকে বাদল, জানলায় বসে আছি বিদ্যুতের হিরের ছুরি ঝলসে যাচ্ছে ইউকলিপটাসের মাথায়—মলুয়া এসে সেলাম ঠুকে বললে—আসতে আজ্ঞা হয়?

চটি গলিয়ে নেমে গেলুম নীচে গাড়িবারান্দায়। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে ভিজে সিজে মানুষ একজন বসে ঝাঁকড়া চুলে কুঁকড়ে আছে, চুরুটের মম ধোঁয়ায় সজাগ হয়ে বললে—হুজুর পেন্নাম হই। চিনতে পারেন?

চিনতে পারিনে, চিনতে পারার কথা নয়। মুখ তুলে দেখলুম আর ভাবলুম না জানি কে, কোন পরিচয়ের সূত্র এখন ধরিয়ে দেবে। তবু যেন সে আমার অনেক কালের চেনা এমন ভাব ফুটিয়ে তুললুম ব্যাভারে।

আমি আপনার রাজফড়িং

সে আবার কে? আমাকে আবার সাত সমুদ্দুর নদী প্রান্তর জঙ্গল ধাঁধার মধ্যে নিয়ে ফেললে! আচ্ছা যা হোক! আমার অবাক হওয়ায় পালা। তবু কিছু একটা বলতে হয়, বলে ফেললুম।

দুপুরের আহার হোক এখানে, শুনব তোমার কথা।

তারপর সোজা উঠে এসেছি দোতলায়, আরাম চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছি শরীর, বসতে না বসতে।

মলুয়া এসে সেলাম ঠুকে বললে—হুজুর রাজফড়িং ফরফর করে উড়ে গেছে বাগানের ধারে পুবকোণের ঘরে। ও ঘরে আপনি কিনা থাকার হুকুম করেছেন....

মনে পড়ে না মহারাজ?

শেষ বিকেলের আঁধার আঁধার আলোয় জানলা দিয়ে সাঁতার কেটে ঢুকল রাজফড়িং। চুরুট নিভে গিয়েছিল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে ধরিয়ে দিলে সে। ঝোলা থেকে বের করে নিজে ধরালে সুতলি বিড়ি।

রক্ষে করো, গন্ধে টিকতে পারব না।

তা হলে দিন একটা চুরোট—অবলীলাক্রমে একটা চুরুট আমার অপেক্ষা না করে ধরিয়ে ফেললে, পরম সুখে টানতে লাগলে সে।

বলো কী খবর তোমার? কী চাও?

আগে বলুন মনে পড়ে কি না?

মনে পড়বে কী করে! তাকে আমি কখনও দেখিনি। নীলে সবুজে মেশানো জোড়াতালিব জামা খুলে ফেললে রাজফড়িং। পিঠের দুপাশে পাতলা চিলমিলে কাগজ দিযে তৈরি ডানা।

মনে পড়ে?

না।

জামার নীচে ডানা আমি লুকিয়ে রাখি। সকালবেলা বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল ডানা। মুখে একটা মুখোশ আছে—এখন খুলে ফেললে চিনতে পারবেন।

ধূপসোনালি একটা মুখোশ চামড়ার রঙে মিলিয়ে ছিল। সেটা সে খুলে ফেলতেই দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে পুড়িয়ে ফেললুম। কাগজ পোড়ানোর গন্ধে আবার একটা মুখোশ কোথা থেকে যেন তার মুখের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে বসল!

এবার চিনতে পারেন?

পারি, তুমি আমার বন্ধু রাজফড়িং

তা হলে চলো বাগানেব পুবধারের ঘরে। অক্ষয় মুখোশ কেবল তোমাব এই ঘরের জন্যে। জানো বোধহয় তোমার ঘর তেতলার ছাদে হলে আমি উড়তে পাবতুম না।

বাজফড়িং আমার হাতধরা মাত্র দুজন জানলাব গবাদ গলে আমগাছের মাথা পেরিয়ে ধাঁ করে নেমে পড়লুম বাগানের পুবধারের ঘরে। আমার পিঠে গঁদেব আঠা দিয়ে ফিনফিনে দুটি কাগজেব ডানা আটকে দিয়েছে সে।

সেগুন গাছের বড় বড় পাতা থেকে টসটস করে জল ঝবে পড়ামাত্র গাছতলা থেকে এক মুঠো টিপ বোতামের মতো সেগুন ফুল হাতিব অনুমান চেয়েও শুভ্র সাদা অপরূপ নক্‌শা কাটা নরম ফুল ঝরা ফুল কুড়িয়ে এনে ঘবের চার দেয়ালে ছিটিয়ে দিতেই তার চেহারা বদলে গেল। সাদা পদ্মের রক্ত কমলেব শান্ত জ্যোতি ধ্যানশ্রী বিচ্ছুরিত হতে থাকল ঘরে। কিন্তু রাজফড়িং ঝোলা থেকে চৌকো একটা কুয়াশাকাচ বের করে আমাব চোখে ধরতেই আমি আর কিছু দেখতে পেলুম না। ঘর উড়ে গিয়ে হলুদডুংরি নদীর পাশে শালবনে পড়ল।

সেখানে বসেছে সার্কাসের তাঁবু। প্রজাপতিরা ক্লাউনের জামা পায়জামা পরে রঙচঙে মখমলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমবা ঘব থেকে বেরিয়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকলুম। মুনিয়া পাখিদের খেলা তখন জমে উঠেছে। খাঁচা খুলে মুনিয়াদের ছেড়ে দেওয়া হল। তারা উড়তে উড়তে শিস দিতে থাকল জয় বিধাতার জয়। বিধাতা এখানে সার্কাসের মালিক তরুণ শ্রীমান ভল্লুক বনজাগানি। রঙিন পোশাক পরা প্রজাপতি ক্লাউন এমন সময় দৌড়ে এসে রাজফড়িঙের কানে কানে বললে—পালিয়ে যাও তোমাকে ধরে খাঁচায় পুরবে। এদের বাঘ মশায় গতকাল গা ঢাকা দিয়েছেন, তুমি তো হরবোলা।

ভালুক মাথার ওপর ব্যাটারি বিদ্যুতের চাবুক সপাং করে দু'চারবার ঘুরিয়ে নিলে। রাজফড়িংয়ের দিকে সে হঠাৎ গায়ের কালো ধুমসো লোম একগাছি ছিঁড়ে হাওয়ায় ইড়িক্ বিড়িক্ চিড়িক্ মন্ত্র দিয়ে তাকে সম্মোহন করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু রাজফড়িংকে পায়

কে? সে তখন আকাশ-গ্যালারিতে। আমি বেকুব বনে গেলুম। ইন্দ্রজালের ভেল্‌কিতে আমার গা ডোরাকাটা বাঘের চামড়া হয়ে গেল। নাকের নীচে ঠোঁটের ওপর সোনালি গোঁফের রোঁয়া দেখা দিতে দেরি হল না। আমি চারপায়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ধুলো শুঁকতে লাগলুম। দলের সরদার মথপ্রজাপতি ডানার একটা ঝাপটা মারতেই ইয়ালুম উলুম বলে সে কী আমার কান্না!

রাজফড়িং ওদিকে সার্কাসের জন্তু জানোয়ারদের খাঁচার দরজা খুলে নিবিড়বনে ফেরত পাঠিয়েছে। ধুরন্ধর শ্রীমান ভল্লুক বনজাগনি আর খেলা দেখাবে কী? তার একটা জন্তু জানোয়ারও খাঁচাতে নেই। সব হাটপাট খোলা। যাঁরা খেলা দেখতে এসেছিল বনের ঘাস, উইলো গাছ, পলাশ ডালের প্যাঁচাকাকিমা, নর্তকী ঝাউ রেগেমেগে দুয়ো দুয়ো করে উঠলে। পয়সা ফেরত দে, পয়সা ফেরত দে চারপাশে চিৎকার। সবাই ভালুককে লাঠি নিয়ে তাড়া করলে। কালীদহের আঁধারে তার গায়ের রং মিশ খাওয়াতে কোনওরকমে সে রক্ষা পেলে। ভাবলে সারাজীবন আত্মগ্লানি দাহনদুঃখের চেয়ে পিপ্‌পারু হ্রদের জলে ডুবে মরা ভাল।

পিপ্‌পারুর নীল জল ঠেকেছে ভালুকের বুকে। হঠাৎ বনের আড়াল থেকে সে শুনলে বাঘের হালুম, সাদা ঘোড়ার চিঁ, ভোঁদড়ের হাতের ডুগডুগি। সার্কাসের পুরনো মাস্তানরা তাকে ডাকছে। আত্মহত্যার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে যেদিক থেকে ডাক শুনেছে সেদিকে ছুটে গেল ভালুক ভায়া। তারপর আর কী? বনের পর বন খুঁজে বেড়িয়েও কারও কোনও হদিশ পেলে না। পাবে কী করে? হরবোলা রাজফড়িং বাঘের ঘোড়ার জন্তু জানোয়ারদের গলা অবিকল নকল করে তার প্রাণে আশার রেশ জাগিয়ে তুলেছে। ভালুক যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে পার্টনারদের রাজফড়িং আমাকে এসে এক ফাঁকে মুক্ত করে নিয়েছে।

কিন্তু হলে কী হবে? আমি তো তখনও বাঘ। জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম পশুসুন্দর চক্রবর্তী। মোহমাগুরা বনে আমার নতুন রাজ্যপাট।

রাজফড়িং শালগাছের নীচে বসে চোখের জল মুছতে থাকলে! সেই জায়গাটির নাম পার্বতীতলা। সারি সারি অনেক পোড়ামাটির ঘোড়া সাজানো সধবা মেয়েরা এখানে মানসা নিয়ে আসে। রাজফড়িংয়ের কান্না দেখে আমিও কাঁদছিলুম। মানুষের বন্ধু বাঘ। বাঘের চোখেও জল। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকে মাটির ঘোড়াদের চোখে।

রাজফড়িং বললে, 'ভাই আমরা বন্ধুকে বাঘ করে দিয়েছে ম্যাজিসিয়ান ভালুক।'

মাটির ঘোড়া হাসতে হাসতে বললে—ভাবনা কী! সাত রাত্তির শালগাছের তলায় বসে থাকো। শেষ রাত্তিরে যখন শুকতারা উঠবে আকাশ থেকে দেবতাদের একটা ঘুঙুর ঝরে পড়বে তোমার হাতের পাশে। সতী মহারানী সপ্তাহের শেষ রাত্তিরে মানসার পুজো দিতে আসেন। তাঁর পায়ে ওই ঘুঙুর যদি বেঁধে দিতে পারো আঁধার ফুরিয়ে যাবার এক মুহূর্তে আগে, তা হলে তিনি খুশি হয়ে তোমার বন্ধুকে মনুষ্যজন্মে ফিরিয়ে আনার পথ বাতলে দেবেন। সতী মহারানীকে তুমি বলো—মা, দেবতাদের আদেশ, এই ঘুঙুর বাম

পায়ে বেঁধে একুশ পা এগিয়ে যাও। তা হলেই বৎসরকালে তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেবে। দেবতাদের আশীর্বাদে সে পুত্র হবে মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ। নিরহঙ্কার, দুঃখীদের জন্যে নিরন্তর চিন্তিত হবেন রাজকুমার। গরিব ঘরে বিলিয়ে দেবেন ধনভাণ্ডার।

সাত রাত্তিরের শেষ রাত্তিরে আকাশ থেকে ঝরে পড়ল সোনার ঘুঙুর। আঁধার ফুরনোর নিমেষমাত্র আগে রাজফড়িং বেঁধে দিলে সতী মহারানীর বাম পায়ে ঘুঙুর। মহারানীর সেই প্রসন্ন চেহারা কী ভোলা যায়। চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি, সিঁথের চওড়া লাল সিঁদুর, গলায় ফুলের হার ফুলের বালা। ডাগর চোখ পটে আঁকা। ঠোঁটের কোণে হাসি। যেন জুঁই ফুল।

সতী মা আদেশ দিলেন যা রতনপুরের আমবাগানে। দুপুরের হাওয়ায় সেখানে শহর থেকে এসেছে দুই খেয়ালীবাবু। একটা যন্তর এনেছে তারা। বনের পশু পাখির ডাক ধরে রাখছে যন্তরে। তুই হরবোলা। নানারকমেব ডাক শোনাবি বাবুদের। তাবা খুশি হয়ে বখশিস দিতে চাইলে বলবি বাঘের মনুষ্য জন্ম চাই!

দুই বাবু একজন ট্যারা, আরেকজন বাঁকা। একজনের নাক লম্বা, আরেকজন নাক বোঁচা। তারা হরবোলার ডাক ধরে রাখলে মজার টেপ রেকর্ডে। এই যন্তব নিয়ে তারা যাবে বনে। বনে জন্তু জানোয়ারদের রেকর্ড শুনিয়ে নিজেদের কাছে ভিড়িয়ে আনবে। কাউকে চিড়িয়াখানায় ঢোকাবে, কাউকে পাঠাবে ভিনদেশের ছেলেদেব হাটে জাহাজে চড়িয়ে উপহার হিসেবে।

এই বাঘটা কত দামে বিক্রি কববি? বুনো হলেও দেখছি স্বভাবটা শান্ত! এখন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ট্যারাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সাহেব, এ আসলে বাঘ নয় মানুষ। এক ভালুক ভেলকি করে একে বুড়ো বাঘ করে দিয়েছে।

ও, এই কথা। আচ্ছা সবুর কর দেখছি। বাঁকাবাবু একটা পাঁচ সেলের টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমাকে বললেন—জিভ দেখি। আমি জিভ বের করলুম। তিনি বাম থাবার উপরটা ধরে নাড়ি দেখলেন।

পচা বাঁশপাতার তিন দাগ মিকশ্চার, সেই মহুয়া নদীর বালুচর চার হাত খুঁড়ে যে জল, রোজ পঁচিশবার খেতে হবে। মাছ বা ডিম খাওয়া চলবে না। এখন একটা ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছি, পাঁচদিন পর আবার একটা ইনজেক্‌শন দিতে হবে ; তাহলেই এ মনুষ্যজন্ম ফিরে পেতে পারবে। বলতে বলতেই ট্যারা আর বাঁকা সরসর করে আজব দড়ি ধরে আমবাগানের মাথায় উঠে দুপুরের রৌদ্রে দিগন্ত ছাড়িয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজফড়িং চিল হয়ে তাদের অনেক খুঁজলে। শেষে ক্লান্ত হয়ে সাঁঝের বেলা ফিরে এসে বললে—ভয় নেই চলো বন্ধু। আঁধারে তখন সলতে জ্বলছে।

পাঁচদিন পর আমি ইনজেকশান নেব কী করে? কে দেবে ইন্‌জেকশান?— অঝোরে কাঁদতে থাকলুম।

আমি দেব, সরঞ্জাম কুড়িয়ে রেখেছি। ইনজেকশানটা তৈরি করতে হবে আতর

আর কুসুমজলে।

পাঁচদিনের দিন ইনজেকশন নিয়ে মনুষ্যজন্ম ফিরে পেলুম। রাজফড়িং আমার নাম দিলে মজা·চটকদার। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে সে বললে গ্রটেফেন্ড অর্থাৎ গ্রেট ফ্রেন্ড।

গ্রেট ফ্রেন্ড আমি না রাজফড়িং? আর একবার আমাকে সে বাঁচিয়েছিল। সেবার ছিলুম তালগাছের চুড়োর দিকে তাকিয়ে ভাদ্র মাসের সন্ধ্যায়। তাল পেকে কুচকুচে রঙ ধরেছে। বললুম একতাল তিনতাল, পাকলে খাব চিরকাল। বললুম আর জিভে জল সামাল দিলুম। সেই তালবড়া তালের লুচি ভাদ্রমাসের ঝুপঝুরে সন্ধ্যায়। মা মাসির কোলে শুয়ে মশা তাড়ানো। আঁধার ঘর পচা ডোবা, বাঁশের ঝাড়ে মশার গান। স্বপ্ন দেখছি আর হারিয়ে যাচ্ছি। কোথায় ছিল রাজফড়িং, দৌড়ে এসে বললে, বন্ধু হুঁশিয়ার।

ময়াল সাপ কখন যেন আমাকে তার নাকের ডগায় নিয়ে রেখেছে। আমি নজরবন্দী। তীব্র সবুজ চোখদুটোকে ভেবেছিলুম মায়াবাতি। এখন উপায়? রাজফড়িং দাপটভরে আরম্ভ করেছে তার কেরামতি। খিলানমন্ত্র। বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়ার জাবিজুরি।

আকাশে চঞ্চল পাতালে ঘর। নির্ঝরে ঝরে
বিষ এক ফুঁকে তুই মর।

বিশাল সাপ লেজ আছড়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে গেল। একতাল মাংসের পাহাড়ে ডুবল পাথুরে চোয়াল। মায়াবাতির আগুন এবার নিভন্ত। উচিত সাজা। রাজফড়িং তখনও কিন্তু দুলে দুলে মন্তর পড়ে যাচ্ছে :

হিলিহিলি গঙ্গা ঝিলিঝিলি পানি
সাপ মরলে দু আনি

সেই দিন রাত্রে সে আমাকে ডেকে বললে—তোমাকে এই বনে রাখা উচিত হবে না সখা। বাড়ি পাঠিয়ে দিই। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যাও। ঘর আলো করো।

আর তুমি? তুমি বুঝি এই বনবাদাড়ে পড়ে থাকবে?

ফোঁপা ঢেউয়ের মাঝখানে আমি ভেসে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন। শতভিষার পাথর উড়ুনির গিঁটে বেঁধে দিয়েছিলেন মা। আঁচলে আছে মুড়িমুড়কি খই। নারকেল নাড়ু, ডোবার ব্রতের পিঠে। আমি ভয় পাই না পাহাড়ে বা বনে ঘুরে বেড়াতে। সাগর আমার ভাই। আমি তার। ভালবেসে সে দিয়েছে জমাট বাঁধা ফেনা। সে-ফেনা সূর্যি উঠলে নরম সূর্যি ডুবলে জমাট। তখন সেই ফেনা পাথরে চোখ ফেলে সব দেখতে পাই। চিত্রকরের বিশ্বভুবন বিদেশ বিভূঁই—সবের হদিশ থাকে তার ভিত। আর দেরি করো না ভাই। পনেরো মিনিট পর দেশে ফেরার ট্রেন। দশ মিনিটে পৌঁছে যাবে রেলইস্টিশান।

সবুজ সিগন্যাল এখন চোখে পড়ল আমার। উঁচু বাঁধের ওপর রেল লাইন। দূর থেকে ট্রেনের আলো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। একবিন্দু আলো হল আলোর

ডিবে, বিপুল ছটা। আলোআঁধারি প্ল্যাটফরমে ফেরিওয়ালা ডেকে মাটির ভাঁড়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে রাজফড়িং লাল কামরাব মধ্যে সাদা পদ্মের রক্তকমলের শান্ত জ্যোতি ঘরখানি ঢুকিয়ে দিলে।

বিদায় বন্ধু মনে রেখো ভাই—রুমাল নাড়তে থাকলে সে।

চললুম দুঃখিত মনে। বেশ তো ছিলুম তোমার কাছে! তুমি কিন্তু অবাক করলে কোনও প্রতিদান নিলে না আমার তরফে।

কিছু চাইনে, পারলে মনে রেখো। সম্পর্ক চাপা দিও না ঠান্ডা বরফে। ভেব তাদের কথা জনমদুঃখী যাদের ঘরে আঁধার রাতে জ্বলে না পিদিম, সোনাব ধানের পুঁথিপাঠের স্বপ্ন যাদের চোখে। ভুলো না শতভিষার পাথর, সাগর ফেনা, চিত্রকরের বিশ্বভুবন। সূর্যি উঠলে নরম পাথর, সূর্যি ডুবলে জমাট শীতল।

আবার কবে আসবে?

আসব যদি আমাব শর্তে রাজি হও।

রাজি।

না শুনেই রাজি? তা হলে আমাব কোনও কথা নেই।

আচ্ছা বলো বলো শুনি।

ছ'মাস ছ'দিনেব জন্যে তোমার সঙ্গে জায়গা বদল করব আমি। তোমাব হবে হাওয়াবদল। মা বাবাকে বলো তাঁরা যেন চিন্তা না করেন। আমার বুকে বাঁধা আছে তুড়ুক সন্ন্যাসীর মরণবিনাশী কবচ। তা তোমাব বুকে বেঁধে দেব। বনেব পশুপাখি তোমার কোনও অনিষ্ট করবে না। তেমনি তুমিও কাউকে আহত করো না। দেখো বন্ধুভাবাপন্ন ওরা তোমাকে এনে দেবে আহাব পানীয় আর ঘুমের সময় গান। পাণ্ডা ও পণ্ডিতের উৎপাত থেকে তুমি রেহাই পাবে।

আর শোনো একদিনের জন্যেও আমি বসব না ছত্রসিংহাসনে। ছ'মাস ছ'দিন আমি ঘুরে ঘুরে দেখব তোমার রাজত্ব। গঞ্জের ব্যবসায়ীরা দেবে খোলো হুঁকো, অম্বুরী তামাক, শোনাবে সুখ দুঃখের গল্প, কৃষক তন্তুবায় পটুয়া নাপিত কামাব কুমোব হাড়ি বাগদি ডোম ঢোকরা মাঝি জেলে মালি জোলা ফকিরপীব বেদে বাজিকর ওঝা বাউল বৈরাগী সবাই আমাকে ডেকে দেখাবে অন্তঃস্থল—সেখানে সোনাব গাছে হীরেব ফুল, বাইরে দারিদ্র্য।

বন্ধু তোমাব অপেক্ষায় থাকলুম তুমি এসো—আমার উত্তর কিন্তু রাজফড়িং শুনতে পেলে না। কারণ তখন ট্রেন নড়ে উঠেছে, চাকায় বেজেছে চলার গান, গার্ডসাহেব দেখিয়েছেন সবুজ লণ্ঠন, ঘণ্টা পড়েছে যথাযথ, হুইসিল পৌঁছে গেছে পাইলট সাহেবেব কানে। রাজফড়িংকে আমি আর দেখতে পেলুম না ; প্ল্যাটফর্ম, চায়ের দোকান, টিকিট ঘব, বসার বেঞ্চ, কৃষ্ণচূড়াব লালছায়া সব মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। আঁধার বাতাসে শুধু সাদা রুমাল সাদা রুমাল।

আমার কামরায় দেবতারা প্যাসেঞ্জাব। বর চাইলুম—প্রভু স্মৃতিশক্তি প্রগাঢ় করো।

তাঁরা বললেন তথাস্তু।

বললুম, অপার অনুগ্রহ হুজুর।

মলুয়া বললে— হুজুর।

মলুয়া তুই নাকি?—প্রায় ধমকে উঠি। আকাশ জুড়ে নীল মেঘে বিজুরি চমক। মাথা নত করি জানলার বাইরে আন্দোলিত আমগাছটির রহস্যের কাছে। মেঘের কোলে শ্বেত কবুতর উড়ছে। সাদা বকপাতি। নীলের গায়ে সাদা বুটির ছোপ।

সেই লোকটি হুজুর জলে গেছেন।

কে রাজফড়িং? কোথায় গেল? খুঁজে দেখো, খুঁজে দেখো। আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাওনি কেন? বাগানের পুবধারের ঘর খুঁজে দেখেছ?

ও ঘরে নেই হুজুর। মাঠ ঘাট ঝাপসা করে বৃষ্টি এল। আবদারপুরের লাল কাঁকড় ভরা ডাঙ্গাখানা ঢাকা পড়ল ছাঁটে। ছুটো ছাগলের ছানগুলান ডাকল ব্যা ব্যা করে। আর একসার তালগাছের মাথা পেরিয়ে উনি হুজুর সাঁ সাঁ করে উড়ে গেলেন।

কোথায়?

তা কি জানি হুজুর? সাঁওতালপাড়ার মাঝিগুলান শুদ্ধ দেখলে উড়ে যেতে। বৃষ্টি বাঁচানো চাদর মুড়ে নিয়েছেন ডানায়।

চুরুট ফেলে আমি উঠে দাঁড়াই।

চলো যাই এখুনি যাই। যেখানেই থাক খুঁজে বের করি তাঁকে। ময়রা চাষা তাঁতি পোটো নাপিত গোয়ালা কুমোর কামার মুচি হাড়ি বাগদি ডোম ঢোকরা মাঝি জেলে মালি জোলা ফকির পীর বেদে বাজিকর ওঝা বাউল বৈরাগী সকলের ঘরে গিয়ে দেখি সোনার গাছে হীরের ফুল। দারিদ্র্যহীন অরূপ রতন।

ছত্রসিংহাসন ফেলে উঠে দাঁড়াই। মাকড়সার জাল ছিঁড়ে সিংহাসনের নিচু থেকে বেরিয়ে আসে রাজফড়িং। হাত জোড় করে বলে—কোথাও যাইনি মহারাজ। এখানেই ছিলুম। সন্তুষ্ট হয়েছি আন্তরিক ব্যস্ততা দেখে। সময় হয়েছে। শরীরধারণ করতে আজ্ঞা দিন।

অমঙ্গল কাব্য

"তুমি কি সত্যিই যাবে?"

ছবিকে জিজ্ঞেস করল বিনয়। হলুদ লণ্ঠনের শিখাটা শরীরের রক্ত চলাচল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার মতো চঞ্চল হয়ে উঠল কিছুক্ষণ। আধপোড়া, খসখসে পলতের মতো বিনয়ের গল্পটাও কেঁপে উঠল। ছবি হয়তো টের পায়নি। বিনয় জানে, ছবি যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেয় তাকে আর টলানো যায় না। সে এখন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন আর তাকে ফেরানো যাবে না। জানলার বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার রাতের অন্ধকারের সঙ্গে মিলেমিশে পাথরের মতো শক্ত নিরেট হয়ে উঠেছে। চৌকির কোণে বসে-থাকা ছবিকেও ও রকম পাথরের মতো মনে হচ্ছে বিনয়ের।

সে আর একবার জিজ্ঞেস করল, "না গেলেই কি নয়? অমাবস্যার রাত।"

"অমাবস্যার রাতেই তো যেতে হয়," ছবি বলল। ওর গলার শব্দ পাথরের কুঠারের মতো হয়ে উঠতে পারত ঘরের আলো-আঁধারি পরিবেশে। হয়নি। নরম গলাতেই সে তার কঠিন মনোভাবের কথা জানিয়ে দিল। "তাছাড়া, আমি তো একা যাচ্ছি না। গ্রামের সব মেয়েই তো যাবে।"

"যারা যাবে বলেছে, তারা শেষ পর্যন্ত দেখো এক পাও এগোবে না। মুখে বলতে তো বাধা নেই।

"কী করে বুঝলে?"

"বোঝার কী আছে? এটাই নিয়ম। রাতের অন্ধকারে ওরা বাড়ি থেকে বেরোবে ভাবছ? দেখো, শেষ পর্যন্ত তোমাকে একা একাই ফিরে আসতে হবে।"

বিনয়ের কথার আর উত্তর দিল না ছবি। সে শুধু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকাল। বিরাট একটা জন্তুর মতো অন্ধকার সেখানে অপেক্ষা করছে। আলো-হাওয়া নেই। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলো ছুরির মতো ঝকঝক করছে। আকাশ যেন বিরাট একটা জিভ, মাটির দিকে নেমে এসে পুরো পৃথিবীটাকেই গ্রাস করতে চাইছে। সেই জিভে দগদগে ঘা এক একটি গ্রহ নক্ষত্র। চৌকি থেকে উঠে গিয়ে ছবি জানলার ধারে দাঁড়াল। বিনয়ের মনে হল, মাটির দেয়াল ভেঙে ঘরের ভেতরের জমিটাও বোধহয় দখল করে নেবে অন্ধকার। অন্ধকারটা সত্যিই এগিয়ে আসছে।

"না। আমি বলছি শোনো, তুমি যেও না।" ছবির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল বিনয়।

"আমার যাওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন বলো তো?"

"যদি যেতে না দিই!" কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল বিনয়।

"তোমাকেও তো যেতে হবে।"

"তুমি যদি একা যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

"না, না, পুরুষ মানুষের ওখানে যেতে নেই।" চমকে উঠে ছবি ঘুরে দাঁড়াল। "যদি আমাদের পিছু নাও খুব খারাপ হবে বলছি।"

"তা হলে তুমি আমাকে যেতে বলছ কেন?"

"এটাই নিয়ম। বাড়ির সব পুরুষ মানুষকে কামারডাঙার মাঠে গিয়ে বসে থাকতে হবে। যতক্ষণ না আমরা ফিরি।"

"ঘরে থাকলে দোষটা কী!"

"আমাদের তো আবার ঘরে ফিরে আসতে হবে। তখন কোনও পুরুষ মানুষেরই ঘরে থাকা চলবে না। বাতি জ্বালাও নিষেধ।"

"এ কী পাগলামি!" আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল বিনয়। ছবি তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিল। বিনয়ের ঠোঁট চৈত্রের ফাটা মাঠের মতো রুক্ষ। ছবি এই প্রথম অনুভব করল। বৃষ্টিহীন মাঠে লাঙল যেমন ঢেলা ছড়িয়ে যায়, এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপর দিয়ে চাষির যেমন হাঁটতে কষ্ট হয়, সেরকমই কষ্ট হল ছবির। মরচে পড়া, ভোঁতা ছুরিব ওপব যেন হাত বুলোচ্ছে ছবি। মাত্র কিছুক্ষণ। তারপরই সে সরে দাঁড়াল। লাঙলের বাঁটের মতো ছবিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল বিনয়। পারল না। ছবি ঘরেব আর-এক কোণে সরে গেছে।

বিনয় চাইছিল, বৃষ্টি হোক না হোক, আকাশে অন্তত একবার মেঘ ডেকে উঠুক। কথাটা সে মুখ ফুটে বললও ছবিকে।

"বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ নেই। কিন্তু যদি এক টুকরো মেঘ কোথা থেকে উড়ে আসত, উড়ে আসুক বা না আসুক দূর থেকে যদি তার ডাক আমাদের শুনিয়ে যেত! দেখতাম, কী করে তা হলে বাইরে যাচ্ছ তোমরা।"

"মেঘ ডেকে আনার জন্যেই আমাদের যেতে হবে।"

"এসব বাজে কথা। গ্রামের মেয়েরা ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডাঙায় জড়ে হয়ে একরাত্রি মন্ত্র পড়লেই যদি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামত, তাহলে আর কথা ছিল না! এসব আমি মানি না।"

"তা মানবে কেন? বারো মাস খরায় জ্বলেও শান্তি নেই। এখন একেবারে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে চাও।"

"কোনও সুস্থ লোক এটা মানতে পারে না।"

"তোমার মতো সুস্থ লোকের সংখ্যা এত বেড়েছে বলেই গাঁয়ের এই হাল হয়েছে।"

"তুমি যে লেখাপড়া শিখেছ, তা কিসের জন্যে? মাঝরাতে মাঠে গিয়ে মন্ত্র পড়ার কথা কোন পণ্ডিত লিখেছে?"

এই গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়ায় ছবি। গ্রামের নাম মধুরালি। ডোম, বাগদি, হাড়ি,

মুচি ও কয়েক ঘর বামুনের বাস। ছড়ানো, ছিটনো একটা গ্রাম। ঠিকমতো যেন গড়ে ওঠেনি। কিছু লোক কখন যেন এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল। তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেড়েছে। একান্নবর্তী দু' একটি পরিবাবের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে আলাদা আলাদা হেঁশেলঘরও হযেছে। কিন্তু খুব যে একটা গায়ে-গতরে বেড়েছে এই গ্রাম, তা নয়। কারণও আছে। মাটি এখানে রুক্ষ। অসমতল। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যখন ঝড উঠে লাল ধুলোয় ঢেকে যায় গ্রামের আকাশ কুঁড়েঘরগুলোর চেহারাও সেরকম শ্রীহীন। ধুলো জমতে জমতে সমস্ত গ্রামের চেহারাটাই ধূসর হয়ে গেছে।

বর্ষার দেখা পাওয়া যায় এখানে কালেভদ্রে। আষাঢ়, শ্রাবণ কিংবা ভাদ্রে আকাশে কালো করে মেঘ জমতে দেখলেও এখানের মানুষ আর খুশি হয না। দূর দূর গ্রাম থেকে মেঘের গর্জন এখানে ভেসে আসে কিন্তু সমস্ত চরাচর লেপে মুছে দিয়ে যেভাবে বৃষ্টি আসে অন্যান্য গ্রামে, বড় বড় গাছের পাতা যেভাবে বৃষ্টিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসে মাটির গভীরে, সেই বৃষ্টি এখানে আসবে না বলে পণ করেছে। বৃষ্টির সঙ্গে এই গ্রামের আড়ি হয়ে গেছে অনেক কাল আগেই। তাই, সম্পন্ন চাষির বাস নেই মধুরালি গ্রামে। পৈতৃকসূত্রে বিনয কিছু জমিজমা পেযেছে। কিন্তু সেই জমিব মধ্যে একটাও বাইদ নেই, নেই জেলি। সারা বছর যেটুকু ধান পায তাতেই অবশ্য তাব চলে যায। লেখাপড়া বেশি শেখেনি, তাই চাকরির সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে তাকে এই গ্রামেব ধূসরতাব মধ্যে এক অনিবার্য বিযণ্ণতাব প্রতিমূর্তি করে তুলেছে।

সত্যিই, মধুবালি গ্রামের গর্ব কবাব মতো কিছু নেই। নেই ডাকঘব, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কিংবা সরকাবি কোনও অফিস। এমনকি এই গ্রামেব কেউ সরকারি চাকবিও করে না। প্রাথমিক স্কুলটুকুই শুধু এই গ্রামের সম্বল। তাও, ভাঙা টালিব ঘর। জানলাব পাল্লা নেই, নেই ছাত্রছাত্রীদের বসার বেঞ্চ। দরজার অবশ্য কপাট আছে। দুজন শিক্ষিকাব জন্য আছে দুটি চেয়ার। তাও আবাব তার হাতল ভাঙা। পাযাগুলো নড়বড়ে। স্কুল বন্ধ হলে দবজায় শিকল তুলে ছবি চলে আসে। কার্যত সে-ই প্রধান শিক্ষিকা। আব একজন শিক্ষিকার নাম গীতা। সে আসে পাশের আলিনগর গ্রাম থেকে। ছবির বাপের বাড়ি আলিনগর থেকে চার ক্রোশ দূরে আড়ল গ্রামে। আড়লের হাইস্কুল থেকে পাস করার পর সে ট্রেনিং নিয়েছিল রামপুরে। তারপর এই চাকরি ও বিয়ে। মধুবালির ধুলো ছবির গায়েও চেপে বসেছে। বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার সময় ধুলোব ঝড তাকে এলোমেলো করে দিয়েছে কতবাব। আবার স্কুলের ক্লাসরুমে বসেও সে দেখেছে ধুলোর ঝড় আছড়ে পড়েছে ঘরে। খোলা জানলাব দিকে পিঠ করে উটপাখিব মতো ছেলেমেয়েরা মুখ থুবড়ে পড়েছে ছবির চোখের সামনে। তখন ছবির শুধু একটা কথাই মনে হয। প্রকৃতিও স্বার্থপর। যাকে সে কিছু দেয, তার আব কোনও অভাব রাখে না। যাকে দেয না, তাব জন্য কোনও মাযা মমতাই নেই। প্রকৃতির আছে নিজেব নিয়ম। কে কী ভাবল, না ভাবল তা নিযে তাব কিছু যায় আসে না।

ছবি এটাই বোঝাতে চেয়েছে বিনয়কে। কিন্তু বিনয় কোনও কথাই শুনতে চায না।

আলপথে দাঁড়িয়ে বিনয় দেখেছে খরায় চারপাশ জ্বলছে। দূর পাহাড়ে শুকনো জঙ্গলে লেগেছে আগুন। তখনই ওর রাগ হয়। প্রচণ্ড রাগ। আগুনের মতো নিজেও জ্বলতে থাকে। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে কোনও নদী নেই। নেই বলেই তার জল আমরা চাষের কাজে লাগাতে পারি না। পাহাড় আছে, কিন্তু ঝরনা নেই। মেঘ আছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। কেন এমন হবে! বিনয় কতবার ভেবেছে। কয়েকটা অগভীর নলকূপও যদি থাকত!

"আমাদের জন্যে কেউ কিছু করবে না।" বিনয় সেদিন ছবিকে বলেছিল। "গ্রামে গোনা-গুনতি আড়াইশোটা ভোট। কারও কিছু যায় আসে না। রামপুরে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ধার চাইলাম। অগভীর নলকূপ বসাব। কয়েক একর জমি তো চাষ হবে। কিন্তু মুখের ওপর জানিয়ে দিল, ওরা টাকা দেবে না।"

"টাকা ধার দিলেও এখানে নলকূপ বসবে না। বসানো যাবে না।" ছবি বলেছিল।

"কেন যাবে না? আর পাঁচটা গাঁয়ে বসছে না? আমি তো ব্লক অফিসে গিয়েও কম চেষ্টা-চরিত্র করিনি।"

"এখানে মাটির নীচে পাথর আছে। ওই পাথর সরাবে কী করে!"

"বাজে কথা। কারা যে এসব রটিয়েছে। কোনওদিন তো চেষ্টা করে দেখা হয়নি।"

"চেষ্টা করলেই যে হত, তা তো নয়। পাথর নিয়েই আমাদের জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।"

"কত জায়গায় তো সেচের জন্য খাল কাটা হয়েছে। একশো মাইল দূরের নদীর জলও সেই খাল দিয়ে জমিতে এসে পড়েছে। কিছু একটা ব্যবস্থা কি করা যেত না!"

"কী যে বলো! ঢেউ খেলানো মাঠপ্রান্তর। নদীর জল ঢুকবে কোন দিক দিয়ে। তা ছাড়া নদীও তো নেই।"

বিনয় আর বলার মতো কিছু খুঁজে পায়নি। সে বুঝতে পেরেছে, মধুরালি গ্রামেই তাকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে। না হলে অন্য কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। মধুরালি প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে ছবির অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তার বদলির চাকরি নয়। ছবি কিছু রোজগার করে বলেই এখনও অভাবটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। অন্য কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো বৃষ্টির দেখা পাওয়া যাবে, গাছপালার সবুজ হাওয়া গায়ে এসে লাগবে, কিন্তু আশ্রয় সেখানে নতুন করে গড়ে তোলা যাবে না। সুতরাং এখানেই থাকতে হবে। নতুন করে কোনও কিছু গড়ে তুলতে হলে যে সাহস ও শক্তি দরকার তা বিনয় হারিয়ে ফেলেছে। মাটির নীচে পাথর এখানকার মানুষগুলোকেও পাথর করে দিয়েছে। বাঁচতে হলে দূর পাহাড়ের আগুন, লাল ধুলোর ঝড় আর চিরস্থায়ী গ্রীষ্ম নিয়ে বাঁচতে হবে। বিনয়কে এটা মেনে নিতে হবে।

ছবিও যে এটাকে মেনে নেয়নি, তা নয়। কিন্তু সেদিন গ্রামের সৌদামিনীপিসি দূর পাহাড়ের আড়ালে আটকে-থাকা বৃষ্টির মেঘের খবর তাকে এনে দিল। ডোমপাড়া পেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় ছবির সঙ্গে সেদিন ওর দেখা হয়েছিল। রামপুর থেকে ছবির জন্য বিনয় একটা ছাতা কিনে এনেছিল। রোদটা তো বাঁচবে। ছাতার ছায়ায় পারুলকে

হেঁটে যেতে দেখে সৌদামিনী বলল, "স্বামীই তো তোমার বড় ছায়া। আব ছায়ার কী দরকার! তা, সবার স্বামী তো ওরকম ছাতা কিনে দিতে পারে না।"

কামারডাঙায় লোহা কুড়িয়ে বেড়ায় সৌদামিনী। রোদে পুড়ে শরীরটাও তার লোহার মতো হয়ে গেছে. আঙুলগুলো মরা শিকড়ের মতো দেখতে। নুড়ি-পাথরের মধ্যে পড়ে থাকা লোহার টুকরো এই আঙুল দিয়েই সে কুড়িয়ে নেয়। লোহার আকর মাটিতে গেঁথে থাকলে লম্বা, লম্বা নখ দিয়ে সেগুলো সে আলগা করে নিয়ে টুপ করে ভরে ফেলে কাঁখের ঝুড়িতে। তার স্বামী রামপুরের হাটে লোহার আকরগুলো বিক্রি করে। লোহা কেনার জন্য সেই হাটে ব্যাপারিরা আসে।

"যদি লোহা হতে পারো ভাল, না হলে তোমাকেও কিছু করতে হবে।" সৌদামিনী বলল।

ছবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝপথে। কী করতে হবে? সৌদামিনীপিসি কী বলতে চাইছেন।

"যদি বৃষ্টি আনতে চাও যদি মঙ্গল চাও আমাদের এই গাঁয়ের তা হলে কিছু একটা করো। এখনই সময়। আমার তো আর বয়স নেই। না হলে আমিও তোমাদেব সঙ্গে থাকতাম। সেবার তো ছিলাম।" সৌদামিনীর কথায় অবাক হল ছবি।

কামারডাঙা পেরিয়ে শিরিনখালির মাঠ। সেখানে থাকেন মা সান্ত্বনা। তাঁব পুজো দিতে হবে। বৈশাখের অমাবস্যার রাতে গাঁয়ের কুমারী আর যুবতী মেয়েবা মিলে পুজো দেবে। আগে শুধু কুমারীরা পুজো দিত। কিন্তু মা সান্ত্বনা বলে দিয়েছেন, বয়স যাদের পঁয়ত্রিশ বছরের কম তাদেরও যেতে হবে। মাঝরাতে পুজো। গাঁয়ের কোনও ঘবে সেদিন বাতি জ্বলবে না। পুরুষদেরও বাড়ির বাইরে গিয়ে কামারডাঙার মাঠে বসে থাকতে হবে। পুজোর পর মেয়েরা যখন বাড়ি ফিরবে, আবার পোশাক পরে নেবে, তখনই পুরুষবা ঘবে ঢুকতে পারবে।

"চল্লিশ বছর আগে গাঁয়ের মেয়েরা শেষবার পুজো দিয়েছিল মা সান্ত্বনার। সেবার আমিও ছিলাম। সে কী পুজো। জনাপঞ্চাশেক মেয়ে ছিলাম আমরা। মা সান্ত্বনা আমাদেব ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারও গায়ে শাড়ি-কাপড় ছিল না। সব আমরা খুলে গিয়েছিলাম। তাতে কারও মনে লাগেনি। মা সান্ত্বনা তাঁর এলোচুল দিয়ে আমাদের লজ্জা ঢেকে দিয়েছিলেন। বলি, তোমরা পারবে! এতদিন তো হয়ে গেল! মা সান্ত্বনা আব কতদিন উপোসী থাকবেন?"

"মা সান্ত্বনা কি আপনাদের সব দিয়েছিলেন?"

"কী দেয়নি? বৃষ্টি, আর বৃষ্টি। মাঠভবা ফসল, মেয়েদের কাঁখালজোড়া সন্তান। সে কী দৃশ্য! অন্ধকারে রাস্তা হাঁটলেও আমাদের চোখের সামনে দিনের আলোর মতো সব স্পষ্ট হয়ে গেছিল। হাতের চুড়ি, গলার হাঁসুলি, পোশাক-আশাক সবই যে আমরা খুলে এসেছিলাম তা মনেও ছিল না। আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মা সান্ত্বনা, মা মঙ্গলা। আমাদের মনে কোনও পাপ ছিল না। বৃষ্টিতে শরীর ভিজিয়ে আমরা বাড়ি

ফিরেছিলাম। মরা জমিতে জোয়ার এসেছিল। আমাদের শরীরে এসেছিল জোয়ার। মধুরালি গ্রাম দিয়ে তখন একটা নদী বয়ে যেত। নৌকার পালেব মতো আমাদের শরীর সেই জোয়ারে ভাসত। বলি, তোমরা পারছ না কেন? চল্লিশ বছর তো কেটে গেল। আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

কামারডাঙায় লোহা কুড়োতে এগিয়ে গেলেন সৌদামিনীপিসি। লোহার শরীরেও জোয়ার আসে? লোহার শরীর নৌকোর পালের মতো হয়ে যায়? ছবি ভাবল। ছাতা গুটিয়ে সে স্কুলের দিতে এগোতে থাকল ঝনঝনে রোদে। সে দেখল, আগুন ঝরা দিগন্তের ওপার থেকে একটা নদী এগিয়ে আসছে মধুরালির দিকে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্ষায় যেমন বৃষ্টি হয়, ঠিক সেই বৃষ্টি। ছবি স্পষ্ট দেখল, বৃষ্টিতে ভেজার জন্য গ্রামের মেয়েরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জড়ো হয়েছে মাঠে। বৃষ্টি তাদের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এলোমেলো করে দিয়েছে। এরপর আর কোনও আবরণেরই প্রয়োজন নেই। মাঠের কোণে ছিল বিশাল একটা উইঢিবি। ঢিবি নয়, মিনার। উইমিনার। মেয়েরা সব আবরণ সেখানে স্তূপ করে রেখেছে। পরিত্যক্ত পোশাকের মিনার। মেয়েরা ধরা দিয়েছে বৃষ্টির বুদ্বুদের জালে। বুদ্বুদের বাড়ি। চারপাশে সবুজ ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

"না, তুমি যেতে পারবে না।" বিনয়ের কথায় চমক ভাঙল ছবির। তার শরীর থেকে সবুজ ফেনা যেন খরখরে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে দেওয়া হল। গায়ের নরম চামড়া বোধহয় ছড়ে গেল কিছুটা।

"বুঝতে পারছি না, তোমার আপত্তিটা কেন?"

"ঘড়ির কাঁটা উলটোদিকে ঘোরানো ঠিক নয়। আমি যখন মাটির নীচ থেকে পাথর তুলে ফেলে জলের কল বসানোর কথা ভাবি, তুমি তখন ফিরে যাচ্ছ অসভ্যদের অন্ধ বিশ্বাসের যুগে।"

"ফিরে যাচ্ছি না। পুরনো একটা বিশ্বাস এখনও চালু আছে। বাতিল হয়ে যায়নি।"

"তুমি কি ভাবছ গ্রামের মেয়েরা অন্ধভাবে ওরকম ছুটে গেলে বৃষ্টি নামবে? চাষের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?"

"চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী।"

"আমি চেষ্টা করছি ধুলোয় কীভাবে ধান চাষ করা যায়। এমন একটা চাষ , যেখানে বৃষ্টির বিশেষ ভূমিকা নেই। আর তোমরা সব লজ্জার মাথা খেয়ে দৌড়তে চাও অন্ধ একটা বিশ্বাসের পেছনে!"

"তোমার সংস্কারে লাগছে। মেয়েদের তুমি কী মনে করো! রঙচঙে পোশাক পরা তুলতুলে পুতুল? মা সান্ত্বনা নিজেই তো নগ্ন। তাঁর কাছে আমাদের লজ্জার কিছু নেই।"

"এ তোমাদের বোকামি। কে যে তোমার মাথায় ঢোকাল! ভাবতেও পারি না।"

"তুমি যখন বুঝবে না, তখন আর এত কথা বলে লাভ কী। আমাকে যেতে হবে।

"আমার শেষ কথা, তোমার যাওয়া চলবে না।"

"আমাকে বাধা দিও না। দোহাই তোমার।"

ছবির দু'চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। কান্নায় বুজে এল গলা। "আমি তোমাকে ভালবাসি। সারাদিন জমির আলে আলে ঘুরে সন্ধেবেলা যখন তুমি বাড়ি ফিরে আসো, তখন আর তোমার শুকনো মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। এত জমি, তবু মাত্র কয়েক মন ধান গোলায় ওঠে। বলো, সহ্য করা যায়!" ছবি কাঁদছে মেঝেতে বসে চৌকির কোনা দু'হাতে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যেখানে বসে সে কাঁদছে, তার অনেকটা পেছনে বিনয়। কী করবে সে বুঝতে পারছে না। সে দেখল, ছবির সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। ব্লাউজের নীচে পিঠের কিছুটা অংশ খোলা। লণ্ঠনের ম্লান আলোতেও সেই জায়গাটা চকচক করে উঠছে। বিনয় আর সহ্য করতে পারছে না। অস্থির একটা আবেগ তার মনের মধ্যে ফুঁসে উঠছে। ছবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে যদি সে বলতে পারত, নগ্ন হয়ে দেবী সান্ত্বনার কাছে তোমার ছুটে যাওয়ার দরকার নেই, তিনি যদি সত্যিই আমাদের মঙ্গল চান, তা হলে তিনি নিজেই পলাতক বৃষ্টিকে আকাশ থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসতেন আমাদের গ্রামে, তবেই ভাল হত। কিন্তু বিনয় কিছুই বলতে পারল না। অথচ তার মনের যন্ত্রণাটাও সে ছবিকে বোঝাতে পারছে না। বৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে তোমাকে প্রকৃতির কাছে নগ্ন হতে হবে না। স্বার্থপরের সঙ্গে স্বার্থপরের মতোই ব্যবহার করতে হবে। তোমার নিজস্বতা বলতে যা আছে সেটা তাকে বিলিয়ে দিলে তবেই সে তোমাকে কিছু পাইয়ে দেবে, এ কেমন রীতি! বিনয় জোর গলায় এটাই বলতে চাইছিল ছবিকে। কিন্তু পারল না। অথচ তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা অধিকারবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই দুর্মর অধিকারবোধের কাছে সব যুক্তিই হার মেনে যায়। বিনয় বলতে পারলে খুশি হত, তোমার নগ্নতা কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার তোমার নেই। ওটা আমার। আমি ওই অহঙ্কার নিয়ে বাঁচি। কয়েক বিঘে জমির অধিকার তার কাছে তুচ্ছ। এই কথাটা ছবিকে বুঝিয়ে দিতে পারলে বুকের ব্যথা হালকা হয়ে যেত বিনয়ের। কিন্তু সে পারল না। শরীরের জন্য আর একটা শরীর যে কীভাবে গুমরে মরে, ক্ষয়ে যায় এটা তারও বোঝার দরকার ছিল। যদি বুঝত, তা হলে যন্ত্রণাটা সে সহজেই সহ্য করে নিতে পারত।

তবে বিনয়ের ব্যক্তিগত হতাশার কথা ভেবে দেখলে তাকে হয়তো ক্ষমাই করা যায়। আট বছর বিয়ের পরেও সে নিঃসন্তান। তার জমিজমা সব পঙ্গু, কামারডাঙার সব লোহা গলিয়ে তার জন্য যেন একটা শিকল তৈরি করা হয়েছে। অতৃপ্তির শিকল। কিছু না পেলেও জমিজমাগুলো যেমন সে আঁকড়ে ধরে আছে, তেমনি চূড়ান্ত একটা তৃপ্তির আশায় শিকড় ও সমস্ত ডালপালা দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে ছবির শরীর। ওই শরীরই তার শিকড়ে দিচ্ছে রস। ডালপালা যে এখনও সজীব হয়ে আছে, তা ওরই জন্য। কিছু না-পাওয়াটাও এখানে বড় পাওয়া। আর তাই প্রকৃতিকেও এখন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছে বিনয়। কারণ, প্রকৃতির কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে যাচ্ছে ছবি শুধু ছবি নয়, আরও অনেকে। কোনও কিছু পাওয়ার আশায় এ একটা বড় পরাজয়।

কিন্তু ছবি এসব বোঝে না। কিংবা বোঝে, তবু তার কিছু করার নেই। একটা যৌথ আকাঙ্ক্ষার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। কিংবা তাও নয়। বিনয়ের অধিকার-

বোধটাকে সে এই মুহূর্তে আমল দিতে চাইছে না। ছবি জানে, বিনয় যা ভাবছে, তা ঠিক নয়। কোনও কিছু সে হারাচ্ছে না। তার সবকিছুই অবিকল আগের মতো থাকবে। তাই, কোনও নিষেধই শুনবে না ছবি। তাকে যেতে হবেই।

অন্ধকারে তখনই বেজে উঠল শাঁখ। শাঁখের শব্দও এত তীক্ষ্ণ। বিনয় আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক করল ছবি। বিপুল এক শক্তি তার শরীরে ভর করেছে। সে বিনয়ের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। বিনয় চেষ্টা করল ছবির চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে। কিন্তু তার আগেই আলতো হাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছবি। বাঁধভাঙা জলও এভাবে ছিটকে দেয় না। শাঁখের শব্দ তখনও করাত দিয়ে অন্ধকারটাকে কাটছে। ছবির মতো মেয়েরাও পেয়েছে দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার অব্যর্থ সংকেত।

এটা সংকেত বিনয়ের কাছেও। সে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। স্পষ্ট অনুভব করল ছায়া ও ছবির প্রাণের স্পন্দন। মেয়েরা চারপাশ থেকে ছুটে আসছে। কাউকে চেনার উপায় নেই। বিষের মতো অন্ধকার। বিনয় শুধু কয়েকটি ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে। এর মধ্যে কোনটি ছবির ছায়া? ছায়ার ছবি কোনটি? মেয়েরা ছুটে আসছে, আর তাদের পায়ের শব্দে দূর দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছে বিনয়।

শাঁখের শব্দ আর নেই। কয়েকটি শরীর অন্ধকারে কিলবিল করছে। একটা বট গাছের নীচে ওরা সবাই সম্মিলিতভাবে পোশাক খুলে ফেলছে। নগ্নতার আদিমতাকে আবিষ্কার না করলে মা সান্ত্বনার পুজো দেওয়া যায় না—এটাই প্রাথমিক শর্ত। আর দেবীর পুজো মানে নাচ ও গান। শরীরের মধ্যে নাচের যে ছন্দ ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুলে দেবীকে উপহার দিতে হয়। এবং গানের মধ্যে কোনও উদ্দামতা নেই। যা আছে, তার নাম বিষণ্ণতা। বিনয়, চিরদিনের হতাশ বিনয়, বুঝতে পারল আদিমতার ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে হলে অন্ধকারের মতো একটা আবরণের আড়ালে তার প্রকাশ হওয়া দরকার। প্রকাশ ভঙ্গিটাই তার এতদিন জানা ছিল না। এবার জানল। এ তার নিজেরও জেগে-ওঠার মুহূর্ত। এবং সে বুঝতে পারল, আমাদের এই সভ্যতা নিদারুণ মৃত্যুচেতনায় আক্রান্ত। জেগে-ওঠা এখানে খুবই জরুরি।

"আমি এসব মানি না। এই কুসংস্কার, এই অন্ধতা। মানি না, মানব না।" লড়াইয়ের ঘোষণাপত্রের এটাই প্রথম কথা। দেবী সান্ত্বনার মূর্তিটাই তাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। ভেঙে চুরমার করে ফেলতে হবে সেই মূর্তি। অন্ধকারে ছায়া-মূর্তিগুলোর পেছনে পেছনে সে হেঁটে গেল দ্রুত পায়ে। আর তখনই যেন কয়েকটা সাপের খোলশ তার পায়ে জড়িয়ে গেল। পিছল কয়েকটা শাড়ি। হিমশীতল অনুভূতি। বিনয় নিচু হয়ে শাড়িগুলো একে একে কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। তার ফতুয়ার পকেটে ছিল সিগারেট ও দেশলাই। এই মুহূর্তে তার দরকার আগুনের একটা ফুলকি। কোনও আবরণই সে আস্ত রাখবে না। পুড়িয়ে দেবে। ওই আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে দেবে।

দমকা হাওয়ায় প্রথম কাঠিটা নিভে গেল। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় দেশলাই জ্বলল।

কিন্তু তখনই বিনয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ছবি।

"অমঙ্গল হবে। সবাব অমঙ্গল হবে। এমন করতে নেই।"

বিনয়ের হাত থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কবল সে। কাড়াকাড়ির সময় বারুদের বাক্স অন্ধকারে ছিটকে পড়ল। এই মুহূর্তটিব জন্য প্রস্তুত ছিল না বিনয়।

খুচরো কথা

আঙুলে ব্যথা করে না দাশরথি?

দাশরথির কানে যেন প্রশ্নটা পৌঁছোচ্ছে না। এখন তার অন্যদিকে মন দিলে চলে না। তা হলে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। একবার ভুল হয়ে গেলে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আগে যে তার ভুল হত না তা নয়। গোড়ার দিকে প্রায়ই সে ভুল করে ফেলত। হিসেবটা ঠিকমতো রাখতে পারত না। তখন আবার ওকে নতুন করে শুরু করতে হত। দেরি হয়ে যেত সব কাজের। কিন্তু এখন তার ভুল হয় না। তার দু হাতের বঁড়শির মতো বাঁকানো আঙুলগুলো এক ধরনের যান্ত্রিক কুশলতা অর্জন করেছে। নিখুঁত নির্ভুল কাজ। গোপেশের মনে হল, দাশরথি এখন সারা পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে হাতের কাজটা সেরে নিচ্ছে। নিজের কাজ ছাড়া এই মুহূর্তে দাশরথি আর কিছু জানে না।

এদিকে গোপেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। দাশরথি নামের যে লোকটা তার পাশে বসে কাজ করে যাচ্ছে, যাকে সে এই একটু আগেই একটা প্রশ্ন করেছে সে যেন থেকেও নেই। অগত্যা গোপেশ একটা বিড়ি ধরাল। কিন্তু জিভটা তার চুলবুল করছে। আবার জিজ্ঞেস করল।

চোখে ব্যথা হয় না দাশরথি? মাথা ধরে না?

বোঝা গেল দাশরথি তার হাতের কাজ শেষ না করে কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেবে না। গোপেশ দেখল, তাড়া তাড়া নোট দাশরথি নিঃশব্দে গুনে যাচ্ছে। এক একটা বান্ডিল গোনা শেষ করে হিসেবটা সে বান্ডিলের প্রথম নোটের গায়ে পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখছে। তারপর বান্ডিলগুলো একের পর এক মেলব্যাগের মতো ক্যানভাসের বড় বড় থলির ভিতরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নোট অনুযায়ী আলাদা আলাদা থলি। গোপেশ দেখল, এক টাকার নোটের বান্ডিলগুলো নিঃশব্দে একটা থলিতে ঢুকে যাচ্ছে। তার পাশের আরেকটা থলিতে দু টাকার নোটের বান্ডিল। এভাবে একেকটা থলিতে আছ পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ আর একশ টাকার নোটের বান্ডিল। বান্ডিলও প্রায় শ দুয়েক হবে। এই একটু আগেই দাশরথির সামনে ছিল নানা অঙ্কের নোটের বান্ডিলের একটা ছোটখাটো পাহাড়। পাহাড়টা আর নেই। তার জায়গায় এবড়ো-খেবড়ো হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা নোটের বাণ্ডিল। আর ওদিকে থলিগুলোর পেট এখন রীতিমতো ফুলে উঠেছে।

নোটের পাহাড় দেখতে দেখতে গোপেশ তার বিড়িতে টান দিতে ভুলে গিয়েছিল। বিড়িটা ধরানোর সময় একটু আগে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে তার রীতিমতো

ভয় হয়েছিল। নিরীহ চেহারার একটা দেশলাই কাঠির আগুন যদি ছিটকে ওই নোটের পাহাড়ে গিয়ে পড়ে তা হলে কী কেলেঙ্কারিটাই না হবে। তেমন কিছু ঘটলে মালিক আর তাকে আস্ত রাখতেন না। তিনি ভাবতেন দাশরথির বন্ধু গোপেশ নামের ওই উটকো লোকটা ইচ্ছে করেই তাঁর রুজিরোজগারের ভাতের থালায় ছাই ঢেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা ভাবতেই শিউরে উঠল গোপেশ। সেই সঙ্গে ভাবল, এ রকম একটা দায়িত্বশীল কাজ দিনের পর দিন মানুষকে দিয়ে করানো উচিত নয়। এখন তো যন্ত্রের যুগ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যেই তো কমপিউটার নামে একটা যন্ত্রের কথা লেখে। শিবের অসাধ্য কাজও নাকি ওই যন্ত্র চোখের পলকে করে ফেলতে পারে। এই গদির মালিক শর্মাজির এত টাকা। তা তিনি ওরকম একটা যন্ত্র আনলেই পারেন। এদেশে পাওয়া নাইবা গেল, বিদেশে তো পাওয়া যায় । শর্মাজি তো বউ ছেলেমেয়েকে নিয়ে বছরে একবার শখ করে বিদেশ ঘুরে আসেন। সে সময় তিনি কি পারনে না ওরকম একটা যন্ত্র আনতে? তা হলে তো দাশরথি রেহাই পেত। বেচারা যদি গুনতে গিয়ে ভুল করে ফেলে? যা নোট আছে তার জায়গায় বেশি নোট গুনে ফেলে? সেই মতো হিসেব লেখে? এক আধ টাকার ল্যাটা তো নয়, হাজার হাজার টাকার ব্যাপার। লাখ লাখ টাকা আসছে আর যাচ্ছে। হঠাৎ ভুল তো হতেই পারে। হওয়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে কি টাকাটা দাশরথিকে গাঁটগচ্চা দিতে হবে? পাবে কোথায়? আর এরকম একটা কাজ দিনের পর দিন করেও বা কী করে?

নিভন্ত বিড়ির ছাইটা ঝাড়তে গিয়ে এই প্রথম গোপেশ দেখল, সে একটা সাদা ফরাশে বসে আছে। বহু লোকের আনাগোনায় ফরাশের রঙটা অবশ্য হলুদ হয়ে গিয়েছে। তা হলেও তা ফরাশ! সে ভাবল হাতের বিড়িটা ফেলে আরেকটা নতুন বিড়ি ধরাবে। দেখল, না, বিড়িটায় বিশেষ টান দেওয়া হয়নি। এতটা ক্ষতি সহ্য হবে না। সে পায়ে পায়ে গদি থেকে নেমে এসে ছাই ঝেড়ে পোড়া বিড়িটা আবার ধরাল। ওকে উঠতে দেখে দাশরথি শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু ওর দুহাতের আঙুলগুলো থেমে নেই। ওদের থামতে দেবে না দাশরথি। বিড়িটা ছোট হয়ে এসেছে। দেশলাইয়ের আগুনে নাকে সামান্য একটু আঁচ অনুভব করল গোপেশ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তখন দাশরথিকে দেখছিল। সত্যিই মায়া হয় দাশরথির জন্যে। ভাগ্যিস, টাকা গোনার কোনও যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। আর হলেও ভাগ্যিস শর্মাজি তা তাঁর গদিতে এনে বসাননি। তা হলে যে দাশরথির মতো গোবেচারা লোকটা বেকার হয়ে পড়ত। এই বয়সে করত কী তা হলে?

নোটের পাহাড় এখন চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দাশরথিও বিড়ি ধরাল। গোপেশ আবার তার পাশে এসে বসেছে।

আঙুলে ব্যথা করবে কেন? ওটা তো অভ্যেস। মাথাটা অবশ্য এখন একটু টিপ টিপ করে। তা ও কিছু না। শরীরে একটু ব্যথা হলেই কি তাকে আমল দিতে হবে?

এক যুগ আগে যে প্রশ্ন করেছিল গোপেশ এই এখন তার উত্তর দিল দাশরথি। প্রশ্নগুলো যে ওর কানে গিয়েছে এটাই যথেষ্ট। দাশরথি হাসল। ম্লান হাসি। সে হাসির

কোনও স্বাস্থ্য নেই।

চোখে ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করছিলে না? আগে ব্যাথা হত। এখন হয় না। চোখ আর আঙুলগুলোই তো কাজ করে না, কাজ করে মন। তা চোখ, আঙুল এদের সাহায্যে কাজ করতে হয়। তাই এদের কিছুটা ঝক্কিঝামেলা সহ্য করতে হয়। উপায় নেই। চোখে এখন চালশে পড়েছে। পুরু বাইফোকাল চশমাটা দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। চালশে কথাটার মানে জানো তো?

বইটই পড়ার কষ্ট হলেই ডাক্তাররা বলেন চোখে চালশে পড়েছে।

আসলে চল্লিশে পা দিলে মানুষের কাছ থেকে দেখার ক্ষমতা কমে যায়। মানুষের মানে চোখের। তখনই বলে চালশে পড়েছে। চল্লিশ থেকে চালশে কথাটা এসেছে। এটা যদি রোগ হয় তা হলে আমার বেলায় একে বলা উচিত তিরিশে। কারণ তিরিশে পা দিয়ে এই যে আমি জীবিকা নিলাম তারপরই আমার রোগটা দেখা দেয়। রোগটা কিন্তু খারাপ নয়। বয়স বাড়লে সংসারকে যত দূর থেকে দেখা যায় ততই ভাল। কাছাকাছি থাকা ভাল। কিন্তু ঘেঁযাঘেঁষি ভাল নয়। এই যেমন আমি। ঠিকে মজুরি আমার। শর্মাজির মাস মাইনের চাকর আমি নই। বাঁধাধরা চাকরি করতে আমার ভাল লাগে না। নিয়মিত ঠিক সময়ে এসো, খাতায় সই করো—এগুলোই আমার কাছে ঝামেলা মনে হয়।

বান্ডিল পিছু বুঝি তোমার ঠিকে চুক্তি?

হ্যাঁ অনেকটা তাই। তবে নোট অনুযায়ী আলাদা আলাদা রেট। এক টাকা আর দু টাকার নোটের বান্ডিল গোনার রেট এক। আবার পাঁচ, দশ ও বিশ টাকার নোট গুনলে আলাদা রেট। পঞ্চাশ আর একশো টাকার নোট গোনার মজুরি কিন্তু আলাদা। পঞ্চাশ আর একশো টাকা বড় নোট। তাই রেটটা কম।

অবাক করলে। বড় নোট গুনলে রেট কম হবে কেন?

তা হবে না? ছোট নোট গোনার কাজে যে ঝুঁকি বেশি। হাত পিছলে যেতে পারে। আর তা হলে আবার তোমাকে নতুন করে গুনতে হবে। ছোট নোট আঠার মতো। একটা নোট ধরলে আরও দু পাঁচটা উঠে আসে। আঠা ছাড়া আর কী? দ্যাখো না, খুচরো নোটেরই বেসাতি বেশি। গোনাগুনতি বেশি নোট, রেটও বেশি।

দাশরথির মতো চরিত্ররা সব কিছু বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। বিদ্রোহ করে না। রেটের তারতম্য নিয়ে ওকে তাই কোনও কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা। জিজ্ঞেস করলেও এর বেশি কিছু জানা যাবে না।

পুরু বাইফোকাল চশমাটা খাপে ভরতে ভরতে দাশরথি বলল, বলো তোমার খবর কী? আছো কেমন? এতদিন পর কী মনে করে? আমার ঠিকানাই বা পেলে কোথায়?

এক গণ্ডা প্রশ্ন করলেও সে সব প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ দাশরথির খুব একটা নেই। এর জন্যে গোপেশ মনে কষ্ট পাবে না। দোষ দেবে না দাশরথিকে। দাশরথিকে তো সে আজকেই প্রথম দেখছে না। চিরদিনই সে ওরকম। মুর্শিদাবাদের খড়গাঁয়ের স্কুলে একই ক্লাসে দুজন পড়ত। গোপেশের মামার বাড়ি খড়গাঁয়ে। সেখানেই সে মানুষ।

দাশরথির বাড়ি বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর তীরে গনুটিয়া। মুর্শিদাবাদ ও বীবভূম পাশাপাশি দুটি জেলা। মাঝখানে ওই একটি জায়গায় বয়ে যাচ্ছে ময়ূরাক্ষী। গনুটিয়ার ওপারে তিনটে গ্রাম পেরিয়ে গোপেশের বাড়ি। গোপেশ দাশরথিকে বলত, পাখি-ওড়া পথে তোদের গাঁ আমাদের থেকে মাত্র দশ মিনিট দূরে। দাশরথি যে গনুটিয়া থেকে কী করে খড়গাঁয়ে গিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই আজ ভুলে বসে আছে। চিরদিনের খেয়ালী, উদাস মানুষ দাশরথি। স্কুলের পড়া শেষ না করেই ফিরে এসেছিল গ্রমে। গোপেশ পরে শুধু এটুকু খবর পেয়েছিল, বাপমাকে হারিয়ে দাশরথি বাস্তুভিটেটুকু বিক্রি করে দিয়ে দেশান্তরী হয়ে যায়। কেউ কেউ বলে বাস্তুভিটে বিক্রি করেনি দাশরথি। দূর সম্পর্কের এক ভাইকে তা জিম্মা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। শিয়ালদহ আর হাওড়া স্টেশন দিয়ে রোজ যে হাজার লোক শহর কলকাতায় আছড়ে পড়ে তাদেরই একজন হয়ে দাশরথি এই বিশাল শহরের কোটরে এসে একদিন আশ্রয় নিয়েছে। নানা ঘাটে ঠেক খেয়েছে তার আগে।

আমার খবর সত্যিই কি তুমি শুনতে চাও?

শুনব না কেন? হাতে এখনও মিনিট পনেরো সময় আছে। বলোই না।

বর্তমানে মনোহারি একটা দোকান দিয়েছি। পুঁজিপাটা বেশি নয়। ওই নেড়েচড়ে কোনওরকমে চালিয়ে যাচ্ছি।

গোপেশ লক্ষ করল সে বিয়ে থা করেছে কি না, করে থাকলে ছেলে মেয়ে কটি, ছেলেরা কত বড় হল, শ্বশুববাড়ি কোথায় এরকম কোনও কথাই দাশরথি জিজ্ঞেস করছে না। দাশরথি নিজে বোধহয় বিয়ে থা করেনি। বোধহয় কেন, সেটাই ঠিক। কারণ ওর নিজের চালচুলো বলে কিছু নেই। আগে যখন ছিল না এখনও নির্ঘাত নেই। কোনও একটা জায়গায় থিতু হওয়ার মানসিকতাটারই ওর অভাব। গোপেশ ভাবল, দাশরথি নিজে যখন কিছু জিজ্ঞেস করছে না, সে নিজেও কিছু বলবে না। তাছাড়া এখনই তো সব বলার কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে না! কয়েক যুগ পরে দেখা। এখন ওর কর্মস্থানটা জানা হয়েছে। আস্তে আস্তে সব কথা বলা যাবে খন।

তা আমাকে খুঁজে পেলে কী করে?

আমার চেনাশোনা কেউই তো জানে না যে আমি এই গদিতে কাজ করছি।

এই মহল্লাতেই তো আমার মহাজনের গদি। যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখলাম একটা লোক রাশি রাশি নোট গুনছে। তারপর দেখি তুমি। এই এতদিন পরেও চিনতে ভুল করিনি বলো।

অবাক করলে। এত বড় শহর কলকাতা, আর এত ভিড়। এখানে কেউ কাউকে খুঁজে পায়? খুঁজে পাওয়া সম্ভব? জানো গোপেশ, প্রথম যখন গদিতে টাকা গোনা শুরু করি তখন ভাবতাম এত এত টাকা আসছে কোত্থেকে? কারা এত নোট ছাপাচ্ছে? কেনই বা ছাপাচ্ছে? এত টাকা একজন নিয়ে কী করে? কারাই বা কেনে এত সব জিনিসপত্র? মানুষের এত কিছু প্রয়োজন আছে ভাবলেই অবাক হতাম। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে এল। ঘোরটা কেটে গেল। আমি আর অবাক হই না। অবাক

হওয়ার মতো ঘটনাই বোধহয় আর ঘটছে না। কী বলো? বয়সও তো বাড়ছে তাই আর আগের মতো অবাক হই না। হতে পারি না। তারপর আজ তুমি যখন বললে, আমার সঙ্গে হঠাৎই তোমার দেখা হয়ে গেল তখন আবার সেই আগের মতো অবাক হলাম। বয়সটা তুমি আবার কমিয়ে দিলে নাকি? দুজনের সেই স্কুলে পড়ার বয়সটা কি হঠাৎ ফিরে এল? অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। এরপর দেখো, আমি আর কখনও অবাক হব না। কেন হব?

জীবনে কী আছে বলতে পারো?

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গোপেশ। বড়বাজারের বদ্ধ চাপা স্যাঁতসেঁতে এই ব্যবসাপট্টিতে অনেক আগেই সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সাতটায় এক একটা কাটরার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। তার আগেই হিসেবনিকেশ সব সারা। শর্মাজি এখন ওঁর গদিতে নেই। ওঁরই এক কর্মচারীকে টাকার বান্ডিলগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে দাশরথি। এখন শর্মাজি এলেই পাকা হিসেবটা ওঁর হাতে সে তুলে দেবে। তারপর ছুটি। বিকেল চারটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত কাজ। শনিবারে কাজ দুপুরে মাত্র দু ঘণ্টা। পুরো রবিবারটা ছুটি। সপ্তাহে সতেরো ঘণ্টার বেশি কাজ করার কথা দাশরথি ভাবতেই পারে না। সেরকম একটা কাজ খুঁজে পেয়েছে বলেই এখনও এখানে টিকে আছে।

তুমি তো আমাকে অনেক কথা বললে। আমার শুধু একটা প্রশ্ন। তোমার দেরি কবাব না। শুধু জানতে ইচ্ছে করে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে তুমি এখানে কী করে এলে?

জানোই তো আমি সারাদিন ঘুরে বেড়াই। এই কলকাতা শহরেই কত কিছু দেখার আছে। বড় যাদুঘর তো মোটে একটা। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দেখার জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অলিগলিতে। দেখার শেষ নেই। ওরকমই একদিন ঘুরতে এসেছিলাম বড়বাজারে। দেশলাই পট্টি, ফিতে পট্টি, লণ্ঠনপট্টি, রংপট্টি, বাসনপট্টি—শুধু দোকান আর দোকান। শাড়ির মহল্লাই তো অনেকগুলো। একদিন এই মহল্লায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে দু চোখ ভরে কেনাবেচা দেখছি। এমনসময় একজন ডাকলেন। উনিই শর্মাজি। ওঁরা তো লোক চেনেন। ফেরার সময় আমার গাড়িতে কয়েকটা মোট তুলে দিতে হবে। এখান থেকে মোটগুলো বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। আমি সেদিন থেকেই কাজে লেগে গেলাম। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, ওগুলো যে সে মোট নয়, টাকার মোট। শর্মাজিই আমাকে টাকা গোনার কাজে লাগিয়েছেন। কাজটা আস্তে আস্তে রপ্ত করে নিয়েছি। এখনও অবশ্য টাকার ওই থলিগুলো আমি নিজে বয়ে নিয়ে গিয়ে শর্মাজির গাড়িতে তুলে দিই। কাজটা খারাপ লাগে না। একজন আমাকে বিশ্বাস করছে ভাবতেই ভাল লাগে। তবে কি জানো, আমি নোটের তোড়া দেখলেই বলে দিতে পারি কত টাকা আছে। এক একটা বান্ডিল হাতে নিয়ে বলে দিতে পারি টাকার পরিমাণ কত। কিন্তু সেটা বললে তো কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই গুনেই দিতে হয়।

এই সময় একজন মোটাসোটা লোক ধীরেসুস্থে গদিতে এসে মখমলের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। যেভাবে দাশরথি ব্যস্ত হয়ে তাঁর সামনে হিসেবের খাতাটা মেলে

ধরল তাতে গোপেশের বুঝতে অসুবিধা হল না উনিই শর্মাজি। গোপশের দিকে আর ফিরেও তাকাল না দাশরথি। গোপেশেরও ফেরার তাড়া আছে। ট্রেন ধরতে হবে। সেও বড়বাজারের পাইকারের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরছে।

দাশরথি চলি, আবার দেখা হবে। আমাকে তো এখানে প্রায়ই আসতে হয়। গোপেশ বলল। কথাটা দাশরথি শুনল কি না বোঝা গেল না।

তারপর বছরের পর বছর ধরে গোপেশ এই পথে অন্তত একশো বার আসাযাওয়া করেছে। দুপুর বারোটা পর্যন্ত দোকান দিয়ে বিকেল নাগাদ সে এখানে এসে পৌঁছয়। আসা-যাওয়ার পথে প্রতিবারই সে দেখেছে একটা লোক পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মনে শুধু টাকা গুনছে। সে আর কেউ নয়। দাশরথি। চেহারাটা অবশ্য অনেক বদলে গিয়েছে ওর। মাথার চুল শরতে ময়ূরাক্ষীর তীরের কাশফুলের রং নিয়েছে।

সেদিন গোপেশ আসতে আসতে দেখল, শর্মাজি গদিতে দশটা তালা ঝুলিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন আর তাঁর ঠিক পিছনেই পাঁচটা বড় বড় থলি বইছে কুঁজো একটি লোক। চিনতে দেরি হয় না যে; কুঁজো ওই লোকটিই দাশরথি। তা একসঙ্গে এত ভার না বইলেই পারে।

শর্মাজির গাড়িতে থলিগুলো গুনে গুনে তুলে দিল লোকটি। গাড়িটা ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই গোপেশ বলে উঠল—কে? দাশরথি না? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

দাশরথির চোখে এখন সারাক্ষণ পুরু কাচের চশমা। কাচের ভিতর থেকে অনেকক্ষণ দেখল গোপেশকে।

ও গোপেশ। তা ছাড়া পেছন থেকে আর কে ডাকবে? বুঝেছ এখন সব খুচরোর দিন। রাশি রাশি রেজগি এসে পড়ছে। আর দস্তার টাকা। নোটের অত বাড়বাড়ি দেখেই বুঝেছিলাম সামনে মন্দা। তা ভুল বুঝিনি। মন্দার মন্দাকিনী বইছে, বুঝেছ। কারও ছাড়ান নেই। বাজার ছেয়ে যাবে। যুগটাই যে রেজগির।

তোমার বুঝি কষ্ট হয় গুনতে।

না কষ্ট হবে কেন? আমি তো জানতাম এরকম দিন আসছে। তৈরি ছিলাম। তবে ভারটা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। তা সহ্য হয়ে যাবে খন।

ঘোলাটে কাচের ভেতর থেকে গোপেশের দিকে আবার তাকাল দাশরথি। সন্ধের ময়লা আলো। রাস্তায় বাস ট্রাম রিকশার ভিড়। ভিড় ব্যস্ত মানুষের। সবাই যে যার কাজে ছুটছে। এরই মধ্যে পুরনো দিনের একটি মুহূর্ত যেন কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে দেখে গেল। গোপেশকে ছাড়িয়ে দাশরথি তখন উল্টোদিকের ফুটপাথে হাঁটতে শুরু করেছে।